নেতাজী ষড়যন্ত্র মামলা

শ্যামল বসু

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন ।। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
৭ ফেব্রুআরি ১৯৫৫

প্রকাশক :
নির্মল চক্রবর্তী
রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

মুদ্রণে :
অরুন চট্টোপাধ্যায়
রিফ্লেক্ট প্রিন্টার্স
৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন :
আনন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৩৬ সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

Dedicated to
SASHIBHUSAN
My dearest friend

প্রিয়তম বন্ধু
শশিভূষণকে
উৎসর্গ করলাম

এই লেখকের :

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য

খুনী মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষা প্রসঙ্গে

আমি মুজিবর বলছি

সুভাষ ঘরে ফেরে নাই

হায় স্বদেশ ! আমরা জুয়া খেলছি

জনতার আদালতের হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, হে আমার প্রিয়তম স্বদেশবাসীগণ, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যুগ-যুগান্তব্যাপী ন্যায়ের নামে যত অন্যায় সাধিত হয়েছে, দিনের পর দিন বিচারের নামে যত অবিচার করা হয়েছে, বছরের পর বছর তদন্তের নামে যত প্রহসন অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে জঘন্যতম অপরাধের, সব থেকে ঘৃণ্যতম অন্যায়ের, সব থেকে নিকৃষ্টতম অবিচারের, সব থেকে লজ্জাস্কর প্রহসনের মুখোশ খুলে ফেলে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে আসল সত্যকে তুলে ধরার বিনীত প্রার্থনা নিয়ে বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত এই আবেদনকারী আজ আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছে শুধুমাত্র এই আশায় যে, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, মতলববাজী আর ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত আবহাওয়ায় কলুষিত ওই দুর্ভাগা দেশে একমাত্র এখানেই, হ্যাঁ মাননীয় বিচারপতিগণ, একমাত্র এই জনতার আদালতেই সে ন্যায়বিচার পাবে। কারণ, সে মনে-প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করে, দিগন্ত বিস্তৃত এই নীলাকাশের নীচে এখনও পর্যন্ত এই জনতার আদালতই হচ্ছে একমাত্র আদালত যে আদালতে 'ন্যায়বিচার' নামক শব্দটির ওপর কোন দস্যু বলাৎকার করা শুরু করে দেয়নি, যে আদালতে আজও ঘুষ, জোচ্চুরি, বেইমানি আর মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেনি, যে আদালতে অদ্যাবধি মন্ত্রীত্ব দানের প্রস্তাব, পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি, আমদানি লাইসেন্স মঞ্জুরির আশ্বাস কিংবা নগদ রৌপ্যমুদ্রার ঝনঝনাৎকারে বশীভূত করে বিচারপতিদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে পালটে দেবার রেওয়াজ চালু হয়নি। তাই, হে প্রিয়তম স্বদেশবাসীবৃন্দ, শুধুমাত্র সেই আশায়, সেই ভরসায়, সেই শ্রদ্ধায়, সেই বিশ্বাসে একান্ত মুক্ত-মন নিয়ে নির্ভয়-চিত্তে আজ আমি আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি। কারুও কাছে কোন অন্যায় আবদার কিংবা অন্যায্য কোন সুযোগ দানের প্রার্থনা জানাতে আমি এখানে

আসিনি, এসেছি একটি ষড়যন্ত্র মামলায় যথাযথ ন্যায়বিচার পেতে। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের বিবেকবান হৃদয়, বিবেচনাপূর্ণ মন, বিচারশীল মস্তিস্ক এবং জ্ঞানদীপ্ত চিন্তাধারা আমার এই আবেদনের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করবে না। আমি জানি, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আদালতের মর্যাদা আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত ওই ন্যায়দণ্ডের তৌলমূল্যে যাচাই হয়ে রক্ষিত হবেই। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, আমার এই আবেদনকে আপনারা যথাযথ মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করবেন, আমার প্রতিটি বক্তব্যকে ন্যায়াসনে উপবিষ্ট বিচারপতিসুলভ ধৈর্যতার সঙ্গে শুনবেন, আমার উপস্থাপিত প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণকে যথাযথ ন্যায়দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমার দেওয়া তথ্যাবলীকে আপনাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাথেয় হিসেবে গণ্য করবেন।

হে ন্যায়াধীশগণ, অনেক, অনেক, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর নয়; অশ্রুসজল নয়নে নতজানু হয়ে যুক্তকরে আজ আমি আপনাদের বিবেকের দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আর দেরি করবেন না, আর নীরব থাকবেন না, আর নিস্পৃহ হবেন না—এবার দয়া করে মুখ খুলুন—সময় বয়ে যাচ্ছে—বলুন, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের অগস্ট মাসের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে অপস্রিয়মান ক্লান্ত সূর্যটাকে সাক্ষী রেখে উদয়-সূর্যের দেশ নিপ্পন থেকে সোচ্চারে যে ষড়যন্ত্রের জন্মলগ্ন ঘোষিত হয়েছিল, এবং দীর্ঘ তিরিশ বছরব্যাপী স্বদেশে-বিদেশে প্রতিমুহূর্তের নিরবচ্ছিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে হতে আজ ফুলে-ফলে পাতায় পরিপূর্ণ এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী অতি যত্নে লালিত আমাদের মনের বিশ্বাসের উর্বর জমিটাকে প্রায় সম্পূর্ণতঃই গ্রাস করে ফেলতে বসেছে, মানব-ইতিহাসের সেই তুলনাহীন ষড়যন্ত্রটির জন্য দায়ী কে বা কারা? কাদের স্বার্থে এই ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষটিকে

দিনের পর দিন অবিরত পরিচর্যায় ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা হয়েছে? কাদের স্বার্থে আজ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের চারপাশে ছড়ান কুয়াশার ঘন আবরণটাকে ভেদ করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস দেখা গেল না? কাদের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিয়োজিত দু দুটো সরকারী তদন্ত কমিশন সত্ত্বেও এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের আসল ভিতটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হল না? কাদের স্বার্থে বার বার সেই এক-ই সাক্ষ্য-প্রমাণের লীলাখেলা চলেছে? কাদের স্বার্থে রাত এবং দিনকে এক ই সময় বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে? কাদের স্বার্থে বিভিন্ন সাক্ষীর বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে এক-ই বিষয় বলে চালিয়ে দেবার এই জঘন্য প্রয়াস? কাদের স্বার্থে উলটো-পালটা সবকিছুকেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নেবার এই সন্দেহজনক ব্যাকুলতা? কারা, হে মাননীয় আদালত, তারা কারা?

না ম্যান্যবর, এখনই আমি আপনাদেরকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে বলছি না, তবে অনুরোধ করছি, অতি রূঢ়তম কিছু সত্য কথা শোনার জন্য আপনারা নিজেদের মনকে প্রস্তুত করে নিন। বহু বিনিদ্র রজনীর পুঞ্জীভূত বিক্ষোভে আমার উত্তাল হৃদয় আজ এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রয়েছে; মনে হচ্ছে, গল্পের সেই সুখী রাজপুত্রের হৃদয়ের মত যে কোন মুহূর্তে ষড়যন্ত্রের প্রবল চাপে এ হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তাই, আগে থাকতেই আপনাদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি, এই অসাধারণ মামলাটি সম্পর্কে আপনাদের চূড়ান্ত রায় যা-ই হোক না কেন, অনুগ্রহ করে সে রায় এমন সোচ্চারে ঘোষণা করবেন যাতে আপনাদের নির্ভিক কণ্ঠস্বর দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের প্রতিটি মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছতে পারে। আপনাদের রায় শুনে অন্ততঃ তারা যেন এটুকু বুঝতে পারে যে ঘটনাটা কি আসলে ঘটেছিল? অন্ততঃ তাদের কাছে যেন এটুকু পরিষ্কার হয় যে এই ষড়যন্ত্রের জন্য ঠিক কারা কারা দোষী? তারা যেন অন্ততঃ এ কথাটা জানতে পারে যে,

কার কার স্বার্থে এতদিন ধরে এই রহস্যের যবনিকা অনুত্তলিতই রয়ে গিয়েছিল।

হে মহামান্য আদালত, এবার আমায় অনুমতি দিন, আমি আমার মূল বক্তব্য শুরু করি। তবে মূল বক্তব্যে আসার আগে পরিষ্কারভাবে আমি আপনাদের এ কথা জানিয়ে দিতে চাই যে, হতভাগ্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত ষড়যন্ত্রের রহস্য উদঘাটনের প্রার্থনা জানাতে আজ আমি আপনাদের দরবারে উপস্থিত হয়েছি, সেই হতভাগ্য মানুষটির সঙ্গে কোনকালেই আমার কোন রকম ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না; এমনকি একথা শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন যে, সেই হতভাগ্য মানুষটিকে কখনও স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়নি। তবে এটা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, বিচারাসনে উপবিষ্ট হে ন্যায়াধীশগণ, সেই হতভাগ্য মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য থেকে আমি নিজে বঞ্চিত হলেও আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, অনেকেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি আপনাদের মধ্যে অনেকেই সেই অসম সাহসিক মানুষটির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নির্মূল করার লড়াইতে নেমেছিলেন, তাঁর পায়ের তালে তাল মিলিয়ে জীবন-মরণের শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন। তাই, আপনাদের কাছে প্রথমেই অনুরোধ জানিয়ে রাখছি, অনুগ্রহ করে বিচার চলাকালীন নিজেদেরকে সংযত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেম; না হলে, আমার অনুমান, নিজেদের অজান্তেই আপনারা যথার্থ ন্যায়বিচার করার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হবেন। কারণ, যদি একবার হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহলে পরে আর তাকে কখনোই আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না।

হে বিচারপতিবৃন্দ, আমি আমার অন্তদৃষ্টি দিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার উল্লিখিত ষড়যন্ত্রের শিকার সেই হতভাগ্য মানুষটির নাম জানার জন্য আপনারা প্রত্যেকই মনে মনে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে

উঠেছেন। আপনারা উস্‌খুস্‌ করছেন তাঁর পরিচয় পাবার অপেক্ষায়। হ্যাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো হচ্ছে যথাযথ বাস্তবসম্মত প্রতিক্রিয়া। তা যদি না হত, যদি আমার কথা শুনে আপনারা বিচলিত না হতেন, যদি আমার কথায় আপনাদের মনের ঔৎসুক্যের বেলাভূমিতে ঢেউয়ের উথাল-পাথাল শুরু না হত, তা হলে সেটাই তো হত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার; সেটাই তো হত একটা বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। এ যে আপনাদেরই এক ঘনিষ্ঠতম পরমাত্মীয়ের নাম চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার জঘন্য প্রচেষ্টা। এ ঘটনায় আপনারা বিচলিত না হয়ে থাকরেনই বা কী করে! কী করেই বা সংযত রাখবেন আপনাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে! তা যে অসম্ভব, তা যে অবাস্তব। তবুও, শুধুমাত্র ন্যায়ের কথা চিন্তা করে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য ঠিক যতটা সংযমের প্রয়োজন আপনাদের উদ্দাম হৃদয়কে ঠিক ততটাই সংযত রাখুন—তার থেকে একচুল বেশিও নয়, তার থেকে একচুল কমও নয়।

এবার এই নিস্তব্ধ আদালতে উপস্থিত প্রতিটি মানুষকে সাক্ষী রেখে, হে মহামান্য বিচারপতিগণ, আপনাদের বিচলিত হৃদয়ের অনুমতি নিয়েই বলছি, আজকের এই ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যমণি সেই হারিয়ে যাওয়া নায়কের নাম শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ওরফে মহম্মদ জিয়াউদ্দিন খাঁ, ওরফে সীনর আরল্যান্দো মাৎজোত্তা, ওরফে কাকা চন্দ্র বোস, ওরফে নেতাজী সুভাষ। হ্যাঁ, মাননীয় আদালত, কোটি কোটি ভারতবাসীর মনের একছত্র অধিপতি, স্বপ্নের রাজা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই হচ্ছেন আজকের এই বির্তর্কিত মামলার কেন্দ্রমণি; তাঁর বিরুদ্ধে সংঘটিত ষড়যন্ত্রের যবনিকা উত্তোলনের আবেদন-ই হচ্ছে আজ এই আদালতের সামনে একমাত্র বিচার্য বিষয়। তাই আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি; আইনের ভাষ্য অনুযায়ী এই

ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র মামলাটির একটি যথাযথ নাম দেওয়া হোক। আমার মনে হয়, আমরা যদি এই মামলাটিকে 'নেতাজী ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত করি তাহলে সেটাই হবে এই মামলার যথার্থ পরিচয় ; সঠিক নামকরণ।

এ ছাড়া এটাকে আর কী-ই বা বলা যায় বলুন ? কী-ই বা বলা সম্ভব ? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তো এর সারা অঙ্গ জুড়ে রয়েছে শুধুই ষড়যন্ত্র—একটার পর একটা, তারপর আরও একটা, তারপর আরও, আরও, আরও—কেবল ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র ! যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন এই ষড়যন্ত্রের পাখনা গজাচ্ছে ! এক দিন দু দিন নয় দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে 'চলেছে সেই এক-ই ইতিহাস—এক-ই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। ফলে অবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে একেবারে প্রথমে সংঘটিত সেই আসল ষড়যন্ত্রটাকেই আর চিনে ওঠা যাচ্ছে না ; সেটা ঢাকা পড়ে গেছে অন্য হাজারটা নতুন ষড়যন্ত্রের অন্তরালে। তবু আমি আপনাদের বলছি, সে জন্য আমাদের নিরাশ হয়ে পড়াটা ঠিক হবে না, সে কারণে আমাদের হতোদ্যম হয়ে বসে থাকলে চলবে না—যেভাবেই হোক একটার পর একটা সূত্র ধরে আসল লক্ষ্যের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই। এবং আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি এভাবে এগোতে পারি, তাহলে আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারবই, একদিন না একদিন এই ষড়যন্ত্রের ভিতটাকে খুঁজে পাবই। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, হে আমার প্রিয়তম স্বদেশবাসীগণ, আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্যগুলো শুনুন, একটু সময় নিয়ে আমার সাক্ষীদের সাক্ষ্য-গুলোকে পরীক্ষা করুন, একটু মনোযোগ দিয়ে আমার উপস্থাপিত দলিল-দস্তাবেজগুলোকে দেখুন। তাহলে, হ্যাঁ মাননীয় আদালত একমাত্র তাহলেই একদিন দেখতে পাবেন আমাদের সবার চোখের সামনে আসল রহস্যটা সূর্যালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ;

অন্ধকারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে ইতিহাসের চিরন্তন সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার স্বরূপে। তবে আমি আশা করি, একটা ব্যাপারে আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে হলে আমাদের অতি অবশ্যই একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে হবে। তাই, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কোন খান থেকে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব? ঠিক কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু হবে এই কাহিনীর পথ চলা? ঠিক কোন বিশেষ মুহূর্তটিই হবে এই ইতিহাস শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ?

মাননীয় আদালত, আমি মনে করি এই কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে হলে আমাদের অতি অবশ্যই ফিরে যেতে হবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের একটি বিশেষ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনে—সেই সুদূর উনিশ শ চুয়াল্লিশের ছয়ই জুন তারিখে। আমি জানি আপনারা নিশ্চিতই আমাকে এ প্রশ্ন করবেন যে কেন ওই একটি বিশেষ দিনকেই আমি আমার এই কাহিনী শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে নির্দ্দিষ্ট করছি? কেন অন্য সব দিনকে দুয়োরানীর মত দূরে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র ওই ছয়ই জুন তারিখটাকেই এত প্রাধান্য দিচ্ছি? এ বিষয়ে আমার উত্তর অতি স্পষ্ট: আমি মনে করি, মহাযুদ্ধের তিরিশ বছর পরে, ইতিহাস আজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, উনিশ শ চুয়াল্লিশের ছয়ই জুন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্মাণ্ডির উপকূলে লক্ষ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় সৈন্য যখন অবতরণ করা শুরু করে দেয় ঠিক তখনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাগ্য চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তখনই বিজয়লক্ষ্মীও ঠিক করে ফেলে-ছিলেন তার হাতের বিজয়মাল্য তিনি কার গলায় পরাবেন, কাকে বরণ করে নেবেন বীর-শ্রেষ্ঠ হিসেবে। হে মাননীয় আদালত, আমি বলছি না, আপনারাই বলুন, ইঙ্গ মার্কিন জোটের বড় আদরের সেই 'ডি-ডে'তেই কি জার্মান ডিক্টেটর ফ্যুয়েরার অ্যাডলফ হিটলারের পতনের চরম মুহূর্ত ঘোষিত হয়নি? সেই 'লঞ্জেস্ট-ডে'তেই কি জাপ

প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজোর দিন ফুরিয়ে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি? আপনারা বলুন, আমার এ অনুমানের মধ্যে কি এতটুকু অতিশয়োক্তি দেখতে পাচ্ছেন? আমার এই বক্তব্যের মধ্যে কি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন আছে বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? যদি তা মনে না হয়, যদি বক্তব্যই ঠিক হয়, তবে হে মাননীয় বিচারপতি-বৃন্দ, এবার আমি উলটে আপনাদেরকেই একটা প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা দেখাতে বাধ্য হচ্ছি। আমার জিজ্ঞাস্য আমাদের মত নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কয়েকজন মানুষের কাছেই যখন এই সহজ সত্যটা বোধগম্য বলে বিবেচিত হতে পারছে, তখন কি ভাবে আমরা এমন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে আসব যে, নেতাজীর মত একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সেদিন সেই সহজ সত্যটা একান্তই দুর্বোধ্য ছিল! এমন উদ্ভট কথা আমরা বলব কোন দুঃসাহসে? কি ভাবে আমরা এমন নির্বোধসুলভ মন্তব্য করব যে ইউরোপীয় রণাঙ্গণে সেদিনকার সেই বিপর্যয়কর যুদ্ধ পরিস্থিতি সত্ত্বেও নেতাজী তখনও যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে কোন ধারণাই করে উঠতে পারেননি? আপনারাই বলুন, এমন অবাস্তব সিদ্ধান্তে আসাটা কি কোন পাগলের পক্ষেও সম্ভব? এমন উদ্ভট কথা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে?

না, তা পারে না; কারণ, সেটা পারা সম্ভব নয়। কেননা, নেতাজীকে যারা দেখেছেন, যারা তাঁর সম্পর্কে জানেন, তারা বলবেন যে না, এ একেবারেই অসম্ভব, একেবারেই অবাস্তব। নেতাজীর মত মানুষ কথনোই এমন ভুল করতে পারেন না; তার মত মানুষের পক্ষে এমন ভুল করা সম্ভব নয়। এবং আমি বলছি, আপনাদের মধ্যে অনেকেই সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কারণ, আপনারা অনেকেই নেতাজীকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন, এবং আপনারা জানেন যে কী অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ ছিলেন তিনি। তবু আমি চেষ্টা করব আসল সত্যকে তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে

আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করতে। কারণ, এটা আদালত, এখানে কেবলমাত্র অনুমানের ভিত্তিতেই কোন বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় ; তার জন্য যথাযথ যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের প্রয়োজন হয়। তাই আমি চেষ্টা করব সব কিছুকেই যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে। এর জন্য যে-সব কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজন হবে তার প্রত্যেকটাই আমি এখানে সঙ্গে করে এসেছি। প্রয়োজনের সময় এগুলো থেকেই আমি আপনাদের উদ্ধৃতি শোনাব, এগুলো থেকেই প্রমাণ দাখিল করব।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এতক্ষণ আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালেই নেতাজী যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন, কি না ? আমার বক্তব্য : যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে শুধু আঁচ করাই নয়, সে ব্যাপারে তখনই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি ; তখনই বুঝে ফেলেছিলেন, এই যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত। আজ হোক, কাল হোক, অচিরেই মিত্রশক্তি তাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ শুরু করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে জাপানের বিরুদ্ধে। তখন, সেই পরিস্থিতিতে, একা জাপানের পক্ষে অমন প্রবল আক্রমণকে প্রতিহত করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না কিছুতেই তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না শত্রুকে। অর্থাৎ সোজা কথায়, জাপানকে তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই মিত্র-শক্তির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করতে হবে।

আমি আপনাদের আগেই বলেছি, আমি এখানে যা যা বলছি তার কোনটাই কেবলমাত্র আমার অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয়, এর প্রত্যেকটার পেছনেই যথেষ্ট জোরাল প্রমাণ রয়েছে। আমি সেই প্রমাণগুলো আপনাদের সামনে একে একে হাজির করছি। আমার প্রথম বক্তব্য হল, উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালেই নেতাজী বুঝে

ফেলেছিলেন যে যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের হাতে জাপানের পরাজয় আসন্ন। সে কারণে তিনি একটা বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। এবং এটা যে শুধু আমার কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য তার এক নম্বর প্রমাণ হল, খোসলা কমিটির সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন মেজর শাহনওয়াজ খানের দেওয়া সাক্ষ্য। মেজর শাহনওয়াজ খোসলা কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন: 'আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভার শেষ যে বৈঠকে আমি যোগদান করি, সেটা বসেছিল সম্ভবতঃ উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে। সেই বৈঠকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তন সম্পর্কে নেতাজী আমাদের বলছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমার নিজস্ব উপলব্ধি হচ্ছে এই যে, এই যুদ্ধের একটাই মাত্র পরিণতি হতে পারে, এবং তা হল যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের চূড়ান্ত বিজয়।" শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছিলেন: "সেটা অবশ্য আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়, কারণ আমি শুধু মাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই লড়াই করছি। জাপান যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে তাতেও আমাদের কিছু যাবে আসবে না, আমরা ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবই।" এবং তিনি এও বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার জন্য তিনি রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিস্ট শক্তিগুলির কাছে সাহায্য চাইবেন, এবং সেই কারণেই তিনি রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন।'

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে নেতাজী কি মতামত পোষণ করতেন, তাঁর চিন্তাধারা তখন কোন খাতে বইছিল সে সম্পর্কে এই হচ্ছে মেজর শাহনওয়াজের বক্তব্য। তিনি বলছেন, সেই চুয়াল্লিশের অক্টোবরেই নাকি নেতাজী এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, এই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত। শুধু তাই নয়, শাহনওয়াজের বক্তব্য

অনুযায়ী, নেতাজী নাকি এও ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিস্ট শক্তিগুলির কাছে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তখন থেকেই রুশদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও শুরু করে দেন।

শাহনওয়াজের এই বক্তব্য যে মোটেই মিথ্যে নয়, চুয়াল্লিশের অক্টোবর মাস নাগাদ রুশদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে নেতাজী যে সত্যি সত্যিই অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন তার স্বপক্ষে এবার আমি আপনাদের সামনে আর একটা প্রমাণ রাখছি। আজাদ হিন্দ মন্ত্রীসভায় প্রাক্তন সচিব শ্রীআনন্দমোহন সহায় উনিশ শ ছাপান্ন সালের পয়লা ও তেসরা মে সায়গনে নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছিলেন ঃ যে, 'উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের উনত্রিশে অক্টোবর জেনারেল তোজোর স্থলাভিসিক্ত জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী কোইসোর আমন্ত্রণে টোকিও যাবার পথে নেতাজী সাংহাইতে একটা রাত কাটিয়েছিলেন। সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমাদের দু জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোপন আলাপ-আলোচনা চলে। সে সময় তিনি আমাকে বলেন, আমি যেন অবিলম্বে টোকিওতে যাই, এবং সেখানে গিয়ে রুশ রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনবোধে নেতাজী যাতে রাশিয়ায় আশ্রয় পেতে পারেন, তার একটা ব্যবস্থা করে রাখি। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমি টোকিও রওয়ানা দিই। সেখানে গিয়ে প্রথমে জাপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগিমিৎসু এবং তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওযোওয়ার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু তাঁরা দুজনেই আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, এ বিষয় নিয়ে আমি যেন আর অগ্রসর না হই। ফলে, বাধ্য হয়ে আমাকে সিঙ্গাপুরে ফিরে আসতে হয় এবং সেখানে নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি তাঁকে সব কথা জানাই। কারণ, আমি বুঝতে

পেরেছিলাম যে, জাপ সরকারী দপ্তরের আপত্তি সত্ত্বেও গোপনে জ্যাকব মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করাটা মোটেই ফলপ্রসূ হবে না, বরং তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি।' শুধু তাই নয়, শ্রীসহায় আরও বলেছিলেন: টোকিও মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর নেতাজী নাকি শ্রীসহায়কে হ্যানয়ে পাঠিয়েছিলেন ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিনের মাধ্যমে চীনা কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য। এমনকি তাঁকে নাকি এ নির্দেশও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে সেখানকার ভারতীয়দের সমবেত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। শ্রীসহায়ের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি সে ব্যাপারে সাফল্য লাভও করেছিলেন। এবং একথা যে তিনি কেবলমাত্র প্রথম তদন্ত কমিটির কাছেই বলেছেন, তা নয়, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি, অর্থাৎ খোসলা কমিশনের সামনেও তিনি সেই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন: 'বহু চেষ্টা করেও আমরা জ্যাকব মালিকের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। কারণ, সে ব্যাপারে জাপানীদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। ফলে আমাকে যেতে হল হ্যানয়ে। সেখানে আমার ওপর নির্দেশ ছিল যেভাবেই হোক ভিয়েৎনামী বিপ্লবী এবং তাদের নেতা হো চি মিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মাধ্যমে চীনা কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসবার। কারণ আমরা চাইছিলাম, ওদের সাহায্যে এমন একটা ব্যবস্থা করে রাখতে, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের পক্ষে মাঞ্চুরিয়ায় সরে পড়তে কোন অসুবিধে না হয়। এবং সুখের কথা শেষ পর্যন্ত আমরা সে রকম-ই একটা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।'

হে মাননীয় আদালত, এ পর্যন্ত মাত্র দু জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি। কিন্তু তাতেই আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এ কথা বলতে পারি যে, আমার প্রথম বক্তব্যটি,

অর্থাৎ নেতাজী যে উনিশ শ চুয়াল্লিশের মাঝামাঝি নাগাদই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কারণ, ওই দু জন সাক্ষীর সাক্ষ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আসল যুদ্ধ-সমাপ্তির প্রায় এক বছর আগেই যেন-তেন উপায়ে রাশিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য নেতাজী একটার পর একটা বিকল্প পথের অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছিলেন। আপনারাই বলুন, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে যদি তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকতই তাহলে কি তিনি এ ভাবে অত তাড়াহুড়ো করে রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠতেন? অমন ভাবে কি তিনি বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে রুশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতেন?

না, না, এত তাড়াতাড়ি /আপনাদের কাছে কোন জবাব চাইছি না; এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও আপনাদের বলছি না; আপনারা ভাবুন, আপনারা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করুন; ইতিমধ্যে আমি এ বিষয়ে আপনাদের সামনে আরও কয়েকটা প্রমাণ রাখছি। আপনারা সেগুলোকেও আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাথেয় হিসেবে বিচার করুন। তারপর বলবেন, আমার অনুমান সত্য না মিথ্যা?

এবার আসুন, আমি তিন নম্বর প্রমাণ দিচ্ছি। এটা হচ্ছে, খোসলা কমিটির সামনে প্রাক্তন আজাদ হিন্দ সরকারের সদস্য শ্রীদেবনাথ দাসের দেওয়া সাক্ষ্য। নেতাজীর অন্তর্ধানের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীদাস কমিটির কাছে বলেছেন: 'জাপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগিমিৎসুর মাধ্যমে আমরা যখন টোকিওতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছি, তখন হঠাৎ জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদের কাছে একটা চিঠি এল। তাতে বলা হল, সেই পরিস্থিতিতে জাপানীদের পক্ষে নেতাজীকে রাশিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা মোটেই সম্ভব হবে না। চিঠিটা নিয়ে আমি নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম; তাঁকে সেটা

দেখালাম।' সেই চিঠিটা পড়ে সেই মুহূর্তে নেতাজীর মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল সেটা অবশ্য শ্রীদাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়নি, তবে তারপর যে নেতাজী সে ব্যাপারে আর অগ্রসর হননি এমন কথা কিন্তু কোন সাক্ষীই বলতে পারেননি। এমনকি দেবনাথ দাস নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তখন তাঁরা কেউই জানতেন না যে নেতাজী সরাসরি রুশ কিংবা জাপানীদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা, এবং করে থাকলে ঠিক কি কি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।'

এ হচ্ছে সেই উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের জুন মাসের কথা। তারও আগে যে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সে সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছুটা অবহিত করাতে চাই। ই, ভাস্করণের নাম নিশ্চয় আপনারা সকলেই শুনেছেন। নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাকাকালীন ভাস্করণই ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত শ্রুতিধর। এই ভাস্করণ-ই মাত্র কিছুদিন আগে খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন: উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের জানুআরি মাসে মস্কোয় পাঠাবার জন্য নেতাজী একটা বার্তা জাপানীদের সদর-দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন।' শুধু তাই নয়, ভাস্করণ এমন উক্তিও করেছেন যে, নেতাজী নাকি তাঁর সেই মিশনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন।

ভাস্করণের কথা অনুযায়ী নেতাজী সত্য-সত্যই তাঁর মিশনে সফল হয়েছিলেন কিনা, বাস্তবতঃই তিনি রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পেরেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আসুন, এবার আমরা আর একজন দায়িত্বশীল সাক্ষীর সাক্ষ্যকে বিচার করে দেখি। এই ভদ্রলোকের নাম শ্রী এস. সি. সেনগুপ্ত। ইনি হচ্ছেন আজাদ হিন্দ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর একজন প্রাক্তন অফিসার। খোসলা কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে এসেই বলেছেন: 'স্বয়ং নেতাজীই আমাকে বলেছিলেন যে, টোকিওস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকের মাধ্যমে তিনি রুশ প্রধানমন্ত্রী স্তালিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মলোটভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত পরিকল্পনাও রচনা করে ফেলেছিলেন।'

এ সত্ত্বেও আমি জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই একথা জানতে চাইবেন যে, এদের বক্তব্যই যে সত্য তারইবা প্রমাণ কি? আমি স্বীকার করছি, সেটা জানতে চাওয়াটা নিতান্তই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, সম্পূর্ণ বিষয়টাই তো আজ একটা বিরাট সন্দেহের বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছে। তাই, আপনারা ন্যায্যতই একথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এ ব্যাপারে আমার হাতে আর কি কি প্রমাণ রয়েছে? আর কোন কোন তথ্যের দ্বারা আমি আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারি? অধৈর্য হবার কিছু নেই, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এ বিষয়ে আমার হাতে আর যে যে প্রমাণ আছে তার সবকটাই আমি এক এক করে হাজির করছি। এখন পর্যন্ত আপনাদের সামনে মোট পাঁচটা প্রমাণ রেখেছি। এবার আসুন, আমি আমার ছ নম্বর প্রমাণটা দাখিল করি। এটা হচ্ছে একটা গোয়েন্দা রিপোর্ট। সরকারের গোপন সদর দপ্তরের প্রধান ফাইল নাম্বার দশ। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে: সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত মৃত্যু সংক্রান্ত পাঁচই অক্টোবর উনিশ শ পঁয়তাল্লিশে লেখা রেফারেন্স নাম্বার বি টু। এই গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে: 'এ ব্যাপারে বেশ নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে যে, উনিশ শ চুয়াল্লিশ সাল থেকেই মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর মাঞ্চুরিয়ায় যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য জাপানীদের কাছে অনুরোধ করছিলেন। তিনি তাদের এ কথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে, যখন বর্মা থেকে ভারত অভিযান সম্ভব নয়, তখন তিনি মস্কো থেকে দিল্লী অভিযানের জন্য পরিকল্পনা করবেন। মিস্টার বোস সায়গনে পৌঁছবার অব্যবহিত পরে হিকারী কিকান প্রেরিত তারবার্তা আমাদের এই অনুমানকে জোরদার করেছে। এখানে

উল্লেখযোগ্য, মিস্টার ইসোদাও তখন সায়গনে ছিলেন। এ সমস্ত ঘটনা অনুধাবন করলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মিস্টার বোস ও হিকারী কিকান কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে এক বিরাট পরিকল্পনা করেছিলেন মিস্টার বোসের আত্মগোপনকে নিরাপদ করার জন্য।'

'হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এবার অনুগ্রহ করে এ সম্পর্কে হিকারী কিকানের প্রধান জেনারেল ইসোদা কি বলছেন, সেটা একবার শুনুন। শাহনওয়াজ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে জেনারেল ইসোদা বলেছিলেন: 'প্রথমে ঠিক হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তর সাংহাইতে স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ জাপানী সেনা কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন, যদি নেতাজী সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে দূরে চলে যেতেন তাহলে তাঁর পক্ষে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হত। দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাবটা ছিল, সদর দপ্তরকে সায়গনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সাংহাই ও পিকিং অথবা উত্তর চীনের অন্য কোন শহরে তার দুটো শাখা স্থাপিত হবে। উত্তর চীনে শাখা দপ্তর স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, তাতে নেতাজীর পক্ষে রুশ ভূখণ্ডের খুব কাছাকাছি থাকা সম্ভব হত, এবং প্রয়োজনবোধে তিনি সেখান থেকে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতেন। জাপ সরকার এবং রাজকীয় জাপ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে এই প্রস্তাব সম্পর্কে প্রথমে প্রবল আপত্তি জানান হয়েছিল, কিন্তু আমি যখন তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, এ প্রস্তাবের অর্থ এই নয় যে নেতাজী জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছেন, শুধু তাঁর ইচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বিকল্প যোগাযোগ গড়ে তোলা, তখন তাঁরা সে প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন।' এবারে বলুন ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের অনুমানের
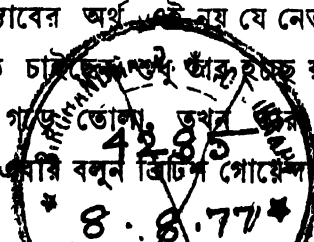
সঙ্গে জেনারেল ইসোদার বক্তব্যের কি কোন সাদৃশ্য পাচ্ছেন? নেতাজীকে সোভিয়েত রাশিয়ায় পৌঁছে দেবার ব্যাপারে হিকারী কিকান যে উনিশ শ চুয়াল্লিশ সাল থেকেই বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের এই অভিযোগকে কি এখন আর আপনারা হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন?

আরও প্রমাণ দিচ্ছি, হে প্রিয় স্বদেশবাসীবৃন্দ, নেতাজী যে আমাদের মত খাটো বুদ্ধির মানুষ ছিলেন না, তিনি যে সব কিছু আটঘাট বেঁধেই করতেন, তিনি যে প্রত্যেকটা ব্যাপার বেশ একটু আগে থাকতেই বুঝতে পারতেন তার আরও কিছু প্রমাণ দিচ্ছি আপনাদের সামনে। আপনারা জানেন, যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যদল এবং হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করে উনিশ শ চুয়াল্লিশের এগারই অক্টোবর নেতাজী মান্দালয় থেকে রেঙ্গুনে ফিরে এসেছিলেন। এবং আপনারা এও জানেন যে, তার দুদিন আগেই তাঁকে জাপান পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়ে নতুন জাপ প্রধানমন্ত্রী কোইসো এক ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। নেতাজী যে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং জাপান যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন সে কথাও নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আপনারা আজ প্রায় সকলেই ভুলে যেতে বসেছেন যে, ঠিক সে সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনার ব্যাপারে নেতাজী এমন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যে সিদ্ধান্ত তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং অসামান্য বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণই প্রমাণ করে যে, প্রায় এক বছর আগেই তিনি যুদ্ধে জাপানের পরাজয় সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। মেজর শাহনওয়াজ খান খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে মন্ত্রিসভার যে বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন, আমি সেই বৈঠকের কথাই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি। আপনারা মনে করে দেখুন, সেই বৈঠকেই কি নেতাজী আগের সমর-পরিষদকে 'অত্যন্ত

বৃহদায়তন'—এই যুক্তি দেখিয়ে বাতিল করে দেননি? সেই বৈঠকেই কি নেতাজী স্বয়ং, ভোসলে, চ্যাটার্জী, কিয়ানি, আজিজ, কাদির, গুলজারা, পরমানন্দ, রাঘবন, ইনারিয়োৎ কিয়ানি এবং শাহনওয়াজকে নিয়ে এক ক্ষুদ্র-সমর-পরিষদ গঠন করেননি? সেই বৈঠকেই কি তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে এ কথা বলেননি যে, 'আমার মতে এই যুদ্ধের একটাই পরিণতি হতে পারে; এবং সে পরিণতি হল ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিজয়'? আপনারাই বলুন, এ কিসের ইঙ্গিত? এই ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ কি?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের যা বলতে চাইছি, এবং যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তখন থেকে একটার পর একটা প্রমাণ দাখিল করে চলেছি, তা হল এই যে, উনিশ শ চুয়াল্লিশের মাঝামাঝি সময় থেকেই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে নেতাজী মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিলেন। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন: প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দুনিয়ার কোথাও না কোথাও একটা নতুন ফ্রণ্ট খুলতে হবেই; দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে; তৃতীয়তঃ, যুদ্ধ যদি হঠাৎ শেষ হয়ে যায় তাহলে কয়েক জন একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে তিনি কোন নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন; চতুর্থতঃ, নতুন করে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করার জন্য কয়েক জন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কর্মক্ষম ক্ষুদ্র সমর পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। এখন আপনারাই বিচার করে দেখুন, হে প্রিয়তম স্বদেশবাসীগণ, আমার এই সিদ্ধান্তগুলোর পেছনে কোন যুক্তি আছে, কি নেই? আমার অনুমানগুলো ঠিক না বেঠিক?

এবার আসুন, আমরা আমাদের পরবর্তী বিচার্য বিষয়ে প্রবেশ করি। আমরা তথ্য-প্রমাণ ঘেঁটে দেখি, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর

নেতাজী ঠিক কোথায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন? ঠিক কোথায় যাবেন বলে তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন? এবং সেই সঙ্গে এ-ও জানবার চেষ্টা করি যে, কেনই বা তিনি সেই পরিকল্পনার কথা অন্য কাউকে বলেননি? আর কেনই বা তাঁর কোন সহকর্মীরাও তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাননি? আসুন, এবার আমরা সেই এতগুলো 'কেন'র উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

এই সবকটা 'কেন'র যথাযথ উত্তর পেতে হলে প্রথমেই আমাদের যে প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া দরকার, তা হল : যুদ্ধ যদি হঠাৎ শেষ হয়ে যায় তখন কোথায় চলে যাবেন বলে নেতাজী মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন? হে মাননীয় আদালত, এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণকে পরীক্ষা করে যতটা তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় প্রত্যেকটি সাক্ষীই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করছেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় এক বছর আগে থাকতেই নেতাজী রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য গোপনে গোপনে বিভিন্ন রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি আনন্দমোহন সহায়কে জ্যাকব মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাঠিয়েছিলেন; দেবনাথ দাসকে টোকিওর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে বলেছিলেন এবং জেনারেল ইসোদা মারফত জাপ সরকারকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া হো চি মিনের মাধ্যমে চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চীন-মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করার একটা ব্যবস্থাও প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয়, উত্তর চীনের কোন শহরে সদর দপ্তর সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও তিনি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যে তা হলে তার পক্ষে রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা আরও সহজসাধ্য হবে এবং যে-কোন মুহূর্তেই তিনি চীনের সীমান্ত পেরিয়ে রুশ এলাকায় ঢুকে পরতে পারবেন।

অন্ততঃ এখন পর্যন্ত যত জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আমরা শুনেছি—যেমন মেজর শাহনওয়াজ খান, আনন্দমোহন সহায়, দেবনাথ দাস, ভাস্করণ, এস. সি. সেনগুপ্ত এবং জেনারেল ইসোদা—এরা সকলেই একবাক্যে ওই এক-ই কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং এবার আসুন, আরও কয়েকজন সাক্ষীকে আমরা পরীক্ষা করে দেখি। এবং এই ঘটনা সম্পর্কে তারা কে কি বলতে চাইছেন তা শোনা যাক।

খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে নেতাজীর যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাপ রাজকীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের প্রাক্তন স্টাফ অফিসার লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল মরিও তাকাকুরা বলেছেন ঃ 'জাপানের আত্মসমর্পণের ছ মাস আগে আমি ব্যাঙ্ককে যাই। সেখানে জেনারেল তেরাউচি, চন্দ্র বোস এবং লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা চার জনে মিলে পরিস্থিতির আলোচনা করি। সেই আলোচনার ফল স্বরূপ চন্দ্র বোস দক্ষিণাঞ্চলে জাপ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে সম্মত হন। তখন জাপ সামরিক মহলে এ ধরণের একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, চন্দ্র বোস যদি জাপানে না এসে অন্য কোথাও যেতে পারেন, যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন, তা হলে সেটাই হবে সব থেকে ভাল ব্যবস্থা। কারণ, জাপানে এলে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে। সুতরাং তাঁর পক্ষে খুবই ভাল হবে যদি তিনি রুশ মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে চলে যেতে পারেন। এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্র বোস সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই মাঞ্চুরিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।' লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল তাকাকুরা এতটা বলার পর একজন কৌশলী তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন ঃ তাহলে কি আমরা এটা ধরে নেব যে নেতাজীর দাইরেন হয়ে রাশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনাটা টোকিওর সদর দপ্তর মেনে নিয়েছিল, এবং তাদের সম্মতি অনুযায়ীই লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল শীদেয়ীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল নেতাজীর সঙ্গে যাবার জন্য?' কৌশলীর প্রশ্নের

উত্তরে তাকাকুরা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে: 'হ্যাঁ, সদর দপ্তরের অনুমতি নিয়েই সব কিছু ঘটেছিল।'

এবার আসুন, আর একজন সাক্ষী এ ব্যাপারে কি বলছেন তা শোনা যাক। এই ভদ্রলোককে আপনারা প্রত্যেকেই চেনেন, প্রত্যেকেই তাঁর নাম ইতিপূর্বে বহুবার শুনেছেন। ভদ্রলোকের নাম এস. এ. আইয়ার; ইনি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে তিনি বলেছেন: 'বারই অগস্ট নেতাজী সেরামবান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবার পরই আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ঘরোয়াভাবে আলোচনা শুরু হল। তের, চোদ্দ, পনের তারিখ পর্যন্ত দফায় দফায় চলল এই বৈঠক। এই বৈঠকগুলোর প্রায় সবকটাতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে নেতাজীর রাশিয়ায় পৌঁছবার পরিকল্পনাটা নিয়ে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করলাম। আমাদের সামনে তখন মূল প্রশ্ন ছিল, নেতাজী শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় পৌঁছতে পারবেন কি না? এবং যদি না পৌঁছতে পারেন, তা হলে সেই পরিস্থিতিতে কি করা হবে?' শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হল সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী আইয়ার বলেছেন: 'বৈঠকে চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল যে, নেতাজী সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাবেনই, যেভাবেই হোক কোন রুশ দখলীকৃত এলাকায় তিনি পৌঁছবেনই, এবং তারপর সেখান থেকে মূল রুশভূমিতে পদার্পণের জন্য তিনি সব রকমের চেষ্টাই চালিয়ে যাবেন।'

শ্রী আইয়ারের সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এবার আপনাদের সামনে জাপানের আত্মসমর্পণের ঠিক আগের দিনগুলোর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরতে চাইছি। কারণ, আমি মনে করি, নেতাজীর অন্তর্ধানের চূড়ান্ত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আগে থাকতে পরিষ্কার কোন ধারণা না থাকলে আপনাদের পক্ষে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্যই কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই আমি চেষ্টা

করব, সে সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে যাতে আপনারা একটা স্পষ্ট চিত্র পেতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেই চরম মুহূর্তে সংঘটিত কেবলমাত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেই যথাযথ তথ্যপ্রমাণ সহ আপনাদের সামনে তুলে ধরবার। এবং আমি আশা করব আপনারা সেই কাহিনী যথেষ্ট আগ্রহ সহকারেই শুনবেন। তাছাড়া এই মামলার নিরপেক্ষ বিচারের জন্য সেই কাহিনীটুকু জানাও তো আপনাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমেই বলে রাখি, এ কাহিনী বলার সময়, কোন অনুমান কিংবা কল্পনার ওপর নির্ভর করে আমি কোন মন্তব্য করব না ; যা বলব, জানবেন, তার প্রত্যেকটার পেছনে কোন না কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছেই। আমার কাজ হবে, শুধুমাত্র সেই তথ্যপ্রমাণ-গুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করা, যাতে তার মধ্য থেকেই আপনারা সেই সময়ের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পেয়ে যেতে পারেন ; যাতে আপনারা অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারেন যে, সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে কী অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আজকের এই মামলার হারিয়ে যাওয়া সেই হতভাগ্য মানুষটি তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কী দুর্বার আশায় বুক বেঁধে তখনও তিনি বন্দিনী ভারতমাতাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করার স্বপ্ন দেখছিলেন, কী প্রচণ্ড শক্তিতে একটার পর একটা বাধাকে অতিক্রম করছিলেন, এবং তারই মধ্যে কী ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে প্রতিটি কর্তব্য পালন করে চলেছিলেন !

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, অনুগ্রহ করে আমায় অনুমতি দিন, আমি সেই মহামানবের মহান কাহিনী বলা শুরু করি।

এই কাহিনীর ভিত্তিভূমিতে পৌঁছতে হলে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে আজ থেকে তিন যুগ আগের একটা বিশেষ দিনে। সেটা উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের দশই অগস্ট। নেতাজী তখন সেরামবানে। একটা বিশেষ কাজে বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই

তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক ছিল, দু দিন থেকেই ফিরে আসবেন সায়গনে। কিন্তু একটা অসাধারণ কর্তব্যবোধ তাঁকে সেখানে দু দিনের জায়গায় আটকে রাখল পুরো দুটো সপ্তাহ।

ঘটনাটা ছিল একজন চীনা গোয়েন্দার বিচার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে নাকি ছলে-বলে-কৌশলে একজন আজাদী অফিসারকে হাত করে তার কাছ থেকে বেশ কিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত নথিপত্র হাতড়ে নিয়ে সেগুলোকে শত্রুপক্ষে পাচার করে দিয়েছিল। সেই গুরুতর অভিযোগেই সামরিক আদালতে বিচার চলছিল তার; আর সেই সঙ্গে বিচার চলছিল সেই আজাদী অফিসারটিরও।

বিচারকের আসনে ছিলেন তিনজন প্রখ্যাত আজাদী অফিসার—মেজর জেনারেল আলাগাপ্পান, কর্ণেল হবিবুর রহমান এবং কর্ণেল নাগার। কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ জাপ-সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা নাকি এ মামলার বিচারের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছিলেন; এমন কি তাদের নাকি এ-ও দাবি ছিল যে অভিযুক্ত আজাদী অফিসারটির বিচার আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক আদালতই করুক, তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু চীনা গোয়েন্দাটির বিচার এই আদালত করতে পারবে না, তাকে তুলে দিতে হবে জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। কারণ, প্রথমতঃ সে ভারতীয় নয়; দ্বিতীয়তঃ, তার কার্য-কলাপের দ্বারা জাপানের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব, আইন মাফিক তার বিচারের একমাত্র অধিকারী জাপ-সামরিক আদালত।

ঘটনাটা শুনে আপনাদের কি মনে হচ্ছে? এটা নিতান্ত একটা সাধারণ ঘটনা নয় কি? এর জন্য নেতাজীর মত এক জন কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে দু দুটো সপ্তাহ সেরামবানে গিয়ে বসে থাকাটা একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি হয়নি কি?

প্রশ্নটা আপনাদের মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। আমি যখন এ

ঘটনাটা প্রথম শুনেছিলাম, তখন আমার মনেও ওই একই প্রশ্ন জেগেছিল, আমিও মনে মনে বলেছিলাম—নেতাজীর মত একজন মানুষের পক্ষে সেই সঙ্কট-মুহূর্তে ওভাবে দু দুটো সপ্তাহ এমন অ-কাজে ব্যয় করাটা মোটেই উচিত হয়নি—এটা ওনার একটু বাড়াবাড়িই বটে!

কিন্তু না, ধারণাটা আমার পালটে গেল কয়েকদিন পরে—দিল্লীতে এক আজাদী সৈনিকের কাছ থেকে যখন জানলাম আসল ঘটনাটা। সেই আজাদী সৈনিকটি আমাকে বলেছিলেন: 'আসলে গণ্ডগোলটা ঘটেছিল গোয়েন্দাটির জাত নিয়ে। সে যদি জাতে পুরুষ হত, তাহলে আমি নিশ্চিত, এ ব্যাপারে নেতাজী মোটেই মাথা ঘামাতেন না, তিনি ব্যাপারটা আলাগাপ্পান, হবিবুর এবং নাগারের ওপরই ছেড়ে দিতেন পুরোপুরি ; তাঁদেরই বলতেন, অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা করে ফেলবার জন্য। কিন্তু যেহেতু গোয়েন্দাটি জাতে ছিল নারী—নেতাজীর কাছে যার একমাত্র পরিচয় মায়ের জাত ছাড়া আর কিছুই নয়—সে কারণেই তিনি দু দুটো সপ্তাহ ওই একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন ; দিনের পর দিন জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র একটা প্রশ্নে—মেয়েটিকে তিনি তাদের হাতে তুলে দেবেন কি দেবেন না। কারণ, তিনি জানতেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ জাপানীদের হাতে মেয়েটিকে তুলে দিলে তাকে শুধু জীবনটাই নয়, তার কৃতকর্মের ঋণ শোধ করতে নারীত্বের সঞ্চিত ভাণ্ডারটাকেও উজাড় করে দিতে হত। তাই, শত্রুপক্ষের লোক হওয়া সত্ত্বেও অত সব জরুরী কাজ ফেলেও সেই মেয়েটির সম্মান রক্ষার লড়াইতে তিনি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছিলেন—দিনের পর দিন জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের যুক্তির জালকে ছিন্নভিন্ন করার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। এবং শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইতে জয় হয়েছিল তাঁরই—তিনি মেয়েটির বিচার আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক আদালতেই করাতে পেরেছিলেন।'

সম্পূর্ণ ঘটনাটা তো শুনলেন। হে মাননীয় বিচারপতিগণ, এবার বলুন, সব কিছু জানার পর এখন আপনাদের অভিমত কি? এখনও কি আপনারা মনে করেন যে, নেতাজী সেদিন একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করেছিলেন? এখনও কি আপনারা বলবেন যে, সেদিন-কার সেই ঘটনাটা ছিল একটা নিতান্তই সাধারণ ঘটনা?

যাই হোক, যা বলছিলাম। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা কমে এলেও সামরিক বিধি নিষেধের কোন কমতি ছিল না তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও। সেরামবানও তা থেকে বাদ যায়নি। তার সারাটা দেহ তখনও ঢেকে আছে ব্ল্যাক আউটের কালো ওড়নায়। বাইরে কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই—চারদিকে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই সীমাহীন অন্ধকারের সমুদ্রের মাঝে ছোট্ট টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে একটা সুরক্ষিত বাংলোর অপ্রশস্ত এক কক্ষে। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন আলোর নীচে বসে অতন্দ্র প্রহর জাগার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেশ নীচু স্বরে আলাপ আলোচনা করে চলেছেন কয়েক জন নিশাচর মানুষ। তাদের প্রত্যেকের চোখে-মুখে তখন উদ্বেগের ঘন ছায়া, প্রত্যেকের কপালেই চিন্তার সুস্পষ্ট রেখার দীপ্ত বিচরণ। সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে কেউ যদি পলকের জন্যও তাদের প্রতি একবার অলস দৃষ্টিপাত করত, তা হলে এ কথা বুঝে নিতে তার মোটেই কষ্ট হত না যে কী এক ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত ওই মানুষ ক জন তখন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করছেন! কী অস্থিরতার ঝঞ্ঝাঘাতে তাদের উত্তাল হৃদয় তখন বিস্ফোরিত হওয়ার প্রতীক্ষা করছে!

ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল। মনে হল যেন ঘরের মধ্যে বাজ পড়েছে; সেই বাজের শব্দে টিমটিমে আলোর তলায় বসে থাকা মানুষগুলো চমকে উঠে যেন ছিটকে পড়লেন। এক জন ঝাঁপিয়ে পড়লেন

ফোনটার ওপর ; শক্ত থাবাটা দিয়ে চেপে ধরলেন তার সেলুলয়েডের দেহটাকে। তারপর, একরকম ভয়ার্ত স্বরেই বললেন: 'ইয়েস, সেরামবান হেড-কোয়ার্টার্স।'

সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল: 'ট্রাঙ্ক কল ফ্রম কুয়ালালামপুর।'

ফোনটা যিনি উঠিয়েছিলেন তার হাতের থাবা শিথিল হয়ে এল। তিনি বললেন: 'অল রাইট, হোল্ড দ্যা লাইন প্লিজ।'

ও প্রান্ত থেকে কথা বলছিলেন মেজর জেনারেল কিয়ানি—অন্ধকারের ছায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে এ প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন আজাদ হিন্দ ফৌজের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। গলার স্বরটাকে বেশ স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন: 'ইয়েস, বোস স্পিকিং।'

সেই মুহূর্তেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল একটা হৃদয় কাঁপান সংবাদ। কিয়ানি বললেন: 'স্যার, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

খবরটা শুনে নেতাজী কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন: 'এনিথিং মোর?'

কিয়ানি জবাব দিলেন: 'নো স্যার, দ্যাটস্ অল।'

নেতাজী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর সে রকম ধীর পদক্ষেপেই আবার এগিয়ে এলেন টিমটিমে আলোটার নীচে। নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসলেন ঠিক আগের মত করেই। এবার শুধু একটা ছোট ব্যাতিক্রম ঘটল—পা দুটোকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে—বেশ আলতোভাবে, বেশ স্বাভাবিক কায়দায়।

সামনে বসা সহকর্মীদের চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া ইতিমধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গেছে। আরও কিছু ভয়াবহ খবর শোনার জন্য এইটুকু সময়ের মধ্যেই তারা যেন নিজেদের তৈরি করে ফেলেছেন—এখন অপেক্ষা শুধু শোনার।

টপবুটের ফিতেটাকে আলগা করতে করতে নেতাজী বললেন: 'শেষ পর্যন্ত সেই অঘটনটাই ঘটল।'

একজন প্রশ্ন করলেন: 'কোন অঘটন?'

নেতাজী জবাব দিলেন: 'রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

অন্ধকারে বসে থাকা সবকটি মানুষের দেহ যেন এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। মনে হল, যেন ঘরের মধ্যে একটা ভূমিকম্প ঘটল। মনে হল, সেই মুহূর্তেই হয়ত ধরিত্রী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে—হয়ত টিমটিমে আলোর অন্ধকার থেকে সব কজন মানুষ একই সঙ্গে চির-নিস্তার পাবেন—হয়ত মাতা বসুমতী তাদের একই সঙ্গে নিয়ে যাবেন চির অন্ধকারের রাজত্বে।

হে মাননীয় আদালত, আমার কথা শুনে আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন যে আমি সাহিত্য করার চেষ্টা করছি; হয়ত আপনারা এ-ও ভাবছেন যে আমি ভাষার মোহজাল বিস্তার করে আপনাদের প্রভাবিত করতে চাইছি। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন, সেই হতভাগ্য মানুষটির নামে শপথ করে আমি বলছি, সেই ঘটনা সম্পর্কে আমি এতটুকু অতিরঞ্জন করছি না, সেই ঘটনাকে এতটুকু কাব্য-মণ্ডিত করবার চেষ্টা করছি না। যা ঘটেছিল সেটুকুকেই শুধু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি; সেইটুকুকেই প্রকাশ করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এবং আমি হলফ করেই বলতে পারি, আমার বর্ণনাশক্তির সীমা এত দূর-প্রসারী নয় যে আমি আপনাদের সামনে সেদিনকার সেই ঘটনাবলীর যথাযথ চিত্র তুলে ধরতে পারব। আমার সংগৃহীত শব্দভাণ্ডারের ক্ষমতা এখনও এমন সু-উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়নি যে আমি সেদিনকার সেই মানুষ-গুলোর মনের চিন্তার তুফানকে আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারব। আসলে বলতে কি, আমার নিজস্ব চিন্তায় আমি যতদূর পৌঁছতে পেরেছি, তাতে এটুকু অন্ততঃ আমার বোধগম্য হয়েছে

যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন ভাষা, এমন কোন শব্দ আবিষ্কৃত হয়নি যে শব্দে, যে ভাষায় সেদিন সেই সঙ্কটময় মুহূর্তকে, সেই সঙ্কটাপন্ন মানুষগুলোর মনের অবস্থাকে, সেই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। তাই বলছিলাম, আমি আপনা-দেরকে যতটুকু বলছি, জানবেন, সে হচ্ছে আসল পরিস্থিতির এক শতাংশও নয়। তবু এর দ্বারা সেই ঘটনার বিন্দুমাত্র উপলব্ধিও যদি আপনাদের হয়; তবে জানবেন, সেটাই হবে আপনাদের অনেক পাওয়া—অনেক লাভ।

চোখের পাতা বন্ধ করে একটু ভেবে দেখুন—একটা অন্ধকার জগতের মাঝখানে বসে রয়েছেন কয়েকজন মানুষ, যাদের সামনে তখন আরও গভীর-গভীরতর অন্ধকার—আর পেছনে পড়ে রয়েছে ফেলে আসা ঘর-সংসার-দেশ-মাটি-মানুষ। অথচ সেই অন্ধকারের মাঝখানে বসেই তাঁরা স্বপ্ন দেখে চলেছেন: একদিন আবার সবাই মিলে ফিরে যাবেন সেই দরিদ্র স্বদেশে; একদিন আবার সবাই মিলে খুঁজে পেতে নতুন করে ঘর বাঁধবেন সেই পুরান ঘরেই; একদিন আবার সবাই মিলে প্রথম থেকে শুরু করবেন নবীনের যাত্রা। আবার আলো জ্বলবে, আবার শঙ্খ বাজবে—আবার আকাশে ফুটবে দেওয়ালীর রোশনাই। তবু তারই মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ঘটছে আক্রমণ—অন্ধকারের দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে আততায়ী—প্রতিহত করার আগেই সে তার ধারাল অস্ত্রটাকে বসিয়ে দিচ্ছে ওঁদের দেহে—ওঁদের হৃদপিণ্ডের একেবারে কাছাকাছি। কিন্তু তাই বলে কি ওঁরা অসহায়ের মত বসে থাকবেন চুপচাপ! তাই বলে কি ওঁরা একবারও উঠে দাঁড়াবেন না?

না, তা অসম্ভব; উঠে ওঁদের দাঁড়াতে হবেই! না হলে যে আর কখনও ওঁদের ঘরে ফেরা হবে না—আর কখনও যে পায়ের শেকল ভাঙ্গার সুযোগ পাবেন না ওঁরা।

হঠাৎ সেই আলো-অন্ধকারের বুক চিরে বের হয়ে এল এক

গম্ভীর কণ্ঠস্বর ! স্বাভাবিক গলায় নেতাজী আইয়ারকে বললেন : 'আইয়ারজী, খবরটা সম্পর্কে আমাদের স্থির-নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আপনি কাল সকালেই বের হয়ে পড়ুন এখান থেকে। কুয়ালালামপুরে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানুন ঘটনাটা আসলে কী ঘটেছে।'

নেতাজীর নির্দেশ শুনে আইয়ার বললেন : 'ঠিক আছে স্যার, আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি কাল সূর্য ওঠার আগেই বের হয়ে পড়ব।'

যেমন কথা তেমন-ই কাজ। রাত ভোর না হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন আইয়ারজী। দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিলেন জামা-কাপড় পরে। ওদিকে ড্রাইভারও তার গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। আইয়ার এসে গাড়িতে বসলেন; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটে চলল কুয়ালালামপুরের পথে।

কুয়ালালামপুরে পৌঁছে প্রথমে গেলেন 'মালয় সিম্বুম' পত্রিকার অফিসে, সেখান থেকে দোমেই নিউজ এজেন্সির দপ্তরে, তারপর আই. আই. এল এর সদরঘাঁটিতে এবং আরও দু একটা জায়গায়। মোটামুটি প্রয়োজনীয় সব খবর যখন জানা হয়ে গেল তখন আবার যাত্রা শুরু করলেন সেরামবানের পথে।

সেরামবানে ফিরে এলেন যখন তখন ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘরে। নেতাজী সেই সকাল থেকে অধীর প্রতিক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন আইয়ারজীর ফেরার পথ চেয়ে। এতক্ষণে তাঁর সেই প্রতিক্ষার অবসান হল ; আইয়ারজী ফিরে এলেন তাঁর কাজ সেরে।

নেতাজী জানতে চাইলেন : 'খবর কি ?'

আইয়ারজী বললেন : 'কিয়ানি যা বলেছেন, তা ঠিক—রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দোমেই নিউজ এজেন্সি খবর দিয়েছে, রুশ সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়ার ভেতরে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।'

একটু পরেই মেজর জেনারেল কিয়ানির কাছ থেকে বার্তা এল :

যেভাবেই হোক নেতাজী যেন অতিদ্রুত সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন—খুব জরুরী প্রয়োজন।

কথাটা শুনে নেতাজী বেশ বিরক্ত হলেন। বললেন : 'ওরা যা-খুশি সিদ্ধান্ত নেয় নিক, তাতে আমাদের কি? আমাদের সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা কিসের? আমাদের কাজ যেমন চলছে, আমরা তেমন-ই চালিয়ে যাব। আমরা আত্মসমর্পণ করব কি করব না—সেটা আমাদের ব্যাপার; এ সম্পর্কে অন্য কারও সিদ্ধান্ত নেবার কোন অধিকারই নেই।' তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন; জমে থাকা ফাইল-পত্রগুলো একটার পর একটা দেখে শেষ করলেন। শেষে বিকেলের দিকে গেলেন সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকে—সেখানে ঘণ্টাখানেক থেকে আবার ফিরে এলেন নিজের বাংলোতে।

রাতে খাওয়ার সময় সবাই এক সঙ্গে বসলেন। কথায় কথায় নেতাজী বললেন : 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়ার যেমন দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে, তাতে মনে হয়, জাপানের পক্ষে আর বেশি দিন এ লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না; যে-কোন মুহূর্তেই ওরা আত্মসমর্পণ করে বসতে পারে।'

নেতাজীর মন্তব্য শুনে একজন প্রশ্ন করলেন : 'সেক্ষেত্রে আমরা কি করব?'

নেতাজী উত্তর দিলেন : 'আগে ওরা আত্মসমর্পণ করুক, তারপর ভেবে দেখা যাবে আমরা কি করব।'

ওই পর্যন্তই; এরপর এ সম্পর্কে আর কোন কথা হল না। নেতাজী খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলেন নিজের ঘরে; অন্যান্যরা শুতে গেলেন যার যার বিছানায়।

ড্রইং রুমের সেই ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। একজন ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে জানতে চাইল : 'হু ইজ স্পিকিং?'

অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এল : 'ইট ইজ ডক্টর লক্ষ্মনায়া ফ্রম মালাক্কা।'

এ প্রান্তের কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল ঃ 'কি খবর ? এত রাতে !'

ডাক্তার লক্ষ্মনায়া বললেন ঃ 'একটা খুব জরুরী খবর আছে। নেতাজীকে বলবেন, তিনি যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন। আমি এবং মিস্টার গণপতি এখনই রওয়ানা দিচ্ছি ; আশা করছি, রাত দুটোর মধ্যেই সেরামবানে পৌঁছে যেতে পারব।'

সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পৌঁছে দেওয়া হল নেতাজীকে। নেতাজী তখন সবেমাত্র শুতে যাচ্ছিলেন। বললেন ঃ 'কী এমন জরুরী খবর আছে যে ওরা এই রাত্তে অতদূর থেকে এখানে ছুটে আসছেন !'

কেউই বলতে পারলেন না যে খবরটা কি। কারণ, ডাক্তার লক্ষ্মনায়াও খবরটা ফোনে জানাতে রাজি হননি। তাই ঔৎসুক্যটা সবার আরও বেড়ে গেল। প্রত্যেকের চোখের পাতার ঘুম গেল উবে দেখতে দেখতে। সবাই সেই টিমটিমে আলোটার তলায় বসে গবেষণা করতে লাগলেন কী এমন খবর আছে যা ফোনে বলা গেল না ? কী এমন জরুরী বার্তা বয়ে আনছেন ডাক্তার লক্ষ্মনায়া ?

হঠাৎ গাড়ির শব্দ শোনা গেল বাইরে। প্রত্যেকের কান খাড়া হয়ে উঠল মুহূর্তে। দেখতে দেখতে বুকের স্পন্দন বেড়ে হল দ্বিগুণ।

হ্যাঁ, তারা ঠিকই ধরেছেন—ডাক্তার লক্ষ্মনায়া আর শ্রীগণপতিই এসেছেন গাড়িতে। সুতরাং সবাই নড়েচড়ে বসলেন। সবাই ঠিক হয়ে নিলেন সেই প্রতিক্ষিত খবরটা জানবার জন্য। মনে মনে বললেন, এবার জানা যাবে খবরটা কী, এবার বোঝা যাবে কেন দু জন নিশাচর মানুষ এই গভীর নিশিডাকা রাতে সেই সুদুর মালাক্কা থেকে ছুটে এসেছেন সেরামবানে ?

'হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমি তো এতক্ষণ ধরে সেই ঘটনার অনেকটাই বললাম আপনাদের। এবার আপনারাই একটু দেখুন না, নিজে থেকে চেষ্টা করে কিছু বলতে পারেন কি না ? ভেবেই দেখুন না, সেদিন এমনকি ঘটনা থাকতে পারে যার জন্য সেই কালো রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছত্রখান করে দু দুজন দায়িত্বশীল মানুষ সুদুর

মালাক্কা থেকে ছুটে এসেছিলেন সেরামবানে? কী এমন অঘটন ঘটে থাকতে পারে যার জন্য নেতাজীর মত মানুষ বিছানায় শুতে গিয়েও শোননি? কী এমন মারাত্মক খবর থাকতে পারে যার জন্য সে রাতে কেউ চোখের পাতা এক করতে পারেন নি?

একটু চেষ্টা করুন, একটু গভীরভাবে ভাবুন, দেখবেন উত্তর হয়ত পেয়েও যেতে পারেন। হয়ত আপনারাই বলে দিতে পারবেন সেই রহস্য-জনক খবরটা কি ছিল? হয়ত আপনাদের পক্ষেই আবিষ্কার করা সম্ভব হবে, ডক্টর লক্ষ্মনায়া এবং শ্রীগণপতির আগমনের কারণ. হয়ত আপনারাই বুঝতে পারবেন, সেই গাড়ির শব্দে চমকে ওঠা রাতজাগা মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন কি না?

কি, পারছেন না? আপনাদের মধ্যে কেউ-ই সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা অনুমান করে উঠতে পারছেন না? এমন একটা অসাধারণ ঘটনার কথা আপনাদের মধ্যে কারোই স্মরণে আসছে না?

তাহলে আর কি হবে বলুন—তবে আমাকেই সেটা বলতে হয়।

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়, একটু আগেই আমি বলেছিলাম, নেতাজী খেতে বসে বলেছিলেন: মাত্র 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়ার যেমন দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে, তাতে মনে হয়, জাপানের পক্ষে আর বেশিদিন এ লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না; যে কোন মুহূর্তেই ওরা আত্মসমর্পণ করে বসতে পারে।' আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছিল তাই; জাপান সত্যি সত্যিই আত্মসমর্পণ করে বসেছিল মিত্রশক্তির কাছে। অ্যাটম বোমার প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তার দেহটাকে সে আর ধরে রাখতে পারেনি শত চেষ্টা করেও; দিনের পর দিন বহু কসরতে তৈরি শক্ত মেরুদণ্ডটাকে আর কিছুতেই সে সোজা করে রাখতে পারেনি হিরোসিমার ভয়াবহ ধাক্কা খাওয়ার পর। তার মানসিক শক্তির শেষ ভারসাম্যটুকুও তছনছ হয়ে গিয়েছিল ষাট হাজার জাপানী

শিশুর বুক ফাটা আর্তনাদে। তাই, শেষ পর্যন্ত তাকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন জোটের কাছে ; বিনাশর্তেই মেনে নিতে হয়েছিল চরম লাঞ্ছনা।

আসলে সেই হৃদয় বিদারক সংবাদটাই বয়ে নিয়ে এসেছিলেন লক্ষ্মনায়া আর গণপতি ; সেই মর্মান্তিক খবরটা জানাতেই তাঁরা ছুটে এসেছিলেন মালাক্কা থেকে সেরামবানে ; সেই চরম পরিণতির বার্তাটাই তাঁরা পৌঁছে দিতে এসেছিলেন নেতাজীর কানে।

সেদিন সে খবরটা শুনে নেতাজী প্রথম কি মন্তব্য করেছিলেন সেটা জানতে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে করছে, তাই না ? হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, কথাটা কি আমি বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলছি ? আপনাদের ঔৎসুক্য পরিমাপ করতে গিয়ে আমি কী এতটুকুও বাচালতা দেখাচ্ছি ? আপনারাই বলুন, সেদিনের সেই ঐতিহাসিক কথাটা শোনবার জন্য আপনারা কি সত্যি সত্যিই আগ্রহবোধ করছেন না ? আপনারা কি সত্যি সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়েননি ? বলুন, আমার এ অনুমান কি ভুল ? আমার এ সিদ্ধান্ত কি কোন রকম অত্যুৎসাহিতার দোষে দুষ্ট ?

হে মহামান্য আদালত, আমার এতগুলো প্রশ্ন সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আপনারা যে মৌনতা অবলম্বন করে আছেন, আপনাদের সেই মৌনতাই একথা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, না, আমার অনুমান বিন্দুমাত্র ভুল নয় ; আমার ধারণা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। আমার মনে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই যে, আপনারা সত্যি সত্যিই জানতে চাইছেন, নেতাজী সেদিন সেই ভয়ঙ্কর খবরটা শোনার পর প্রথম কি-বলেছিলেন ? তাঁর মুখ থেকে প্রথম কোন বাক্যমালা বেরিয়ে এসেছিল সেই মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে ?

একটু অপেক্ষা করুন, হে মাননীয় বিচারকবৃন্দ, আমাকে একটু সময় দিন। আমাকে স্মরণ করতে দিন সেই বজ্রাহত মুহূর্তটির কথা ; আমাকে চিন্তা করতে দিন সেই প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ের

ক্ষণটিকে ; আমাকে ভাবতে দিন সেই বেদনাহত পরিস্থিতির চিত্রটাকে ; আমাকে কল্পনা করতে দিন সেই সর্বহারা নিঃস্ব মানুষটির বিষণ্ণ মুখটাকে। তারপরে আমি বলছি, হে প্রিয়তম স্বদেশবাসী একটু ধৈর্য ধরুন—আমি বলছি ; আমি বলছি, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তিনি ঠিক কী বলেছিলেন ; আমি বলছি ঠিক কোন কোন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর মুখ নিঃসৃত সেই ঐতিহাসিক বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু তার আগে আপনাদের কাছে নতমস্তকে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন, আমি সেই হারিয়ে যাওয়া অসামান্য মানুষটির সব খোয়াবার মুহূর্তটাকে স্মরণ করে অন্ততঃ এক ফোঁটা নীরব অশ্রু বিসর্জন করে নিই ; অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্য তার চরণে উৎসর্গ করে দিই এ হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা, সবটুকু ভালবাসা, সবটুকু ভক্তি ; অন্ততঃ একবারের জন্য নয়ন মুদিত করে দেখে নিই তাঁর সেই উন্নত শির—সেই রাজবেশ—সেই পৌরুষ—সে শৌর্য।

* * * *

আপনাদের ধন্যবাদ, মাননীয় আদালত, এবার শুনুন—সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে আজকের এই মামলার প্রধান পুরুষ হারিয়ে যাওয়া সেই ভারত-পথিক সেদিন কি বলেছিলেন ; সেদিন কোন শব্দ-তরঙ্গ তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এসেছিল জিহ্বার পিচ্ছিল পথ বেয়ে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বিধাতা পুরুষ আমাকে এমন ক্ষমতা দেননি যে ক্ষমতার বলে আমি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির হুবহু বর্ণনা করতে পারি। তাই, সৃষ্টিকর্তা যাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছেন তাদেরই একজনের ভাষা চুরি করে নিয়ে বলি : 'অবিচলিত চিত্তে' সংবাদটা শুনলেন নেতাজী ; তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এল শুধু একটা অস্ফুট শব্দ "হুঁ"। পর মুহূর্তেই তিনি তলিয়ে গেলেন গভীরতম চিন্তায়। এভাবে কাটল কয়েক সেকেণ্ড ; তারপর তিনি আবার সেই পুরান মানুষ ; সেই মৃত্যুঞ্জয়ী

নির্ভীক নেতাজী। মৃদু ম্লান হাসির পরশে ভরে উঠল তাঁর ওষ্ঠাধর; তিনি হাসলেন। তারপর, তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল সুর-ঝঙ্কার: "তা হলে ঘটনাটা হচ্ছে এই! এখন প্রশ্ন হল, এরপর কি করা যায়।"

হ্যাঁ মাননীয় আদালত, সেই ভয়াবহ সংবাদ শোনার পর ওইটাই ছিল নেতাজীর মুখ নিঃসৃত প্রথম বাক্য। যেহেতু আমার ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, যেহেতু পরিস্থিতির যথাযথ বর্ণনে আমি অপারগ, তাই আর একজনের কাছ থেকে কথাগুলো ধার করে নিয়ে আমি আপনাদের শোনাতে বাধ্য হলাম—আর একজনের আত্মজীবনীর অনবদ্য পঙ্‌ক্তিগুলো হুবহু মুখস্থ করে আপনাদের বললাম। সাথে সাথে আপনাদের কৌতূহল নিরসনের জন্য এ-ও বলি, যাঁর কাছ থেকে ওই কথাগুলো ধার করেছি, তিনি এই মামলারই একজন সাক্ষী। ভদ্রলোকের নাম শ্রী এস. এ. আইয়ার, আর তাঁর লেখা সেই অসাধারণ আত্মজীবনীটির নাম: 'আনটু হিম এ উইট্‌নেস'। আশা করি, সবকিছু জানার পর এবার আপনারা আমার অপারগতাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খেতে বসে কথায় কথায় নেতাজী যে অনুমানের কথাটা বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেটাই বাস্তবে পরিণত হল—জাপান মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। সংবাদটা শোনার পর প্রথম ধাক্কার ঘোর কাটাতে সত্যিই একটু সময় লাগল। শেষে ঘোর কেটে গেল লক্ষ্মণায়। গণপতি, আইয়ার এবং নেতাজীর মধ্যে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শুরু হল এক দীর্ঘ আলোচনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল সেই আলোচনা। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। শেষে ঠিক হল, সেদিনই সকালে সবাই মিলে রওয়ানা দেবেন সিঙ্গাপুরের পথে। সেখানে গিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক আহ্বান করা হবে এবং সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে আগামী দিনগুলোর ইতিকর্তব্য।

যথাসময়ে শুরু হল যাত্রা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে, নেতাজী, আইয়ার, লক্ষ্মণায়া, গণপতি, ভাস্করণ—সবাই চেপে বসলেন গাড়িতে। গাড়ি ছুটে চলল সেরামবান থেকে সিঙ্গাপুরের পথে। মালয়ের ছোট্ট প্রদেশ নেগরী সেমবিলানের ততোধিক ছোট রাজধানী সেরামবান পড়ে থাকল পেছনে—গাড়ি এগিয়ে চলল দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে; কুয়ালালামপুর—সিঙ্গাপুর রোড ধরে সোজা জোহর বারু সেতুর সড়কে। অবশেষে ওঁরা যখন খোদ সিঙ্গাপুরে এসে পোঁছলেন তখন পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত সূর্যের শেষ রেখাটুকুও বিলীন হয়ে গেছে—শুধু আকাশের এদিকে-ওদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা নাম না জানা তারা—আর তার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে টিমটিম করে জ্বলে চলেছে রাস্তার দু পাশের লাইটপোস্টের ঠুলি পরা বাতিগুলো।

সিঙ্গাপুরে পোঁছবার পরেই শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। একটার পর একটা অনুষ্ঠান, একটার পর একটা বৈঠক, একটার পর একটা সাক্ষাৎকার। নেতাজী সিঙ্গাপুর ফিরে এসেছেন শুনে অনেকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন—অনেকেই তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, এই পরিস্থিতিতে তাদের কি কর্তব্য, তারা এরপর কি করবেন—ইত্যাদি হাজার বিষয়। সবার সব প্রশ্নের জবাব দিলেন নেতাজী—সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে বুঝিয়ে দিলেন যার যার ইতিকর্তব্য।

ঠিক এই সময়েই বসেছিল মন্ত্রীসভার সেই স্মরণীয় বৈঠকগুলো, যে বৈঠকের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাদের এই মামলার সাত নম্বর সাক্ষী শ্রী এস. এ. আইয়ার আপনাদের কাছে স্বীকার করেছেনঃ 'বৈঠকে চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল যে, নেতাজী সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাবেনই, যেভাবেই হোক কোন রুশ দখলীকৃত এলাকাতে তিনি পৌঁছবেনই, এবং তারপর সেখান থেকে মূল রুশ-ভূমিতে পোঁছবার জন্য তিনি সর্বপ্রকারের চেষ্টাই চালিয়ে যাবেন।'

সেই বৈঠকগুলোর আরও কিছু বিস্তৃত বর্ণনা আমি আপনাদের শোনাতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু একটা পারিপার্শ্বিক ঘটনার বিবরণও আমি দেব, যাতে সেই কর্মব্যস্ত দিনগুলোর মোটামুটি একটা ধারণা আপনারা করে নিতে পারেন মনে মনে।

এখানে এসে আমাকে আবার একটু ঋণ প্রার্থী হতে হচ্ছে। আজ থেকে বছর দুয়েক আগে, এক আজাদী সৈনিকের মুখে শুনেছিলাম নেতাজীর সিঙ্গাপুরের সেই শেষ দিনগুলোর কাহিনী। অসাধারণ যাদুকরী ভাষায় সেই আজাদী সৈনিক আমাকে শুনিয়েছিলেন তাঁর স্মৃতিকথা। বলেছিলেনঃ 'এরই মধ্যে আবার একটা দাঁত তুলে ফেলতে হল তাঁকে। দাঁতটা নিয়ে সত্যিই বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি ; তাই ডাক্তারকে ডেকে বললেন, দাঁতটা তুলে দিতে। চোদ্দ তারিখ বিকেলে ডাক্তার এসে তুলে দিলেন দাঁতটা ; যাবার সময় বলে গেলেন, অন্ততঃ একটা দিন যেন পূর্ণ বিশ্রাম নেন নেতাজী। কিন্তু কোথায় বিশ্রামের সময় ! তখন কি আর বিশ্রাম করা সম্ভব তাঁর পক্ষে। তাঁর হাতে তখন কত কাজ, কত অসমাপ্ত বিষয় পড়ে রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপেক্ষায়। তার ওপর আবার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন, ওই দিনই সন্ধ্যায় রানী ঝাঁসি বাহিনীর পক্ষ থেকে যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে তাতে পৌরহিত্যে করতে হবে স্বয়ং নেতাজীকেই ; না হলে ওরা নাকি মনে মনে বড্ড দুঃখ পাবেন। সুতরাং তাঁকে অনুষ্ঠানস্থলে যেতেই হল।

'অনুষ্ঠান মঞ্চে তিনি যখন পৌঁছলেন তখন জনতা বিপুল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল ঃ "নেতাজী জিন্দাবাদ ; আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।" হাত নেড়ে প্রত্যেকের অভিবাদন গ্রহণ করলেন তিনি—তারপর গিয়ে বসলেন দর্শকের আসনে।

'সেদিনের সেই নাটকের নাম ছিল—'ঝাঁসির রানী।' অভিনয় শুরু হলে নেতাজী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই মঞ্চের ঝাঁসির

রানীর দিকে। কী জানি, সেদিন সেই নকল ঝাঁসির রানীই নেতাজীর চোখে বাস্তবের ঝাঁসির রানী হয়ে উঠেছিলেন কিনা। তবে, আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, নেতাজী সেদিন যেখানে তাঁর দলবল সহ বসেছিলেন তার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি এক দৃষ্টিতে দেখছিলাম নেতাজীকে—দেখছিলাম তাঁর ব্যক্তিত্বকে, তাঁর পৌরুষত্বকে।'

নেতাজীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে সেদিন সেই আজাদী সৈনিকটি আমাকে যে কথা বলেছিলেন, সে কথা যদি আমি আপনাদের হুবহু শোনাতে না পারি তবে মনে মনে সত্যিই আমি অতৃপ্ত থেকে যাব। তাই, আপনাদের কাছে অনুরোধ, অনুগ্রহ করে সেই আজাদী সৈনিকটির দেওয়া বর্ণনাটা আপনারা শুনুন। আমি তাঁর বক্তব্যে কোন সংযোজন কিংবা পরিবর্তন ঘটাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করব না ; তিনি ঠিক যে যে শব্দে আমার কাছে তাঁর মনের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন আমি ঠিক সেই সেই শব্দগুলোই আপনাদের সামনে বলে যাব। আমি জানি, আপনারাও তাঁর সেই অনুভূতির বর্ণনা শুনে আমারই মত আনন্দিত হবেন। তিনি বলেছিলেন : 'জীবনে আমি সুন্দর মানুষ অনেক দেখেছি, ব্যক্তিত্ববান পুরুষও কম চোখে পড়েনি কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য, অথচ ধীর-স্থির, শান্ত-সমাহিত পৌরুষত্বের এমন অপরূপ সমাবেশ আমি আর কারও মধ্যে কখনও দেখিনি।' অশ্রুসজল নয়নে সেই আজাদী সৈনিকটি আমাকে বলেছিলেন : 'ইহ জনমে কেন, আগামী শত জনমেও আমি আর কাউকে তাঁর মত শ্রদ্ধা জানাতে পারব না ; তাঁর মত ভালবাসতে পারব না। আমি আল্লার নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি আমার সম্রাটকে যতটা ভালবাসতাম নিজের ছেলেকেও ততটা ভালবাসতে পারিনি। কেউ যদি আজ আমাকে বলে যে, তুমি তোমার ছেলেকে কোরবানি কর, তাহলে নেতাজীকে ফিরে পাবে, তবে খোদাতাল্লার

কসম, আমি এক পলকের জন্যও চিন্তা করব না, নিজের হাতেই নিজের বেটার কোরবানি করব।' কথাগুলো বলতে বলতে সেদিন হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন সেই আজাদী সৈনিক। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিলেন: 'একটুও বাড়িয়ে বলছি না আপনাদের! বাপ হয়ে বেটার কোরবানি দিতে চায় মানুষ কী টানে তা তো বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি যে আর পারছি না। যতবার সেই ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি মনে পড়ে, ততবারই যে হু হু করে ওঠে বুকটা। মনে হয় কী এক পরমাত্মীয় চিরদিনের জন্য আমাদের পথের ভিখিরি করে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। মনে হয়, এরজন্য আমরাই দায়ী। তাঁর কোন কসুর নেই; সব দোষ আমাদের। আমরাই তো তাঁকে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে বেঁধে রাখতে পারিনি; আমরাই তো তাঁকে ঘরছাড়া করেছি; আমরাই তো তাঁকে পাঠিয়েছি চির নির্বাসনে।'

মাননীয় আদালত, এ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী; এবং ইনি এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী যাঁর দর্শন শুধু ঘটনা দেখার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি—তাকে বিশ্লেষণ করা পর্যন্তও পৌঁছেছিল। আমি আপনাদের সামনে এই প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীটুকু তুলে ধরলাম শুধু এই কারণেই যে, এর মধ্য থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন কতবড় একজন মহৎ মানুষের বিরুদ্ধে কী জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে! কত বড় একটি ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে কী নীচ চক্রান্ত!

আপনারা কি ভাবছেন তা আমি জানিনা, তবে এটুকু জানবেন—নেতাজীর ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত করার জন্য আমি এখানে আসিনি—কারণ আমি জানি, নেতাজীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল; তাঁর সঙ্গে আপনাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত আলাপ ছিল, অনেকেই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। সুতরাং আপনাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়াটা হবে মায়ের কাছে মাসীর গল্প বলার মত হাস্যকর ব্যাপার। তাই সে সম্পর্কে

আমি কিছু বলতে চাইছি না। তবে একটা কথা অতি অবশ্যই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব, বাপ হয়ে ছেলের কোরবানি দিতে চায় মানুষ কী টানে সে কথাটা একটু ভেবে দেখবেন—সে কথাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই একটু আলোচনা করবেন। তা হলেই অন্ততঃ কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন যে, কেন নেতাজী যুদ্ধ শেষে ফিরে আসতে পারেননি, কিংবা কেন তাঁকে ফিরে আসতে দেওয়া হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের আর একটা মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মন্তব্যটা করেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক কিংসলে মার্টিন। তিনি নেতাজী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: 'হি উড হ্যাভ বীন এ ডেঞ্জারাস কমপিটিটর হুম দে হ্যাড লার্ণ্ড টু ফীয়ার ইনত্যা ইয়ারস বিফোর দ্যা ওয়র, হোয়েন ইনসাইড কংগ্রেস, হি লেড এ রিভোল্ট অ্যাগেনস্ট গান্ধী অ্যাণ্ড দ্যা আইডিয়াস অব নন ভায়োলেন্স।' সে কারণেই কি তিনি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেলেন? সে কারণেই কি তাঁকে চিরদিনের জন্য রহস্যের বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হল? হে মাননীয় আদালত, আমি আপনাদের বলছি না যে এ সম্পর্কে এখনই কিছু বলুন; তবে অনুরোধ করে রাখছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অনুগ্রহ করে আমার এই বক্তব্যগুলোকে আপনাদের বিচার্য বিষয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবেন।

এতক্ষণ একজন আজাদী সৈনিকের জবানবন্দীতে আপনাদের ঝাঁসির রানী বাহিনীর অনুষ্ঠানের কথা শোনাচ্ছিলাম, এবার আসুন, তার পরবর্তী ঘটনাগুলোর তালে তাল মিলিয়ে আমরা এগিয়ে যাই।

মিউনিসিপ্যাল পার্কে অভিনয় চলাকালীন হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে আবির্ভূত হলেন একজন সুপরিচিত মানুষ। ভদ্রলোকের নাম শ্রী এ. এন. সরকার; পদমর্যাদায় তিনি আজাদ হিন্দ সরকারে আইন সচিব। এমন একজন মানুষকে আসতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই

জনতা পথ করে দিল—সেই পথ ধরেই তিনি এগিয়ে এসে বসলেন নেতাজীর ঠিক পাশের চেয়ারটাতে।

নেতাজী বুঝলেন ব্যাপার বেশ গোলমেলে—না হলে শ্রী সরকার তড়িঘড়ি করে ব্যাঙ্কক থেকে কেন ছুটে আসবেন সিঙ্গাপুরে? আর সিঙ্গাপুরে এসে অফিসে না গিয়ে কেনই বা দেখা করতে আসবেন ময়দানের অনুষ্ঠানে? সুতরাং অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন।

তবু তিনি মনের অস্থিরতাকে চেপে রাখলেন পুরোপুরি। শুধু হেসে শ্রী সরকারকে বললেন: 'আজ রাতে আপনি আমার সঙ্গে খাবেন; আপনার সাথে কিছু জরুরী কথা আছে।'

নেতাজীর কথার ইঙ্গিত বুঝলেন শ্রী সরকার। বললেন: 'ঠিক আছে।'

অভিনয় শেষ হল কিছুক্ষণের মধ্যে; তারপর সমবেত কণ্ঠে গীত হল আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত 'শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরসে ভারত ভাগ হৈ জাগা।' সঙ্গীত শেষ হলে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল। নেতাজী ফিরে এলেন তাঁর হেড কোয়ার্টারে।

রাত এগারটা নাগাদ সামরিক পরিষদের জরুরী বৈঠক বসল মিটিং রুমে। এর আগের দু দিনও এই ঘরেই পরপর বহু বৈঠক হয়ে গেছে। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতাজী সিঙ্গাপুরের জাপানী সামরিক সদর দপ্তরে এক জরুরী বার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন, কোন অবস্থাতেই যেন তারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভবিষ্যত সম্পর্কে ব্রিটিশদের সঙ্গে কোন প্রকারের চুক্তিতে আবদ্ধ না হন। কারণ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভবিষ্যত কি হবে সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করবেন; এ ব্যাপারে, জাপানের কোন রকম হস্তক্ষেপ নিতান্তই অবন্ধুত্বসুলভ কার্য বলে বিবেচিত হবে।

নেতাজীর কাছ থেকে বার্তা পেয়ে সিঙ্গাপুরস্থ জাপানী সমর কর্তৃপক্ষ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে জেনারেল ইটাগাকি সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীকে এক চিঠি লিখে জানালেন, তাঁর

পক্ষে সে ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব হবে না; কারণ, তাঁকে সব বিষয়েই কমাণ্ডার ইন-চিফ ফিল্ড মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচির নির্দেশ মেনে চলতে হয়। অতএব ব্যাপারটা তিনি ফিল্ড মার্শালকেই জানাবেন, এবং এ বিষয়ে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেবার তা ফিল্ড মার্শাল নিজেই নেবেন।

এই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কক থেকে একটা জরুরী বার্তা নিয়ে এসে হাজির হলেন শ্রী সরকার। তাঁর আসার আগেই এ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা হয়েছিল যে, নেতাজী শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরেই থেকে যাবেন, এবং তিনি নিজেই সেখানে তাঁর সেনাবাহিনী সমেত ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। তারপর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যা হবার তাই হবে; যে কোন গুরুতর ফলভোগের জন্যই তিনি নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন।

কিন্তু সব সিদ্ধান্ত, সব পরিকল্পনা হঠাৎ একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেল শ্রী সরকারের আকস্মিক আবির্ভাবে। বৈঠক শুরু হতেই শ্রী সরকার জানালেন, তিনি অত্যন্ত জরুরী একটা বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন ব্যাঙ্কক থেকে। হিকারী কিকানের প্রধান জেনারেল ইসোদা এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী জাপ মন্ত্রী হাচাইয়া তাঁকে জানিয়েছেন, নেতাজীকে মালয় এবং থাইল্যাণ্ড থেকে আরও পূর্বে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁরা দুজনেই বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন; তাঁরা চান যাতে নেতাজী ইঙ্গ-মার্কিন জোটের হাতে ধরা না পড়েন।

শ্রী সরকারের কাছ থেকে এমন একটা চমৎকার প্রস্তাবের কথা শোনার পর আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হল। বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেকেই মত ব্যক্ত করলেন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সিঙ্গাপুরে থেকে আত্মসমর্পণ করার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা আগের মতই বহাল থাক, শুধু নেতাজীর পরিবর্তে অন্য কেউ সেখানে আত্ম-সমর্পণের নেতৃত্ব করুক; ইতিমধ্যে নেতাজী তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত

কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে এমন কোন নিরাপদ স্থানে চলে যান যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনাকে যদি সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত করা যায় তা হলে শুধু যে নেতাজীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাই রক্ষিত হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হয়ে যাবে—নেতাজী আবার নতুন করে, নতুন কোন শক্তির সাহায্য নিয়ে, নতুন ভাবে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রাম শুরু করতে পারবেন।

এ সিদ্ধান্তটা যে শুধুমাত্র অনুমান-ভিত্তিক ছিল, এমন কথা কিন্তু কেউ ভুলেও চিন্তা করবেন না। আসলে, তখন প্রায় প্রতিটি মানুষই একথা বিশ্বাস করতেন যে, সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন নিতান্ত বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার খাতিরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এবং ধনতন্ত্রবাদী আমেরিকার সঙ্গে সাময়িকভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ যেদিন শেষ হয়ে যাবে সেদিন তার এই জোট তো থাকবেই না—উলটে দু দল দুটো নতুন জোট তৈরির কাজে লেগে পড়বে ; এবং তখন থেকেই শুরু হবে এক নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি। এ প্রসঙ্গে নেতাজীই এক সময় ব্যাঙ্ককের এক জনসভায় বলেছিলেন : 'এরই মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন এবং আমেরিকার গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। প্রমাণ—সানফ্রানসিসকোর ঘটনাবলী। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের শত্রুরা এ কথা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে ইউরোপ থেকে জার্মানিকে উৎখাত করতে সমর্থ হলেও তারা সেই জায়গায় আর একটা নতুন শক্তির স্থান করে দিয়েছে, এবং সে শক্তি হচ্ছে রাশিয়া। এই রাশিয়াই অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ এবং মার্কিনী-দের কাছে জার্মানদের থেকেও অনেক বড় ভীতি হিসেবে দেখা দেবে। আজাদ হিন্দ সরকার সেই দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। যখনই সে সুযোগ পাবে, তখনই পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ, প্রথম থেকেই আমাদের বৈদেশিক নীতির একটাই মাত্র লক্ষ্য—তা হল, ব্রিটিশের

যে শত্রু, সেই হচ্ছে ভারতের সব থেকে বড় মিত্র। শুধু আজ নয়, শেষ দিন পর্যন্ত আমরা আমাদের এই নীতিকেই আঁকড়ে ধরে রাখব—কারণ, একমাত্র এই নীতিই আমাদেরকে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে—একমাত্র এই নীতিই আমাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খলমুক্তির পথ তৈরি করে দিতে পারবে।'

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনারা এতক্ষণ যেমন একটাও কথা না বলে চুপচাপ আমার বক্তব্য শুনে গেলেন, সেদিনকার সেই বৈঠকে নেতাজীও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তেমনই মুখ বন্ধ করে তাঁর সহকর্মীদের বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন। শেষে রাত বারটা নাগাদ তিনি মুখ খুললেন। এর আগের আগের বৈঠকগুলোতে তিনি যে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে যাচ্ছিলেন, সকলকে অবাক করে দিয়ে আজ তিনি নিজেই সেই প্রস্তাবের সপক্ষে ভাষণ দেওয়া শুরু করলেন। বললেনঃ 'আপনারা পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণে ভুল করছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রায় তার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ থেকে যত দেরিই হোক, দু বছরের বেশি সময় লাগবে না তার স্বাধীনতা অর্জন করতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখুন, আজ যদি আমি ইঙ্গ-মার্কিন জোটের হাতে ধরা দিই তা হলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে? এটা নিশ্চিত যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আমার বিচার করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে বিচার কার্য তারা চালাবে কোথায়? পূর্ব এশিয়ায়? অসম্ভব। সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন কিংবা সায়গনে তাদের পক্ষে সেই দুঃসাহসিক কাজ করাটা মোটেই সম্ভব হবে না। তা হলে প্রশ্ন থেকে যায় তারা সে বিচার চালাবে কোথায়? এ সম্পর্কে আমার উত্তর খুবই স্পষ্ট; আমি মনে করি, তারা আমার বিচার করবে দিল্লীতে—লালকেল্লায়। এবং আপনারা নিশ্চিত থাকুন, বিচারে তারা আমাকে দোষী হিসেবেই সাব্যস্ত করবে; এবং এ সম্পর্কেও নিশ্চিত থাকুন যে সেই দোষের একটাই মাত্র সাজা হবে—তা হচ্ছে সোজাসুজি

মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তারপর? প্রিয় বন্ধুগণ, আমি নিশ্চিত, আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে। যদি জানতে চান, সেটা কিভাবে হবে, তাহলে বলব, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে আর লক্ষ লক্ষ লোকের মুখ বন্ধ করে রাখা যাবে না; আজাদ হিন্দ বাহিনীর অসীম বীরত্বগাঁথা কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারবে না ব্রিটিশের মিথ্যা প্রচারকের দল। তখন ভারতবর্ষ এক বিরাট বারুদের স্তূপে পরিণত হয়ে যাবে। আপনারা-নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, আমার মৃত্যুসংবাদ সেই বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেবে। সে বিস্ফোরণে ব্রিটিশকে তার সাম্রাজ্য ছেড়ে পালাতে হবেই; সে বিস্ফোরণে সে গদিচ্যুত হবেই। আর যদি তা না হয়, প্রবল বিদ্রোহের আশঙ্কায় ব্রিটিশ যদি আমাকে বিনাশর্তেই মুক্তি দিয়ে দেয়, তাহলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই। সে পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় নয়, আমি আমার মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে উচ্ছেদ করার লড়াই চালিয়ে যেতে পারব; আমি আমার দেশবাসীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার সড়কে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। সুতরাং আমি মনে করি, আজ যদি আমি নিজেই এখানে থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণের নেতৃত্ব করি তাহলে সেটাই হবে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার পক্ষে সব থেকে মঙ্গলজনক।'

মাননীয় আদালত, এতক্ষণ ধরে নেতাজীর যে বক্তব্য আমি আপনাদের শোনালাম, তা শুনে আজ নিশ্চয় আপনাদের সবারই মনে হচ্ছে যে সেদিন যদি ওই বৈঠকে নেতাজীর বক্তব্য অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত গৃহীত হত, যদি নেতাজী নিজেই সেদিন সিঙ্গাপুরে থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণে নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, যদি তাঁর অনুমান অনুযায়ী ব্রিটিশরা তাঁকে বন্দী করে ভারতবর্ষে নিয়ে আসত, যদি তারা লালকেল্লায় তাঁর বিচার করত, এবং বিচারের পর যদি

তারা তাঁকে ছেড়ে দিত কিংবা যদি মৃত্যুদণ্ডও দিত, তবু সেটাই হত ভাল। অন্ততঃ, গত তিন যুগ ধরে আমরা যে চূড়ান্ত মানসিক অশান্তিতে ভুগে চলেছি, দিনের পর দিন যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলে চলেছি, প্রতিমুহূর্তে যে ষড়যন্ত্রের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি—তার হাত থেকে তো রেহাই পেতাম। কিন্তু মহাকালের মনে যেহেতু অন্য কু-বুদ্ধি ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবে যা ঘটার তা ঘটল না, যা না-ঘটার শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটল।

আমি আপনাদের সেই বৈঠকের কথা শোনাচ্ছিলাম, তাই না? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নেতাজী তখন সবে তাঁর বক্তব্য বলা শেষ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন শ্রী এ. এন. সরকার। ভদ্রলোক এককালে পেশায় ছিলেন আইনজীবী, সুতরাং তাঁর বক্তব্যের ঝুলিতে যুক্তির তীরের অভাব ঘটার কোন কথাই নয়। তাই, বক্তব্য বলার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা যুক্তির তীর নিক্ষেপ করে চললেন তিনি নেতাজীর প্রতি। বললেন: 'আপনি যে যুক্তি দেখালেন, আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সে যুক্তিগুলো সত্যই ভেবে দেখার মত। কিন্তু আমারও একটা বক্তব্য আছে। আপনি এতক্ষণ বললেন, আপনি যদি এখানে থেকে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে আমরা কী কী সুবিধে পেতে পারি। এবার আমি বলছি, আত্মসমর্পণ করবার জন্য যদি আপনি এখানে বসে না থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য কোন নিরাপদ এলাকায় চলে গিয়ে আত্মগোপন করতে পারেন তাহলে, সেই পরিস্থিতিতে আমরা কী কী সুবিধে পেতে পারি। ধরা যাক আপনি আত্মসমর্পণ করলেন না, আপনার পরিবর্তে অন্য কেউ আত্মসমর্পণের নেতৃত্ব করলেন। সে ক্ষেত্রে কি হবে? ব্রিটিশ আপনাকে যেমন ধরে নিয়ে যেত, ঠিক সেভাবে যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাঁদেরকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে ভারতবর্ষে। তারপর? তারপর আপনার অনুমান অনুযায়ীই চলবে বিচারের প্রহসন—দিল্লীতে; লালকেল্লায়। বিচারের রায় অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড

হবে ভোঁসলের, সায়গলের, ধীলনের, চ্যাটার্জীর, কিয়ানির কিংবা আমার। অথবা এমনও হতে পারে যে, আমাদের সব কজনকেই এক সঙ্গে ফাঁসি কাঠে লটকে দেওয়া হবে। কিন্তু এ কথা তো মানবেন, তিরিশ চল্লিশ হাজার আজাদী সৈনিকের প্রত্যেককে ধরেই তো আর ইংরেজ ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারে না! সে ক্ষেত্রে কি হবে? আমি বলব, সে ক্ষেত্রেও ফল হবে ওই একই। অর্থাৎ আপনার মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনে যে বারুদের স্তূপে আগুন লেগে যাবার কথা, আমাদের ফাঁসির হুকুম শুনেও সেই বারুদের স্তূপেই আগুন লাগবে। এবং তারই পরিণতি স্বরূপ ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হবেই। কিন্তু, আমি বলতে চাইছি, আমাদের এই অনুমানের মধ্যে যদি কোথাও এতটুকু গড়মিল ঘটে যায়? যদি সময় মত বারুদের স্তূপে আগুন জ্বলে না ওঠে? তাহলে? তাহলে সেই পরিস্থিতিতে কার ওপর দায়িত্ব থাকবে বারুদে অগ্নিসংযোগ করার? ভোঁসলে, শাহনওয়াজ, ধীলন, আইয়ার কিংবা আমার ওপর? মাফ করবেন নেতাজী, বিধাতা পুরুষ আমাদের অতখানি ক্ষমতা দিয়ে পাঠাননি। আমরা বড় জোর দেশলাইয়ের খোঁজ করে বেড়াতে পারি, কিন্তু নিজের হাতে সেই দেশলাইয়ের কাঠিকে মশালে পরিণত করব এমন প্রতিভাবান আমরা কেউই নই। অথচ কী সমস্যা দেখুন, মশাল না হলে বারুদের স্তূপে তো কিছুতেই আগুন জ্বলবে না। সুতরাং একজন মশালধারীকে তো চাই-ই চাই। 'কজনকে তো যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের মধ্য থেকে; একজনকে তো নির্বাচিত করতেই হবে এ কাজের জন্য। নেতাজী, আপনি নিজেই বক্তব্য বলুন না, সে কে? কার পক্ষে সম্ভব হবে এ দুরূহ কাজ? কে জ্বেলে দেবে সেই মশাল? কে?

মাননীয় আদালত, ঠিক এতটাই—ঠিক এতটা বলবার পরই শ্রী সরকার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন কয়েক সেকেণ্ড। সবার মুখের

ওপর চোখ ছুটোকে বেশ ভাল করে বুলিয়ে নেন একবার। বেশ ভাল করে দেখে নেন সবাইকে। অন্ততঃ আইয়ার তো তা-ই বলেছেন। খুলেই দেখুন না, আইয়ারের লেখা 'আনটু হিম এ উইট্‌নেস' বইটার বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাটা। মিলিয়েই দেখুন না, আমি যা বলছি তার মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি আছে কিনা? দেখুন, আইয়ারের সঙ্গে আমার বক্তব্যের কোথাও কোন গড়মিল ঘটছে কি না? যদি ঘটে থাকে তবে বাকি অংশটুকু এখন আইয়ারের ভাষাতেই বলি। আইয়ার লিখেছেন: 'শ্রী সরকার বললেন, 'নেতাজী, একমাত্র আপনিই—একমাত্র আপনিই পারবেন সেই ছুরূহ কাজ সমাধা করতে। আর সে কারণেই এখন আপনাকে ধরা দেওয়া চলবে না। অন্ততঃ আরও তিনটে মাস যেভাবেই হোক আপনাকে অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। তারপর যদি মনে করেন যে ধরা দেওয়া প্রয়োজন, তবে ধরা দেবেন। সেদিন আমরা কেউই আপনাকে নিষেধ করব না—কেউ-ই এতটুকু বাধা দেব না। কারণ, ততদিনে ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জ-শহর মুখরিত হয়ে উঠবে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব গাঁথায়। সেদিন যদি আপনি ধরা দেন, তখন আর ইংরেজের ক্ষমতা হবে না আপনার বিচার করার। কারণ, ততক্ষণে বারুদের স্তূপে আগুন লেগে যাবে; আপনার ধরা পড়ার খবরেই জ্বলে উঠবে পঞ্চাশ কোটি ভারতীয়ের বিক্ষুব্ধ আত্মা।'

মনে হল, এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা নেতাজীকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলল। দেখতে দেখতে তাঁর প্রশস্ত ললাটে ফুটে উঠল বেশ কয়েকটা গভীর চিন্তার রেখা। তিনি কিছু একটা ভাবলেন। তারপর বললেন: 'ঠিক আছে, আপনাদের কথাটা আমি ভেবে দেখব; কাল ঠিক এ-সময়েই আমরা আবার মিলিত হব এখানে। শুভরাত্রি।'

হে মাননীয় বিচারপতিগণ, এতক্ষণ যে ঘটনার কথা আপনাদের বললাম, সেটা ঘটেছিল চোদ্দই অগস্ট রাত্রে। ততক্ষণে জাপানের

আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা যদিও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সরকারীভাবে সে কথা তখনও ঘোষিত হয়নি ; অন্ততঃ রেডিওতে সে ধরণের কোন ঘোষণা শোনা যায়নি। গেল তার পরদিন—পনেরই অগস্ট সন্ধ্যায়।

সেদিন-ই রাত দশটায় আবার শুরু হল বৈঠক। ঠিক সেই একই ঘরে—একই জায়গায়। আগের দিনের বৈঠকে যাঁরা হাজির ছিলেন—এদিনের বৈঠকেও তাঁরা সকলেই হাজির ছিলেন। সরকার, হবিবুর, আইয়ার, কিয়ানি, আলাগাপ্পান—কেউ-ই বাদ গেলেন না উপস্থিত হতে।

আজ প্রথম মুখ খুললেন নেতাজী। বললেন, না, তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা। তাতে খারাপ হবে ; আজাদী সৈনিকদের ওপর ব্রিটিশের আক্রোশ আরও বেড়ে যাবে।

এ. এন. সরকার আপত্তি জানালেন নেতাজীর বক্তব্যে। একটার পর একটা যুক্তি দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, কেন তাঁর আত্মগোপন করা উচিত ; কেন তাঁর সরে পড়া দরকার সিঙ্গাপুর থেকে।

অনেকক্ষণ ধরে চলল এভাবে। নেতাজী একটা যুক্তি দেন তো শ্রী সরকার দেন আর একটা বিপরীত যুক্তি ; নেতাজী একটা কথা বলেন তো শ্রী সরকার বলেন তার ঠিক উলটোটা। এবং মজার ব্যাপার হল, আলাগাপ্পান, কিয়ানি, হবিবুর, আইয়ার—সেদিন আর তারা তাঁদের নেতাজীর পক্ষ নিলেন না, যোগ দিলেন গিয়ে সরকারের দলে। শ্রী সরকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁরাও বললেন, না নেতাজীর পক্ষে সিঙ্গাপুরে থাকাটা কিছুতেই উচিত হবে না—তাঁকে যেভাবেই হোক আত্মগোপন করতেই হবে।

এবার নেতাজী হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তাঁর একান্ত সহকর্মীদের দিকে চেয়ে বললেন : 'আপনারা সবাই যখন আজ আমার বিরোধীপক্ষে যোগ দিয়েছেন তখন আর আমি একা কী-ই বা করতে পারি বলুন? সুতরাং যাই, আমিও আপনাদের দলে

গিয়েই যোগ দিই।'

নেতাজীর মত পরিবর্তনে সবাই উল্লাস প্রকাশ করলেন। শ্রী সরকার তাঁর 'বস'-এর দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, নেতাজী যাবেন কোথায়? কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন? কোথায় যাওয়াটা তাঁর পক্ষে সব থেকে নিরাপদ হবে? কোথায় গেলে তিনি আবার নতুন করে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি আরম্ভ করতে পারবেন? কোথায়?

এই 'কোথায়' প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় বয়ে গেল ঘড়ির কাঁটার তালে তালে। কেউ বললেন থাইল্যাণ্ডে, কেউ বললেন তিনি আশ্রয় নেন গিয়ে ভিয়েৎনামে, কেউ বললেন উনি চলে যান খোদ চীনে।

প্রত্যেকের প্রত্যেকটা প্রস্তাবকেই বিচার করা হল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; দেখা হল ভাল মন্দ দুটো দিকই। শেষে সব কটা প্রস্তাবই বাতিল হয়ে গেল যুক্তির কষ্টিপাথরের ধাক্কায়।

এবার এল এক নতুন প্রস্তাব। একজন বললেন, নেতাজী টোকিওতেই চলে যান না কেন? ওরা তো কদিন আগেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েই রেখেছে সেখানে যাবার জন্য।

কথাটা ঠিক। জাপানীরা সত্যি সত্যিই কদিন আগে নেতাজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন টোকিওতে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্য। তারা বলেছিলেন, তারা প্রত্যেকটি মিত্র দেশের প্রধানদেরই এই মর্মে প্রস্তাব দিচ্ছেন যে, তাঁরা ইচ্ছে করলেই জাপানে এসে আশ্রয় নিতে পারেন।

হে ন্যায়াধীশগণ, কারও কাছ থেকে শুনে কিংবা নিজের কল্পনার জগত থেকে আহরণ করে আমি আপনাদের একথা বলছি না; যা বলছি, জানবেন তার সপক্ষে এই মুহূর্তেই আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ মজুত রয়েছে। যদি আপনারা অনুমতি দেন তাহলে এই আদালতের সামনে এখনই আমি সেই প্রমাণ হাজির করতে প্রস্তুত

আছি।

মান্যবর, এই দেখুন আমার আট নম্বর সাক্ষী। চেহারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জাতে ইনি জাপানী। হ্যাঁ, মহামান্য আদালত, এই ভদ্রলোকই হচ্ছেন এই মামলার সাক্ষী নম্বর আট। অবশ্য উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালের দোসরা জুন উনি যখন টোকিওতে শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্য হাজির হয়েছিলেন তখন ওনাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল একষট্টি নম্বর সাক্ষী হিসেবে। যাই হোক, আমরা আজ একে আট নম্বর সাক্ষী হিসেবেই গণ্য করব। কারণ, ইতিপূর্বে এই মামলায় সর্বমোট সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই গৃহীত হয়েছে।

আসুন, এবার ওঁর বক্তব্য শোনা যাক। তাঁর আগে বলে নিই, ভদ্রলোকের নাম এন. কিতাজাওয়া। উনি যুদ্ধের সময় রেঙ্গুনস্থ জাপ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ছাপ্পান্ন সালে ওনাকে যখন শাহনওয়াজ কমিশনের ডাকা হয়েছিল সাক্ষী দেবার জন্য তখন উনি জাপানী পার্লামেণ্টের একজন সদস্য। সাক্ষ্য দিতে এসে সেদিন সেই বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন: 'আত্মসমর্পণের ঠিক আগের সপ্তাহে জাপান সরকার তার মিত্রদেশগুলোর প্রধানদের কাছে এই মর্মে এক প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাঁরা ইচ্ছে করলে জাপানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন; সেক্ষেত্রে জাপান সরকার তাঁদের সবরকমের স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ডক্টর যোশেফ লরেল, ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রপতি ডক্টর বা ম, এবং নানকীনের চীন সরকারের প্রধান চেনকুনপাও জাপানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী জাপানী মন্ত্রী হাচাইয়ার মারফত নেতাজীর কাছেও এই প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল; এবং আশা করা হচ্ছিল যে নেতাজীও সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে জাপানে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশা বাস্তবায়িত হয়নি।'

এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, কেন সে আশা বাস্তবায়িত হল না? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের এবার আর একজন সাক্ষীকে আহ্বান জানাতে হবে।

এই ভদ্রলোকের নাম কুনিজুকা। ইনি যুদ্ধের সময় জাপ হিকারী কিকান দপ্তরে কাজ করতেন। এনার কাজ ছিল, ওই দপ্তরের তরফে সব সময় নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা। ইনিও উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্য হাজির হয়েছিলেন। তেইশে এপ্রিল কলকাতায় বার নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ইনি বলেছিলেন: 'নেতাজীকে যদিও জাপাম সরকার জাপানে আশ্রয় নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু নেতাজী কখনোই সে ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে এটাও ঠিক যে, তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানও করেননি। আসলে বিষয়টা তাঁর কাছে একটা সৌজন্যতার প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র সৌজন্যতার খাতিরেই তিনি জাপান সরকারের আমন্ত্রণকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জাপানে গিয়ে আশ্রয় নেবার তিনি পুরোপুরি বিরুদ্ধে ছিলেন।'

আপনাদের যা জানা প্রয়োজন ছিল আমার মনে হয় এতক্ষণে আপনারা তা জেনে গেছেন। সুতরাং এবার চলুন, আমরা সেই পুরান কাহিনীতেই আবার ফিরে যাই; আবার সেই প্রবেশ করি গিয়ে সেই মিটিং রুমে।

আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়, আমি বলছিলাম, একজন বলেছিলেন, নেতাজী জাপানে গিয়েই আশ্রয় নিন না কেন। উত্তরে নেতাজী কি বলেছিলেন, সেটা কিন্তু তখন আপনাদের বলিনি; এবার বলছি। নেতাজী সেই প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন: 'না, তা সম্ভব নয়। আত্মসমর্পনের পর জাপানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কোন মানেই হয় না। এখন জাপানীদের নিজেদেরই কোন নিরাপত্তা নেই তো তারা আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে কি করে?

আমি মনে করি, সেটা হবে আরও নির্বুদ্ধিতার কাজ।'

জাপানে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে নেতাজীর এই মন্তব্য শোনার পর আর কেউ জাপানের নামও উচ্চারণ করলেন না। সবাই ভাবতে লাগলেন: অতঃ কিম? এরপর নেতাজীকে কোথায় যেতে বলা যেতে পারে? কোথায় গেলে তিনি যথার্থ নিরাপত্তা পেতে পারেন? কোথায়? কোন দেশে? কোন মুল্লুকে? কোন জমানায়? সবাই মিলে সেই মুহূর্তে সেই কঠিন প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার কাজে নেমে পড়লেন এবং সুখের কথা, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মানান-সই উত্তর পাওয়াও গেল। আর সেই উত্তরটাই হচ্ছে এ ব্যাপারে শেষ উত্তর—সোভিয়েত ইউনিয়ন।

হে মাননীয় আদালত, ঘটনা বলতে বলতে আমি অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, নিজের স্মৃতি শক্তির ওপর আর বেশি নির্ভর করতে পারছি না। সুতরাং এবার আমাকে অনুমতি করুন, টেবিলের ওপরে রাখা আইয়ারের আত্মজীবনীটা একটু উলটে-পালটে দেখে নিই। কারণ, আমার ধারণা, সেদিনের সেই ঘটনা সম্পর্কে আইয়ার তাঁর আত্মজীবনীতে যতটা বিস্তারিত স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন আর কেউই তা করেননি, কিংবা বলা যেতে পারে, আর কারও পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এর একটা কারণ এ-ও হতে পারে যে, একমাত্র আইয়ার ছাড়া সেদিন সেই বৈঠকে এমন আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না, যার পক্ষে আইয়ারের মত দক্ষতার সঙ্গে কলম চালনা করা সম্ভব ছিল।

যাই হোক, আইয়ারের কাছে ঋণ স্বীকার করে নিয়েই আমি আপনাদের পরবর্তী ঘটনাটুকু বলছি। আইয়ার লিখেছেন: 'জাপানে যাওয়ার প্রস্তাব যখন প্রত্যাখ্যাত হল তখন মাঞ্চুরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম উঠল। আমরা সবাই মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আশ্রয় গ্রহণের প্রস্তাবেই সম্মতি জানালাম। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, নেতাজী সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠিক কোথায়

যাবেন, সেই প্রশ্নে। আমরা যখন সকলে একযোগে আলোচনা শুরু করলাম বিষয়টা নিয়ে, তখন নেতাজী নিজেই আলোচনায় বাধা দিয়ে বললেনঃ "এ ব্যাপারটা আপনারা আমার ওপরই ছেড়ে দিন ; আমি নিজেই ঠিক করে নেব আমার যাত্রা-পথ। আপাততঃ সেটা অ-নির্দিষ্টই থাক। প্রয়োজন অনুযায়ীই সেটা ঠিক হবে, আবার প্রয়োজন পড়লে তাকে বদলাতেও হবে।" অতএব বিষয়টা নেতাজীর ওপরই ছেড়ে দেওয়া হল।

'এরপর প্রশ্ন এলঃ তিনি কি ভাবে যাবেন ?

'আমাদের কাউকে আর কিছু বলতে হল না। নেতাজী নিজেই উত্তর দিলেনঃ "কেন, জাপানী সেনাবাহিনীর বিমানেই তো যেতে পারি।"

'উত্তরটা শুনে আমরা কেউই খুশি হলাম না। একজন বলেই বসলেনঃ "জাপানের আত্মসমর্পনের পর জাপানী বিমানে করে যাওয়াটা কি আপনার পক্ষে ঠিক হবে ?"

'নেতাজী জানতে চাইলেনঃ "কেন ?"

'ভদ্রলোক উত্তর দিলেনঃ "না, তাতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা থেকে যাবে।"

'ভদ্রলোকের উত্তর শুনে নেতাজী হাসলেন। বললেনঃ "ভয় পাবেন না ; মনে রাখবেন, আমি একজন অদৃষ্টবাদী।" '

এই পর্যন্তই ; এরপর বৈঠক ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন ঠিক তিনটে। বৈঠক শেষে সবাই চলে গেলেন যার যার নিজের ঘরে ; শুয়ে পড়লেন গিয়ে নিজের নিজের বিছানায়। কিন্তু জেগে রইলেন শুধু একজন—এক অসীম আশাবাদী মানুষ। তাঁর চোখে ঘুম এল না ; তাঁর দেহে ক্লান্তি নামল না ; তাঁর ভাবনায় ছেদ পড়ল না। তিনি সারা রাত ধরে ভেবে চললেন ; সারাটা রাত জেগে রইলেন ; সারাটা রাত বসেই কাটালেন। শেষে একসময় সকাল হল ; একসময় পূর্ব দিগন্ত ভরে গেল নতুন সূর্যের আলোকে। কিন্তু

তখনও শেষ হল না তাঁর ভাবনা—তখনও শেষ হল না তাঁর নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন। তিনি এরপরও ভেবে চললেন, এরপরও কল্পনা করে চললেন—হ্যাঁ, একদিন না একদিন তাঁর স্বপ্নের ভারত তৈরি হবেই ; একদিন না একদিন তাঁর কল্পনা বাস্তবে রূপ নেবেই। কিন্তু সেদিন কি তিনি থাকবেন? সেদিন কি তিনি দেখে যেতে পারবেন তাঁর প্রিয়তম স্বদেশকে?

হে মাননীয় বিচারপতিগণ, সে প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছিলেন কিনা—তা আমার পক্ষে জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা এই মুহূর্তে বার বারই আমার মনে পড়ছে। কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন: 'ভয় পাবেন না, মনে রাখবেন, আমি একজন অদৃষ্টবাদী।' কিন্তু, তাই বলে কি আমরাও ধরে নেব যে, না, যা কিছু ঘটেছে, তার সবটাই অদৃষ্টের ফের?

হে মহামান্য আদালত, মাফ করবেন, এমন অদৃষ্টবাদী অন্ততঃ আমি নই। আমার পক্ষে এই বিরাট ঘটনাটাকে শুধুমাত্র অদৃষ্টের ফের বলে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না ; আমি কিছুতেই এই অসাধারণ ষড়যন্ত্রটাকে নিতান্ত অদৃষ্টের পরিণতি বলে স্বীকার করে নিতে পারব না। আর পারব না বলেই, আজ এত সাক্ষী-সাবুদ, এত নথি-পত্র, এত সহকারী সহযোগীকে নিয়ে আমি আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি। আমি আশা করব, আমার এই পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য দিতে আপনারা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না ; আপনারা বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না।

যাই হোক, আমি আবার আমার মূল বক্তব্যেই ফিরে আসছি। এতক্ষণ ধরে আপনাদের যে কাহিনী বললাম, সে কাহিনী জানাটা আপনাদের পক্ষে যেমন জরুরী ছিল, আমার পক্ষেও ঠিক ততটাই জরুরী ছিল সেদিনকার সেই ঘটনাগুলোকে যথাযথ তুলে ধরার। কারণ, ওই ঘটনাবলীর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিশেষ জরুরী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর। যেমন, দ্বিতীয় দিনের বৈঠকেই, অর্থাৎ পনেরই

অগস্ট রাত্রেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছিল যে নেতাজী সিঙ্গাপুরে থেকে আত্মসমর্পণ করবেন না, তিনি সোজাসুজি রাশিয়ায় চলে যাবেন আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়তঃ ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই জানা যাচ্ছে যে, জাপান সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত জাপান যাওয়ার আমন্ত্রণ সৌজন্যতার খাতিরে গ্রহণ করলেও নেতাজীর টোকিওতে যাওয়ার প্রস্তাবটা সম্পূর্ণই বর্জিত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, নেতাজী তাঁর সহকর্মীদের অনুরোধে আত্মগোপন করতে রাজি হয়েছিলেন শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যে, প্রয়োজনের সময় তিনি আত্মপ্রকাশ করে আবার ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

মাননীয় আদালত, এই সিদ্ধান্তগুলোকে নথিভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহ করে আরও একটা বিষয়কে নথিভুক্ত করে নিতে যেন আপনারা ভুলে যাবেন না। সে বিষয়টা হচ্ছে, আলোচনা চলা-কালীন যখন প্রশ্ন উঠেছিল যে, নেতাজী সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠিক কোন এলাকায় যাবেন, তখন কিন্তু নেতাজী নিজেই সে আলোচনায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন: 'এ ব্যাপারটা আপনারা আমার ওপরই ছেড়ে দিন; আমি নিজেই ঠিক করে নেব আমার যাত্রা-পথ। আপাততঃ সেটা অনির্দিষ্টই থাক। প্রয়োজন অনুযায়ীই সেটা ঠিক হবে, আবার প্রয়োজন পড়লে সেটা বদলাতেও হবে।'

খুবই ভাল কথা। তবে এ সম্পর্কে আমি এখনই কোন মন্তব্য করতে চাইছি না—শুধু চাইছি, আপনারা নেতাজীর ওই বিশেষ মন্তব্যটার প্রতি একটু বিশেষ নজর দিন। তার সঙ্গে, আপনাদের অনুরোধ করছি,- শ্রী এ. এন. সরকার যে কেবলমাত্র অত্যন্ত জরুরী একটা 'গোপন-বার্তা' পৌঁছে দেবার জন্যই ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে ছুটে এসেছিলেন সে কথাটাও সব সময় স্মরণে রাখার চেষ্টা করবেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এই তথ্যটুকুও খেয়াল রাখবেন যে, সেই জরুরী-বার্তাটা এতই 'জরুরী' ছিল যার জন্য শ্রী সরকারের পক্ষে

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করাও সম্ভব হয়নি ; সিঙ্গাপুর বিমানঘাঁটি থেকেই তাঁকে সোজা চলে যেতে হয়েছিল মিউনিসিপ্যাল পার্কের অভিনয়-মঞ্চে। সুতরাং বলা যায় না, হয়ত নেতাজীর ওই মন্তব্যটাই আজ আমাদের কাছে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের উত্তর হয়ে দেখা দিতে পারে ; হয়ত শ্রী সরকারের সেই 'জরুরী-বার্তা'টাই আজ আমাদের সামনে সব সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কি হবে তা এখনই আলোচনা না করাই ভাল। কারণ, আমাদের সামনে আরও কয়েকজন সাক্ষী অপেক্ষা করছেন। সুতরাং আসুন, আমরা এক এক করে তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য শোনার জন্য প্রস্তুত হই ; এক এক করে প্রত্যেকের বক্তব্য যাচাই করে দেখি।

এই মামলার এগার নম্বর সাক্ষী হচ্ছেন শ্রী নিগেশী। ভদ্রলোক এককালে কলকাতার মিৎসুবিসি ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। পরে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ফিরে যান জাপানে। সেখানে গিয়ে যোগ দেন জাপ সামরিক দপ্তরে। সামরিক দপ্তর থেকে তাঁকে হিকারী কিকানের সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার হিসেবে পাঠান হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সেখানে থাকাকালীন তাঁর কাজ ছিল নেতাজীর সঙ্গে সর্বদা জাপ সামরিক দপ্তরের যোগাযোগ রক্ষা করা। ইনি কিছুদিন আগে খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন নেতাজীর অন্তর্ধানের পূর্বমুহূর্তের ঘটনাবলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "জাপান সরকারের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বারই অগস্ট থাইল্যাণ্ডের জাপ রাষ্ট্রদূত নেতাজীকে একটা চিঠি লেখেন। নেতাজী তখন সেরামবানে ছিলেন। আমি জাপ রাষ্ট্রদূতের লেখা চিঠিটা নিয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। সেই চিঠিতে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ছাড়াও কী কী শর্তে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে, সে কথাও জানান হয়েছিল।

নেতাজী চিঠিটা পড়েই সিঙ্গাপুরে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেরামবান থেকে যাত্রা করেন। সেই সময় তিনি আমাকে তিনটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এক নম্বর নির্দেশ ছিলঃ ব্যাঙ্কে আজাদ হিন্দ সরকারের নামে যে দশ কোটি ইয়েন জমা ছিল তার মধ্যে ন কোটি ইয়েন যেন তুলে নিয়ে আসি ; দু নম্বর নির্দেশ ছিলঃ সেই ন কোটি ইয়েনের মধ্যে পনের লক্ষ ইয়েন যেন জাপানের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কাছে পাঠিয়ে দিই ; আর তিন নম্বর নির্দেশ ছিলঃ সিঙ্গাপুরে তখনও পর্যন্ত রানী ঝাঁসি বাহিনীর যে দু জন সদস্যা ছিলেন তাদের যেন ব্যাঙ্ককে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।'

এবার আসুন, নিগেশীর সাক্ষ্য থেকে আমরা কোন নতুন তথ্য খুঁজে পাই কিনা সেটা দেখা যাক। প্রথমতঃ, নিগেশী বলছেনঃ বারই অগস্ট সকালেই নেতাজী জাপ রাষ্ট্রদূতের কাজ থেকে পত্র মারফত জানতে পেরেছিলেন ঠিক কী কী শর্তে জাপান আত্মসমর্পণ করছে। দ্বিতীয়তঃ, নিগেশীর বক্তব্য অনুযায়ীঃ নেতাজী ওই দিনই ব্যাঙ্ক থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের নামে গচ্ছিত টাকাকড়ি তুলে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি নিগেশীর বিবরণ সত্য হয়, তবে আমাদের সামনে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সেরামবানে থাকাকালীনই নেতাজী জাপানের আত্মসমর্পণের শর্তাবলী জেনে গিয়েছিলেন এবং তখনই তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছিলেন। এবং সেই কারণেই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা পয়সা তুলে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ দেখুন, আইয়ার বলছেনঃ সেরামবানে থাকা-কালীন নেতাজী শুধুমাত্র মৌখিকভাবেই আত্মসমর্পণের কথা শুনে-ছিলেন লক্ষ্মনায়া ও গণপতি কাছ থেকে। এবং তাদের কাছ থেকে সে সংবাদ পাবার পরই তিনি সিঙ্গাপুরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমার কথা শুনে আপনারা হয়ত

ভাবছেন, আইয়ার যে মিথ্যেবাদী এ তথ্যটা প্রমাণ করার জন্যই আমি এ সব কথা বলছি। কিন্তু না, আইয়ারকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করবার মত নির্বুদ্ধিতা দেখাবার জন্য আমি এখানে আসিনি: এসেছি আসল সত্যকে তুলে ধরতে। আইয়ার যেহেতু নিগেশীর বয়ে আনা চিঠির কথা কোথাও উল্লেখ করেননি, সেহেতুই আইয়ার মিথ্যেবাদী—এমন কথা বলাটা কি নিতান্তই পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে না? আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল একেবারেই অন্য। নেতাজী যে নিগেশীর মারফত পাওয়া জাপ রাষ্ট্রদূতের চিঠি পড়েই সব-কিছু জানতে পেরে গিয়েছিলেন, এবং তখনই যে ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন সেটা তিনি তাঁর অন্য কোন সহকর্মীকেই জানতে দেননি। ফলে কেউই নেতাজীর সেই মুহূর্তের চিন্তাধারা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলতে পারছেন না; যে যা বলছেন তার সবই ভাসা-ভাসা—সবই মাপ ছাড়া।

কিন্তু কেন? কেন এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল? কেন তিনি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাউকেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বললেন না? কেন তিনি সব কিছুই ধোঁয়াটে রেখে গেলেন? কি উদ্দেশ্যে? কি ফল লাভের আশায়?

মাননীয় আদালত, এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েকটি পুরান ঘটনার দিনগুলোতে। মনে করে দেখুন একচল্লিশের সতেরই জানুআরি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে অন্তর্ধানের কথা? অথচ সেই অন্তর্ধানের প্রস্তুতি তিনি শুরু করেছিলেন কবে? কম করেও প্রায় আট মাস আগে। দেশ-দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবকে ডেকে যখন তিনি তাঁর পরিকল্পনাটার কথা প্রথম বলেছিলেন সেটা ছিল চল্লিশের জুন। সেদিন থেকে সতেরই জানুআরি পর্যন্ত কত লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন? কত লোকের সঙ্গে তাঁর নিভৃত আলাপ-আলোচনা চলেছিল কত লোককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন?

নিশ্চয়ই সেটা কমের পক্ষে সহস্রের সীমা অতিক্রম করেছিল। কিন্তু সেই সহস্রের সীমা অতিক্রান্ত মানুষগুলোর মধ্যে ক জন সেদিন জানতে পেরেছিলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা? ক জন সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর কিছু দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র চিরকালের জন্য দেশছাড়া হয়ে যাবেন? আর যারা তা জানতেন, তাদের মধ্যেই বা কে এ কথা হলফ করে বলতে পারেন যে ঘর ছাড়ার আগে সুভাষচন্দ্র তাঁর সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটার কথাই তাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন? কেউ না; হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, কেউ-ই না।

আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই। উনিশ শ তেতাল্লিশের সাতই ফেব্রুআরির কথা আপনাদের সবারই মনে আছে নিশ্চয়। খেয়াল করে দেখুন তো, সেদিন গভীর রাতে জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে ইউ এক শ নব্বই নম্বরের যে জার্মান ডুবোজাহাজটা রওয়ানা দিয়েছিল, তার যাত্রীটি যে কে সে কথা আবিদ হাসান ছাড়া আর কেউ কি জানত? নাম্বিয়ার ছাড়া আর কোনও ভারতীয়ের কি সেদিন এ কথা জানা ছিল যে নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাচ্ছেন? জার্মান সামরিক মহলের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছাড়া আর কেউ কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে কিয়েল থেকে যে ডুবো জাহাজটি যাত্রা করল তাতে চিরদিনের জন্য সুভাষ বসু জার্মানী ছেড়ে চলে গেলেন?

এটাই হচ্ছে নেতাজীর চরিত্রের বিশেষত্ব, এটাই হচ্ছে তাঁর নিজস্বতা। তাঁর সারা জীবনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে আমরা দেখতে পাব—যে ব্যাপারের সঙ্গে যে ব্যক্তির কোন সংশ্রব নেই সে ব্যাপারে সেই ব্যক্তিকে তিনি একটা কথাও বলেননি; যাকে যা জানানর দরকার নেই—তাকে তিনি তা কখনোই জানাননি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি নিগেশীর সাক্ষ্যকে বিচার করে দেখি, তাহলে আমাদের কাছে এই ব্যাপারটা খুব-ই পরিষ্কার বলে মনে হবে। যেহেতু নেতাজী তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন,

এবং যেহেতু তিনি মনে করেছিলেন যে, সেই মুহূর্তে সে ব্যাপারে আর কাউকে কিছু জানাবার কোন প্রয়োজন নেই—সেহেতু তিনি সে ব্যাপারটা সবার কাছেই চেপে গিয়েছিলেন।

আমার এ অনুমানটা যে শুধুমাত্র অনুমানের ওপরই নির্ভরশীল নয়, তার আরও একটা প্রমাণ রাখছি আপনাদের সামনে। চোদ্দ তারিখে এ. এন. সরকার যখন অত্যন্ত জরুরী একটা 'গোপন বার্তা' নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুর এসে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করলেন, এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে পর পর দু রাত্রি সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, এবং যে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতাজী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে দূরে কোথাও—খোসলা কমিটির সামনে দেওয়া আইয়ারের সাক্ষ্য মতে—কোন রুশ দখলীকৃত এলাকায়, এবং সম্ভব হলে খোদ রুশ-ভূমিতে চলে যাবেন বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছিল—সেই বহু আলোচিত 'গোপন-বার্তা'টা যে কি সে সম্পর্কে আইয়ার কিংবা নেতাজীর অন্য কোন ভারতীয় সহকর্মী কিন্তু কোন আলোকপাত-ই করতে পারেননি। হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, যে 'গোপন বার্তা'র ভিত্তিতে এতদূর এগিয়ে যাওয়া হল, যে 'গোপন বার্তা' এসে পৌঁছবার পরই আগের সব সিদ্ধান্ত ওলোট পালোট হয়ে গেল, সেই 'বার্তা'টা কিন্তু কেউই জেনে উঠতে পারলেন না; এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, নেতাজীও তাঁর কোন সহকর্মীকেই সেই 'গোপন বার্তাটা' সম্পর্কে একটা কথাও বললেন না। যা জানার তা তিনিই জানলেন, আর যা জানাবার তা শ্রী সরকারই জানালেন। মাঝখানে রয়ে গেল এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সে জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ-ই পেল না, সে জিজ্ঞাসার উত্তর কেউই দিল না। শুধু পড়ে রইল একগুচ্ছ অনুমানের বাসি ফুল। বলুন, এ থেকে কি প্রমাণ হয়।

এখানেই শেষ নয়, এ ধরণের আরও বহু ঘটনার ছড়াছড়ি রয়েছে সারাটা রহস্যকে ঘিরে। এর যেন কোন ঘাটতি নেই। বরং, যতই

দিন যাচ্ছে ততই যেন তার বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে ; ততই যেন সে নব নব জন্ম লাভ করছে।

আপনারা তো নিগেশীর সাক্ষ্য শুনলেনই ; এবার আসুন, যাদের যৌথ উদ্যোগে সেদিনকার সেই 'গোপন-বার্তা'টা প্রেরিত হয়েছিল এ. এন. সরকারের মারফত, সেই মানুষ দুজনের এ সম্পর্কে বক্তব্যটা কি সেটা একবার শোনা যাক। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষাকারী জাপানী মন্ত্রী হাচাইয়া ; অপরজন হিকারী কিকানের অধিকর্তা জেনারেল ইসোদা।

উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালের আটই মে টোকিওতে শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে হাচাইয়া বলেছিলেন : 'শ্রী সরকারকে আমরাই, অর্থাৎ আমি এবং জেনারেল ইসোদা, নেতাজীর কাছে অত্যন্ত জরুরী একটা গোপন-বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠিয়েছিলাম। সেই গোপন-বার্তাটা ছিল নেতাজীর আত্মগোপন সংক্রান্ত। তাতে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যদি তিনি মালয় থেকে পূর্ব-এশিয়ার অন্য কোন গোপন স্থানে চলে যেতে চান তাহলে আমরা তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজি আছি।'

জেনারেল ইসোদার বক্তব্যও ছিল ওই একই। তিনিও বলেছিলেন : 'হ্যাঁ, আমি এবং হাচাইয়া—আমরা দুজনে পরামর্শ করেই শ্রী সরকারকে সিঙ্গাপুরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ, সে বার্তাটা আমাদের কাছে এতই গোপনীয় বলে মনে হয়েছিল যে, সেটাকে টেলিফোন বা তারবার্তা মারফত জানানটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমরা মনে করিনি। কেননা, তাতে সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যেত। তাই শ্রী সরকারের মারফতই আমরা প্রস্তাবটা নেতাজীর কাছে পাঠিয়েছিলাম।'

এই প্রস্তাবের পেছনে জাপ-সরকারী মহলের সমর্থন ছিল কিনা সে কথাটা অবশ্য জেনারেল ইসোদা কিংবা হাচাইয়া কেউই

বলেননি। তবে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে—ছিল। কারণ, উচ্চ মহলের অনুমোদন না থাকলে জেনারেল ইসোদা কিংবা হাচাইয়া—কেউই নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে নেতাজীকে অমন একটা প্রস্তাব দিতে সাহস পেতেন না।

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, মনে হচ্ছে, আমার অনুমানের কথা শুনে আপনারা কেউই মনে মনে তেমন সন্তুষ্ট হতে পারেননি! মনে হচ্ছে, আমার অনুমানটাকে আপনাদের কারও পক্ষেই মন থেকে মেনে নেওয়া ঠিক সম্ভব হচ্ছে না! মনে হচ্ছে, আপনারা সবাই এরজন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে চাইছেন! মনে হচ্ছে, আপনারা সকলে অনুমানের পরিবর্তে প্রমাণকেই হাজির করার জন্য দাবি জানাচ্ছেন।

মাননীয় আদালত, আমি আপনাদের প্রত্যেকের চোখের গভীর সন্দিগ্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার যে স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তা থেকে আপনাদের মনের গতি সম্পর্কে আমার এই ধারণা করাটা কি খুব অন্যায় হয়েছে? আপনাদের সম্পর্কে আমি যা ভাবছি, সেটা কি সত্যিই ভুল? সেটা কি সত্যিই বিভ্রান্তি?

যদি তা না হয়, যদি আকস্মিকভাবে আমার বোধশক্তির পতন ঘটে না থাকে—তবে আমি বলছি, আপনাদের আর বেশিক্ষণ অমন সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমার পানে তাকিয়ে থাকতে হবে না; অমন অর্থপূর্ণ নজর দিয়ে আর আমাকে দেখতে হবে না। এখনই, এই মুহূর্তেই আমি আপনাদের সামনে আমার অনুমানের পেছনে অপেক্ষমান সেই প্রমাণটাকে হাজির করছি; এখনই আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে, আমার অনুমান শুধু কল্পনার ওপরই নির্ভরশীল নয়—তার পেছনে রয়েছে যথেষ্ট যুক্তি, যথেষ্ট তথ্য এবং যথাযথ প্রমাণ।

হ্যাঁ মাননীয় আদালত; প্রমাণের ঝুলি নিয়েই আমি এখানে হাজির হয়েছি—শুধুমাত্র বক্তৃতা আর কল্পনার জাল বোনবার জন্য

এই বিচারালয়কে রঙ্গমঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করবার মতলব নিয়ে এখানে আসিনি। তাই, সেই প্রমাণের ঝুলি থেকেই এখন আপনাদের সামনে হাজির করছি—মাফ করবেন মান্যবর, আপনাদের স্মৃতিশক্তির দোহাই দিয়েই বলছি—কথাটা 'হাজির করছি' হবে না, হবে 'হাজির করেছি'—মরিও তাকাকুরাকে। হে মাননীয় বিচারপতি-বৃন্দ, একটু স্মরণ করে দেখুন তো, মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কি এই ভদ্রলোক আপনাদের সামনে একবার উপস্থিত হননি? মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কি তিনি তাঁর সাক্ষ্যে একথা স্বীকার করেননি যে, 'হ্যাঁ, সদর দপ্তরের অনুমতি নিয়েই সবকিছু ঘটেছিল।'

তাহলে? তাহলে বলুন, এবার আপনারা কি বলবেন? বলুন এরপরও কি আপনাদের চোখের ওই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই বহাল থাকবে, না কি আপনারা সে দৃষ্টি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন? বলুন, কি করবেন?

হে মাননীয় আদালত, আমি জানি সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক; সন্দেহ করাটাই হচ্ছে সাধারণ রীতি। আর যেখানে এতবড় একটা ষড়যন্ত্র ঘটে গেছে সেখানে প্রতি পদে পদে সন্দেহ তো জাগবেই—প্রতি পদে পদে অবিশ্বাসের দোলায় মন তো দুলবেই। তবু এরই মাঝে আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে—এরই মাঝে করতে হবে আলোর সন্ধান। তাহলে, আমার বিশ্বাস আছে—সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে একদিন না একদিন আমরা আসল রহস্যকে বের করতে পারবই।

তাকাকুরার বক্তব্য থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, নেতাজীর আত্মগোপন সংক্রান্ত যা কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তার সবকটার পেছনেই টোকিওর সরকারী মহলের পূর্ণ সমর্থন ছিল; এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ীই সব পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল। যদি এতদূর পর্যন্ত সত্য হয়, তবে একথাও নিশ্চয় ভাবা যেতে পারে যে, সবকটি পরিকল্পনা সম্পর্কেই নেতাজী সব সময়েই ওয়াকিবহাল

ছিলেন। অর্থাৎ জাপ-কর্তৃপক্ষ সব সময়েই তাঁকে সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল রেখে চলেছিলেন। এবং সে কারণেই তারা বার তারিখে নিগেশীকে পাঠিয়েছিলেন সেরামবানে; সে কারণেই চোদ্দ তারিখে এ. এন. সরকারকে পাঠিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে; সে কারণেই সাকাই ছুটে এসেছিলেন ব্যাঙ্কক থেকে।

মাননীয় আদালত, নিগেশী এবং সরকার ব্যাঙ্কক থেকে কি বার্তা বয়ে এনেছিলন নেতাজীর জন্য সে কথা আপনারা ইতিপূর্বেই শুনেছেন। এবার আসুন, চোদ্দ তারিখ রাতে সাকাইয়ের হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে ছুটে এসে নেতাজীর সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় মিলিত হওয়ার কারণ কি সেটা একটু অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রী এস. এ. আইয়ারকে আর একবার স্মরণ করতে হচ্ছে। শ্রী আইয়ার খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে সাকাই-প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'ব্যাঙ্কক থেকে সাকাই এসে পৌঁছলেন। নেতাজীর সঙ্গে নিভৃতে তাঁর আলোচনা শুরু হল। আমরা কেউ-ই সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম না। তবে আমার অনুমান, সাকাই ব্যাঙ্কক থেকে কোন বিশেষ জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন; এবং তার ভিত্তিতেই তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলেছিল। কারণ, ইতিপূর্বে নেতাজীর সিঙ্গাপুরে থেকে আত্মসমর্পণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, সাকাই আসার পরই সেটা চূড়ান্তভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন থেকেই আমরা আবার নতুন করে আলোচনায় বসলাম—এবং শেষ পর্যন্ত পনেরই অগস্ট গভীর রাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলঃ নেতাজী সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাবেনই, যেভাবেই হোক কোন রুশ দখলীকৃত এলাকায় তিনি পৌঁছবেনই এবং তারপর মূল রুশভূমিতে পদার্পণের জন্য সব রকমের চেষ্টাই চালিয়ে যাবেন।'

এ থেকে আপনারা কি বুঝতে পারছেন? সাকাই সেদিন

ব্যাঙ্কক থেকে নেতাজীর জন্য কি বার্তা বয়ে এনেছিলেন ? কি বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে নিভৃতে আলোচনা চলেছিল ?

একটা ব্যাপার এখানে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আইয়ার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'শ্রী এ. এন. সরকার সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল নেতাজী সিঙ্গাপুরেই থাকবেন, এবং সেখানেই ফৌজ সহ আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু সরকার আসাতে সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল ; তখন থেকে আমরা নেতাজীর রাশিয়ায় চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিপরীতধর্মী দুটো বক্তব্যের মধ্যে কোনটা ঠিক ? কার আসাতে আবার নতুন করে নেতাজীর আত্মগোপনের কথা আলোচনা শুরু হল ?

এ সম্পর্কে আমার উত্তর পরিষ্কার। আমি মনে করি, সাকাই আসাতেই সব বিষয়টা চূড়ান্ত হয়ে যায় ; তিনিই জাপ সরকারের সর্বোচ্চ সামরিক মহলের তরফ থেকে নেতাজীর সঙ্গে বসে তাঁর যাত্রার পরিকল্পনাকে পাকাপাকি রূপ দেন ; এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই নেতাজীর পরবর্তী কার্যপ্রণালী ঠিক হয়।

আমার এই বক্তব্যের পর এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে : তাহলে এই নাটকে শ্রী এ. এন. সরকারের ভূমিকাটা কি ?

মহামান্য আদালত, সে প্রশ্নের উত্তরও আমি আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, সেদিন সেখানে যা-কিছু ঘটেছিল—তার সবটাই ছিল আগে থাকে মহড়া দেওয়া একটা নাটকের পুনরাভিনয় মাত্র। সেই পুনরাভিনয়ে নেতাজী যেমন নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর অভিনেয় চরিত্রকে রূপদান করেছিলেন, শ্রী সরকারও তেমনি তাঁর অংশটুকুও যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গেই অভিনয় করে গিয়েছিলেন। তিনি সবার সামনে নিপুণ অভিময়ের মাধ্যমে এমন দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন, যাতে সবার মনে হয়েছিল, যেন তাঁর জন্যই নেতাজী

তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে থেকে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত পালটে ফেলতে বাধ্য হলেন। কিন্তু, আসলে সিদ্ধান্ত যা নেবার সেটা নেতাজী নিগেশীর কাছ থেকে জাপ সরকারের আত্মসমর্পণের শর্তাবলী জানার পরই নিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ঃ প্রথমতঃ, তিনি সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে সেখানকার চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজকর্মগুলো সেরে ফেলবেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর আত্মগোপনের ব্যাপারে জাপানীরা সত্যি সত্যিই কতটা কি করতে পারবে তা জানবেন; তৃতীয়তঃ, যাত্রার পর্বে শেষবারের মত সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন; চতুর্থতঃ, ইঙ্গ-মাকিন জোটের চোখে ধুলো দেবার জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, যাতে তারা তাঁর আত্মগোপন সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়।

আমার এই অনুমানগুলোর মধ্যে কোনটাকেই যে আপনারা হেসে উড়িয়ে দেবেন, তা কিন্তু মোটেই সম্ভব হবে না। কারণ, আমি প্রমাণ সহ আপনাদের দেখাব যে, আমার প্রতিটি অনুমানই যথেষ্ট যুক্তি-নির্ভর; এর প্রত্যেকটার পেছনেই রয়েছে নেতাজীর সাফল্য লাভের কাহিনী। প্রথমতঃ, সিঙ্গাপুরে ফিরেই তিনি সেখানকার চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজকর্মগুলো সেরে ফেলেছিলেন। কর্ণেল স্ট্র্যাচি এবং ক্যাপ্টেন মালিককে শহীদ-স্তম্ভ তৈরির নির্দেশ দেওয়া থেকে শুরু করে মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানিকে নিজের অনুপস্থিতিকালে আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বময়কর্তা পদে নিয়োগ করে আদেশ জারি করা পর্যন্ত কোন কাজ-ই তাঁর বাকি পড়ে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর আত্মগোপনের ব্যাপারে জাপানীরা কতটা কী সাহায্য করতে পারবে, এ সম্পর্কে সর্বোচ্চ জাপ-কর্তৃপক্ষের মতামত কি, তাঁকে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দেবার জন্য তারা কা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে—তার সবকিছু তিনি জেনে নিয়েছিলেন শ্রী এ. এন. সরকার এবং লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সাকাই মারফত। তৃতায়তঃ, তাঁর ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিত, এবং সে সম্পর্কে

তাঁর সহকর্মীরা কী চিন্তা করেছেন, সেটা জানার জন্যই তিনি বার বার তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য কি তা জেনে নিয়েছিলেন। চতুর্থতঃ সেই বৈঠকগুলোতে বিভিন্ন সময়ে তিনি এমন কিছু পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা বলেছিলেন যার ফলে তাঁর সহকর্মীরা তাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যান। ফলে সেই সব সহকর্মীরা যখন যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এবং নেতাজীর চূড়ান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে যে যার নিজের নিজের ধারণার কথা বললেন তখন আসল ঘটনা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সরকার সত্যিই বেশ দোনোমোনো অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। তারা বুঝে উঠতে পারল না, আসলে সত্যি কথাটা কে বলছে, আর কেই-বা বলছে মিথ্যেটা। ফলে, রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছবার জন্য কোনটা যে আসল সূত্র সেটাই তাদের কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হল না। অর্থাৎ, আখেরে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, নেতাজী মনে মনে যা যা চেয়েছিলেন, বাস্তবেও ঠিক তাই তাই-ই ঘটল। যুদ্ধ শেষে ইঙ্গ-মার্কিন জোট নেতাজীর কোন হদিস-ই পেল না।

হে মাননীয় বিচারকবৃন্দ, এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আসলে আমি কী বলতে চাইছি? তাছাড়া এ ব্যাপারটাও নিশ্চয় আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যুদ্ধ শেষে রাশিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনাটাই নেতাজীর কাছে সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি যে ইচ্ছাকৃত-ভাবেই তাঁর বিভিন্ন সহকর্মীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের পরি-কল্পনার কথা বলেছিলেন, তাও নিশ্চয় বুঝে উঠতে আপনাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না। তবু, আমায় অনুমতি দিন, আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে আরও দু একটা জরুরী তথ্য রাখছি।

আপনারা জানেন, নেতাজী আনন্দমোহন সহায়কে টোকিওতে পাঠিয়েছিলেন রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য; আবার আপনারা এ-ও জানেন যে সেই সহায়ই বেশ কিছুদিন হ্যানয়ে গিয়ে বসেছিলেন যাতে কমিউনিস্টদের সাহায্য নিয়ে নেতাজীকে চীনের পথে রাশিয়ায় পাঠান সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করতে। তাছাড়া এ কথাও তো আপনারা শুনেছেন যে জেনারেল ইসোদার মারফত জাপ সরকারকে প্রভাবিত করে উত্তর চীনের কোন শহরে আজাদ হিন্দ সরকারের একটা শাখা-দপ্তর খুলে সেখান থেকে প্রয়োজন-বোধে হঠাৎ যাতে রুশ এলাকায় সরে পড়া যায় সেজন্যও নেতাজী গোপনে গোপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ তথ্য কি আপনাদের কারও জানা আছে যে, যুদ্ধ শেষে নেতাজী স্থলপথে ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন বলে গোপনে গোপনে একটা পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন? কিংবা এ কাহিনী কি আপনারা কখনও শুনেছেন যে আত্মগোপনকালীন সময়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনি আগে থাকতেই তাঁর গোপন বেতারের ওয়েভ-লেংথ, ফ্রিকোয়েন্সি, কল-সাইন ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলো অন্য দু চারজন মানুষকে বলে গিয়েছিলেন? যদি ইতিপূর্বে এ সব কাহিনী কখনও শুনে না থাকেন, তবে প্রস্তুত হোন, আমি সেই অজানা কাহিনীই আপনাদের শোনাব।

হে মহামান্য আদালত, দেবনাথ দাসের মুখে থেকে ইতিপূর্বে তো আপনারা বেশ কিছু কাহিনী শুনেছেনই; এবার আসুন আরও কিছুটা শোনা যাক। খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে শ্রীদাস বলেছেন: 'নেতাজীর নির্দেশে আমরা যে পরিকল্পনাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে, আমরা নেতাজীকে নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে ভারতবর্ষে আসব। আমাদের পথ ছিল: থাইল্যাণ্ড থেকে লাওস হয়ে চীনের মধ্য দিয়ে তিব্বত এবং সেখান থেকে ভারতবর্ষ। আসলে আমরা ব্রহ্মদেশটাকে এড়িয়ে আসতে চেয়েছিলাম

বলেই এই ব্যবস্থা।' শুধু কি তাই! এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কে কোন্ অংশের দায়িত্ব নেবেন সেটাও কিন্তু ঠিক হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

অবশ্য অনেক আগে বলতে ঠিক কত আগে—সেটা জানার জন্য নিশ্চয় আপনাদের খুবই কৌতুহল হচ্ছে? তাহলে শুনুন, শ্রী দাসের ভাষাতেই বলি: 'এ নিয়ে উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের মে মাস থেকেই আমাদের মধ্যে বহু বৈঠক হয়েছিল্। এবং সেই বৈঠক-গুলোতেই ওই পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেবার ব্যবস্থা করা হয়।'

শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে আরও একটা মজার ঘটনা ঘটে। আপনারা জানেন, পনেরই অগস্ট রাতের বৈঠকেই নেতাজীর রাশিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা হয়ে গিয়েছিল। আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন সকলেই তিনি এক লিখিত আদেশ বলে মেজার জেনারেল কিয়ানিকে আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বময়-কর্তা পদে নিয়োগ করেছিলেন এবং তার মাত্র দু ঘণ্টা পরেই একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সহকর্মীসহ বিমানযোগে নিরুদেশ যাত্রার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ককের পথে রওয়ানা দিয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, ওইদিন বিকেলে ব্যাঙ্ককে পৌঁছবার পর সেই একই মানুষ শ্রী দেবনাথ দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রী দাস তাঁর ভারতবর্ষে ফিরে আসা সম্পর্কে যে পরিকল্পনাটা তৈরি করেছিলেন সেটা তখনও ঠিক আছে কি না?

সেই বিচিত্র ঘটনাটার বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীদাস কি বলছেন একবার শুনুন। তিনি খোসলাকে বলেছেন: 'বেলা সাড়ে ছটা নাগাদ নেতাজী বাথরুমে যাচ্ছিলেন। সে সময় আমি তাঁর সামনে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পরি-কল্পনাটা তৈরি আছে তো? সবকিছু ঠিক-ঠাক করে রেখেছ তো?" আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ স্যার, সব ঠিক আছে।" '

আমার মনে হয় দেবনাথ দাসের বক্তব্য শোনার পর মানু

আই. সিঃ এস খোসলাও বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি শ্রী দাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'আপনার উত্তর শুনে নেতাজী কি তখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তোমার পরিকল্পনাটা যা আছে থাক, আমি আর একটা নতুন পরিকল্পনাকে চূড়ান্তভাবে তৈরি করেছি?'

কিন্তু না, খোসলা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে দেবনাথ দাস তেমন কোন আশাব্যঞ্জক কথা বলতে পারেননি। বরং বলেছিলেনঃ 'না, তেমন কোন কথা তিনি একবারও বলেননি। শুধু রাত দুটো নাগাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে? তোমার তৈরি হতে কত সময় লাগবে?" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই আমি তৈরি হয়ে আসছি।"'

একথা শোনার পর সম্ভবতঃ কৌতূহল দমন করতে না পেরেই খোসলা সাহেব শ্রীদাসকে প্রশ্ন করেনঃ 'তাহলে আপনি বলছেন, তিনি বললেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে", অথচ এ কথা বললেন না যে কোথায় যাবেন!'

হ্যাঁ, মাননীয় বিচারপতিগণ, ঠিক তাই। অন্ততঃ দেবনাথ দাসের সাক্ষ্য থেকে আমরা সেটুকুই জানতে পারি। তিনি খোসলার প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেনঃ 'না, তিনি বলেননি।' এমনকি খোসলা যখন শ্রী দাসের কাছে জানতে চাইলেন যে তাহলে কি শ্রী দাস নিজেই জানতেন যে নেতাজী কোথায় যাচ্ছেন? সে প্রশ্নের জবাবেও শ্রী দাসের সেই একই উত্তর—'না।' এবং ওই প্রসঙ্গে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, ব্যাঙ্কক থেকে বিমানে করে রওয়ানা দেবার পরও তিনি জানতেন না যে তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন। জানলেন, যখন তাঁদের বিমান সায়গন বিমানঘাঁটিতে এসে পৌঁছল। এবং সেখানে পৌঁছবার পরই তিনি বুঝলেন যে এতক্ষণ তাঁদের গন্তব্যস্থল ছিল সাইগন!

এই ছিল নেতাজীর কাজ করার পদ্ধতি—এটাই ছিল তাঁর

চারিত্রিক বিশেষত্ব। যে কথা কাউকে না বললেও কাজ চলে যায়, যে কথা চেপে রাখলেও পরিস্থিতির কোন ইতর বিশেষ হয় না, যে কথা গোপন রাখলেই বরং লাভের সম্ভাবনা বেশি—সে কথা তিনি কখনোই 'কাউকে বলতেন না। তাতে অপরে কে কী মনে করল, তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবল, তা নিয়েও তিনি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাননি কোনদিন। এটাই ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব; এটাই ছিল তাঁর আশৈশব অভ্যাস। অল্প বয়সে গুরুর খোঁজে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়া থেকে শুরু করে শেষ অন্তর্ধানের দিনটি পর্যন্ত সেই একই স্বভাবের ক্রমঃপ্রকাশ চলেছে—সেই একই অভ্যাসের দ্বারাই তিনি প্রতিমুহূর্তে চালিত হয়েছেন।

এ ধরণের ঘটনা যে শুধু একবারই ঘটেছে তা কিন্তু নয়; আরও বহুবার বহুভাবেই তা সংঘটিত হয়েছে। সে সব কাহিনীতে পরে আসছি। তার আগে বলে নিই, সেই গোপন বেতার যোগাযোগের ব্যাপারটা। উনিশ শ ছাপান্ন সালের তিরিশে এপ্রিল ব্যাঙ্ককে শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে আঠাশ নম্বর সাক্ষী শ্রী এ. সি. দাস বলেছিলেন: 'নেতাজী সায়গন থেকে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করার বেশ কিছুদিন আগেই আমাকে এবং সুনীল রায়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আমাদের একটা গোপন বেতারের ওয়েভ-লেংথ, ফ্রিকোয়েন্সি, কল-সাইন ইত্যাদি বুঝিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে তিনি আমাদের একথাও বলেন যে আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কোন এক অজ্ঞাত স্থানে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে গোপন বেতার মারফত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর সে কারণেই এই ওয়েভলেংথ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং কল-সাইন আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন।'

হে বিচারপতিবৃন্দ, দাসের বক্তব্য তো আপনারা শুনলেনই, এবার নিজেরাই ভেবে দেখুন, যুদ্ধ শেষে কোনও নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করার ব্যাপারে ভেতরে ভেতরে নেতাজী কতদূর এগিয়ে

গিয়েছিলেন! অথচ দেখুন, বাইরে তিনি তখনও বলে চলেছেন, তাঁর মনের আসল ইচ্ছে হচ্ছে, সিঙ্গাপুরে থেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করা; এমনকি তারজন্য বেশ কয়েকটা বৈঠক ডেকে যুক্তির বানও ছোটালেন যথেষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, যখন তিনি বুঝলেন যে সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে—এরপর আর দেরি করা সম্ভব নয়—এবার যাত্রা শুরু করতেই হবে, তখন একেবারে আনকোরা একটা নতুন নাটক উপস্থিত করলেন সবার সামনে। ব্যাঙ্কক থেকে ছুটে এলেন সরকার আর সাকাই; তাঁদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চলল তাঁর; শেষে ডাকলেন মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক। এবং সেই বৈঠকেই অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে নেতাজীর অন্তর্ধানের প্রস্তাব রাখলেন এ. এন. সরকার। বললেন: 'না, নেতাজীর পক্ষে সিঙ্গাপুরে থেকে আত্মসমর্পণ করাটা মোটেই উচিত হবে না। যে ভাবেই হোক তিনি যেন কোন নিরাপদ এলাকায় চলে যান।'

অভিনয়ে নেতাজীও কম যান না তিনিও অভিনয় করে গেলেন চুটিয়ে। বললেন: 'না না, তা কি করে সম্ভব! আমি আমার সহকর্মীদের কিছুতেই বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়তে পারব না। তাদের সঙ্গে এখানে থেকেই আমি আত্মসমর্পণ করতে চাই।'

তারপর আরও কত কাণ্ডকারখানা ঘটেছিল, সে কথা তো আপনাদের আগেই বলেছি। এবং শেষ পর্যন্ত সেইসব সহকর্মীদের চাপে পড়েই যে তিনি সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে কোন এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে কাহিনীও তো আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন। কিন্তু যে অকথিত কাহিনীটি এখনও পর্যন্ত আপনাদের অজানা রয়ে গেছে, তা হল এই যে, মন্ত্রীসভার বৈঠকে শ্রী সরকার কিভাবে অভিনয় করবেন, কিভাবে তিনি প্রস্তাবটা উত্থাপন করবেন, কিভাবে তার ব্যাখ্যা করবেন এবং কিভাবে সেটাকে সবার সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবেন সে

সম্পর্কে তাঁকে আগে থাকতেই সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন স্বয়ং নেতাজী। তিনিই বলে দিয়েছিলেন, কিভাবে অন্য সবার মুখ দিয়েই বলিয়ে নিতে হবে যে, না নেতাজী, আপনার পক্ষে সিঙ্গাপুরে থাকাটা ঠিক হবে না ; আপনি অন্য কোন নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিন।

শুধু তাই নয়, অন্য দিকে নিজের অভিনয় সম্পর্কেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক। প্রথমে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, তারপর এলোমেলো যুক্তি দেখানো, শেষে বাধ্য হয়ে পরাজয় মেনে নেওয়া—এই তিন স্তরেই তাঁর অভিনয় ছিল নিখুঁত। ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াল এই ঃ প্রথমতঃ, নেতাজী তাঁর সহকর্মীদের ছেড়ে যেতে মোটেই রাজি ছিলেন না ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সহকর্মীর চাপে পড়েই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর সিদ্ধান্ত পালটাতে ; তৃতীয়তঃ, সেই সব সহকর্মীর নির্দেশ অনুসারেই তিনি কোন এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এতক্ষণ ধরে যে ঘটনাবলীর কথা আমি আপনাদের বললাম, আপনারা জানেন, তার সবটাই ঘটেছিল সিঙ্গাপুরে—বারই অগস্ট রাত থেকে ষোলই অগস্ট সকালের মধ্যে। সেই সময়টুকুর মধ্যেই বিভিন্ন রকমের অভিনয়ের মাধ্যমে নেতাজী তাঁর নিরুদ্দেশ-যাত্রার পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ফেলেছিলেন ; সেই সময়টুকুর মধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা। এবং সেই নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ীই তিনি কিয়ানিকে সর্বাধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত করে আদেশ জারী করেছিলেন ; সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই অনতিবিলম্বে তিনি দলবলসহ সিঙ্গাপুর ছেড়ে ব্যাঙ্কক যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন।

সেদিন সেই ব্যাঙ্কক-যাত্রায় কে কে তাঁর সহযাত্রী হবেন সেটা অবশ্য নেতাজী নিজেই ঠিক করেছিলেন। আগের দিন রাতের বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কিয়ানি, আলগাপ্পান

এবং সরকারকে তিনি থেকে যেতে বললেন সিঙ্গাপুরে ; বাকি তিনজন অর্থাৎ হবিবুর, প্রীতম সিং আর আইয়ারকে নির্বাচিত করলেন নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ ছাড়া জাপ দোভাষী তথা যে মানুষটি সেরামবানে গিয়ে নেতাজীকে জাপানের আত্ম-সমর্পণের শর্তাবলী জানিয়ে এসেছিলেন সেই নিগেশীও তাঁর সঙ্গী হলেন। তাঁরা সকলে মিলে বেলা সাড়ে নটা নাগাদ এসে পৌঁছলেন সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে। সেখানে আগে থাকতেই একটা ছোট জাপানী বোমারু বিমান অপেক্ষা করছিল তাঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁরা পাঁচজন গিয়ে উঠলেন সেই অপেক্ষমান বিমানটিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রপেলারটা গর্জন করে উঠল ; পরমুহূর্তেই বিমানটা ছুটতে শুরু করল রানওয়ের ওপর দিয়ে। কিন্তু না, বেশি দূর আর তার পক্ষে ছোটা সম্ভব হল না। একটা চক্কর খেয়েই সে আবার ফিরে এল তার যাত্রা শুরুর স্থানটিতে।

বিমানের এমন বেয়ারাপনা দেখে নেতাজী মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন। পাইলটের কাছে জানতে চাইলেন : 'ব্যাপারটা কি ?'

অতি বিনীত কণ্ঠে পাইলট জবাব দিলেন : 'স্যার, ল্যাণ্ডিং গীয়ারের ব্রেকে একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে ; তবে আপনি চিন্তা করবেন না, এখনই এটাকে মেরামত করে নেওয়া যাবে।'

পাইলট যা বলেছিলেন, দেখা গেল ব্যাপারটা তা-ই। মিনিট পনের বিশেকের মধ্যেই মেরামতির কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপর আবার সেই গর্জন—আবার সেই দৌড় শুরু। দেখতে দেখতে বিমানটা আকাশে উঠে গেল। নিচে তখনও হাত নেড়ে চলেছেন আলাগাপ্পান, কিয়ানি আর বেশ কয়েকজন ফৌজি অফিসার। তারপর একসময় তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন ; আর বিমানটাও তলিয়ে গেল নাল আকাশের গর্ভে।

সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক—বোমারু বিমানে পুরো পাঁচ ঘণ্টার পথ। পাঁচ ঘণ্টা এক নাগাড়ে উড়ে এসে বিমান যখন ব্যাঙ্কক

এয়ারপোর্টের মাটি ছুঁলো তখন ঘড়িতে ঠিক তিনটে বেজে দশ। পশ্চিম দিগন্তে কাত হয়ে পড়া সূর্যটার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র ততক্ষণে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে ; এমনকি তার গায়ে একটু-আধটু ঠাণ্ডার প্রলেপ লাগা পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে।

নেতাজীর ব্যাঙ্কক আসার খবরটা আগে থাকতে কারও জানা ছিল বলে মনে হয় না। কারণ, বিমান যখন এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করল তখন সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য না কোন জাপানী, না কোন ভারতীয়—কোন তরফের কোন উচ্চপদস্থ অফিসারকেই দেখা গেল না। পরিবর্তে শুরু হল বেশ কয়েকজন নিম্নপদস্থ জাপ সামরিক কর্মচারীর ছুটোছুটি। তারাই দৌড়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল নেতাজী এবং তাঁর দলবলকে, তারাই ওঁদেরকে নিয়ে গেল বিমান-বন্দরের বিশ্রাম কক্ষে, তারাই সেখান থেকে ফোনে খবর দিল উর্ধতন জাপ এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইসোদা, ছুটে এলেন হাচাইয়া, ছুটে এলেন ভোঁসলে, ছুটে এলেন দেবনাথ দাস। ইতিমধ্যে প্রায় দুটো ঘণ্টা কেটে গেছে। নেতাজী ওঁদের আসাতে দেরি দেখে মনে মনে বেশ অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওঁরা এসে পড়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দিলেন শহরের পথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। মুখে মুখে রটে গেল নেতাজীর আগমন-বার্তা। তারপর আর কারও যেন তর সইল না। শুরু হল একের পর এক দর্শনার্থীর আগমন, একের পর এক উৎসুক মানুষের আবির্ভাব। তারা প্রত্যেকেই নেতাজীর সঙ্গে কথা বলতে চান, প্রত্যেকেই তাঁর মুখ থেকে শুনতে চান, এরপর তারা কি করবেন? এরপর তাদের করণীয়টা কি?

নেতাজীও যেন উত্তর তৈরি করেই বসেছিলেন। আগের দিন সিঙ্গাপুরে তিনি যা যা বলেছিলেন, এদিনও ঠিক তাই তাই বললেন।

বললেন : 'আপনারা ভয় পাবেন না ; আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। যেটা শেষ হল—সেটা হচ্ছে এই লড়াইয়ের একটা পর্যায় মাত্র। এখন থেকে শুরু হবে আর এক নতুন লড়াই—আর এক নতুন পর্যায়। আমরা আবার আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করব।

কথাটা খুবই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, সে লড়াইটা হবে কিভাবে ? কাদের সাহায্য নিয়ে চলবে সে লড়াইটা ? কোন্ পদ্ধতিতে চালান হবে সে লড়াইকে ? এবং সব থেকে বড় কথা, সে লড়াইটা চালাবেই বা কে ?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এই যে প্রশ্নগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, মনে করবেন না, এ প্রশ্নগুলো নিতান্তই আমার একার প্রশ্ন। আসলে এই প্রশ্নগুলোই সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী প্রতিটি ভারতীয়ের মনেই জেগেছিল। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, নেতাজীর প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখ থেকে নতুন করে সংগ্রাম শুরুর আহ্বান শোনার পরও কেউ আর তাঁকে সাহস করে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেনি। ফলে, সেদিন যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়াটা ছিল একান্ত জরুরী, যে প্রশ্নের উত্তর পেলে আজ আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতাম, তা আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেল। তাই, একান্ত বাধ্য হয়েই গত তিরিশ বছর ধরে প্রদীপের নিচের অন্ধকারে দাঁড়িয়েই আমরা আলোর সন্ধান করে চলেছি ; তাই, মরীচিকা জেনেও দিনের পর দিন আলেয়াকেই আলোর উৎস ভেবে ছুটে চলেছি !

কিন্তু যা হবার, অথচ হয়নি—তারজন্য আর আক্ষেপ করে লাভ কি বলুন ? কি হবে আপসোস করে ? যা পাইনি, আক্ষেপ করলেই যে তা পেয়ে যাব—তা তো নয়। সুতরাং আসুন, তার থেকে বরং সেদিন ব্যাঙ্ককে আর কি কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা একটু খতিয়ে

দেখা যাক।

এই প্রসঙ্গে, শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্ট থেকে কয়েকটা লাইন আমি আপনাদের পড়ে শোনাতে চাইছি। কমিটি তার রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে সেদিন ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছে: 'ষোলই অগস্ট নেতাজী ব্যাঙ্ককে এসে পৌঁছলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের জন্য নিযুক্ত জাপানী মন্ত্রী হাচাইয়া এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে জাপান সরকারের একটা বার্তা দিলেন—যে বার্তায় সরকারীভাবে জানান হয়েছিল যে, জাপান সরকার আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সঙ্গে জাপান সরকারেরর সমরোদ্যমে নেতাজী যে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন তারজন্যও তাঁকে ধন্যবাদ জানান হয়েছিল। এছাড়াও সে বার্তায় বলা হয়েছিল যে, নেতাজীর যে-কোন ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য জাপান সরকার খুবই উদ্‌গ্রীব। হাচাইয়া বলেছেন, নেতাজী তাঁকে বলেছিলেন যে, যেহেতু জাপান সরকার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে, সেহেতু তাদের পক্ষে তাঁকে আশ্রয় দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্যাঙ্ককের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনরকম সাহায্য করতে সমর্থ ছিল না। তারা যেটা পারত—তা হল, তাঁকে সায়গনে পৌঁছে দেওয়া এবং ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা। সেই এলাকার স্টাফ অফিসার কম্যাণ্ডিং কর্ণেল ইয়ানো জানতেন যে নেতাজী আসছেন এবং তিনি এও জানতেন যে নেতাজী রাশিয়ায় যেতে চান। তিনি বলেছিলেন, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির পক্ষেও সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এবং শেষ পর্যন্ত নেতাজীকে জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য টোকিওতেই যেতে হবে।'

এই অংশটুকু তো [illegible]েন; এবার শুনুন এ সম্পর্কে হাচাইয়ার নিজের বক্তব্যটা কি। শ্রী হাচাইয়া খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য

দিতে এসে বলেছেন : 'নেতাজী ব্যাঙ্ককে এসে পৌঁছবার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললাম : "জাপান সরকারের কাছ থেকে আমি একটা জরুরী বার্তা পেয়েছি। সেই বার্তায় তারা বলেছেন, জাপানের সমরোদ্যমে সাহায্য করার জন্য জাপান সরকার আপনার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। তারা জানতে চেয়েছেন, তারা আপনার জন্য এখন আর কি করতে পারেন।" আমার কথা শুনে নেতাজী বললেন, তিনি জাপানে যেতে চান। হয়ত তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে তিনি মাঞ্চুরিয়ায় যাবেন, কিন্তু মুখে বললেন, তিনি জাপান যেতে ইচ্ছুক।'

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, খোসলা কমিটির সামনে দেওয়া হাচাইয়ার সাক্ষ্য এবং শাহনওয়াজ কমিটি উল্লিখিত হাচাইয়ার বক্তব্যের মধ্যে কোনও তফাৎ আছে কিনা, সেটা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখুন। ভেবে দেখুন, কিয়ানোর মত অনুযায়ী 'শেষ পর্যন্ত নেতাজীকে জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য টোকিওতেই যেতে হবে', আর 'নেতাজী নিজে থেকে জাপান যেতে চেয়েছিলেন'—এ দুটো কথার মধ্যে কোনও তফাৎ আছে কিনা? ভেবে দেখুন, 'তিনি রাশিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন' এবং 'হয়ত তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে তিনি মাঞ্চুরিয়ায় যাবেন'—এই কথা দুটোর মানে একই দাঁড়ায় কিনা?

এবার আসুন, সেদিনের সেই ঘটনা সম্পর্কে জেনারেল ইসোদা কি বলছেন, সেটা একবার শুনে নেওয়া যাক। খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে জেনারেল ইসোদা স্বীকার করেছেন : তাঁদের উভয়ের মধ্যে আলোচনাকালে নেতাজী বলেছিলেন, যেহেতু জাপান আত্মসমর্পণ করেছে সেহেতু তাঁর পক্ষে জাপানে যাওয়া সম্ভব হবে না; তার থেকে বরং তিনি অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেবেন। এবং সেই কথার ওপর ভিত্তি করেই নাকি জেনারেল ইসোদা নেতাজীকে বলেছিলেন : 'জেনারেল সিদেই যে বিমানে করে মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছেন, আপনিও তো সেই বিমানে করেই যেতে পারেন।'

শুধু তাই নয়, জেনারেল ইসোদা নেতাজীকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এবং এসব প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান ঘটেছিল একান্তই নিভৃতে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী: 'ব্যাঙ্ককে আমি এবং নেতাজী একত্রে বসেই একটা পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিই। এবং সে কাজটা সমাধা হয়েছিল খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। কারণ সে সম্পর্কে জেনারেল ভোঁসলের সঙ্গে আগে থাকতেই আমি কথাবার্তা বলে রেখেছিলাম। তাই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে খুব বেশি সময় লাগল না। আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, নেতাজী মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়ায় চলে যাবেন। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই পাকা হয়ে গেল।'

কথাটা একটু মনে রাখবেন, মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, জেনারেল ইসোদা বলছেন, সব কিছু নাকি আগে থাকতেই ঠিক হয়ে-গিয়েছিল! তাছাড়া তিনি এ কথাও বলছেন যে, তিনিই নেতাজীকে বলেছিলেন, 'জেনারেল সিদেই যে বিমানে করে মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছেন, আপনিও তো সেই বিমানে করেই যেতে পারেন।' অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার কি দেখুন, জেনারেল ইসোদার পক্ষে চট করে যে কথাটা বলে দেওয়া সম্ভব হল, হাচাইয়ার মত অনুযায়ী, কর্ণেল ইয়ানো কিন্তু সেই কথাটাকেই বেমালুম হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'না, তা সম্ভব নয়। জেনারেল ইসোদা তো দূরের কথা, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচিও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নেতাজীকেই ছুটতে হবে টোকিওতে জাপ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য।' এবার বলুন, কার কথা বিশ্বাস করব? কাকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে মনে করব?

এগুলো কি ভেলকি নয়? এগুলোকে কি আপনারা গুরুতর অসঙ্গতি বলে মনে করেন না? এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যকে কি আপনারা নিতান্ত মামুলী ঘটনা বলে উড়িয়ে দেবেন? এই অযৌক্তিক ব্যাপারগুলোকে কি আপনারা যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় বলে

স্বীকার করে নেবেন ?'

আমি জানি, তা হবে না ; তা আপনারা করবেন না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষেই তা করা সম্ভব নয়—কেউ তা করতে পারেও না।

মাফ করবেন মাননীয় আদালত, সামান্য অসতর্কতার জন্য এইমাত্র আমি একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে ফেললাম। এই যে এখনই বললাম, 'কেউ তা করতে পারেও না'—এটাই হচ্ছে একটা বড় মিথ্যে ; এটাই হচ্ছে একটা মারাত্মক ভ্রান্তি ! কেউ পারে না—এ কথা বলাটা এখন আর ঠিক উচিত হবে না। কারণ, কেউ না কেউ যে পারে তা তো ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েই গেছে। কেউ না কেউ যে দিনকে রাত, এবং রাতকে দিন বলে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাও তো আমরা বেশ কিছুদিন হল জেনেই গেছি। তাহলে আপনারাই বলুন, এরপর আর কি করে বলব যে, কেউ-ই তা করতে পারে না ? কি করে বল যে, কারও পক্ষ্যেই তা করা সম্ভব নয় ?

যাই হোক, কারা পারে আর কারা পারে না—সেই কূট-তর্কের আলোচনা করে আমি আপনাদের মূল্যবান অসময়ের অপচয় ঘটাতে চাই না। তার থেকে, যে কাজে এখানে এসেছি, সে কাজই আগে শেষ করার চেষ্টা করি। চলুন, আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে।

আপনারা দেখেছেন, হাচাইয়া এবং ইসোদার বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট-পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। আপনারা আবার এ-ও দেখেছেন যে, ওই দুজনে এক-ই ঘটনার সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সে ঘটনা সম্পর্কে কিছুতেই এক রকমের কথা বলছেন না। বরং যখনই বুঝতে পারছেন যে, তাঁদের উলটো-পালটা বক্তব্যে ব্যাপারটা গোল-মেলে হয়ে যাচ্ছে, তখনই ওঁরা বলছেন, এটা মনে হয়েছিল, ওটা ভেবেছিলাম ইত্যাদি ভাসা ভাসা গোছের কথা। তবু তার মধ্য থেকেই একটা বিষয় আমাদের সামনে জলের মত পরিষ্কার হয়ে

গেছে যে, নেতাজী সব সময়েই চাইছিলেন রাশিয়ায় চলে যেতে। ওঁরা দুজনেই স্বীকার করেছেন, জাপান নয়, রাশিয়াই ছিল নেতাজীর মূল লক্ষ্য। এবং তারজন্যই তিনি সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্ককে এসেছিলেন; আর তারজন্যই ব্যাঙ্কক ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন সায়গনের পথে।

মহামান্য আদালত, হাচাইয়া এবং ইসোদার পরে আর একজন সাক্ষীকে আমি আপনাদের সামনে হাজির করছি। ইনি শ্রীভাস্করণ—নেতাজীর সেই ব্যক্তিগত শ্রুতিধর ভদ্রলোকটি। ব্যাঙ্ককের ঘটনাবলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীভাস্করণ খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন: 'রাত নটা নাগাদ জাপানীরা নেতাজীর বাংলোতে এলেন। নেতাজীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বারকক্ষে জেনারেল ইসোদার আলোচনা শুরু হল। সেখানে আর কেউ ছিল না; এমনকি কোন দোভাষীও নয়। সেই আলোচনাতেই নেতাজীর ভবিষ্যত কর্মসূচি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছিল বলে আমি মনে করি। তারপর আর কারও সঙ্গে তাঁর কোন বৈঠক হয়নি। সেদিন সারা রাত ধরে তিনি আমাকে একটার পর একটা ডিকটেশন দিয়ে গেলেন—একটার পর একটা নির্দেশ দিলেন। তারমধ্যে জন. এ. থিবিকে লেখা একটা চিঠির কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না। সে চিঠিতে এক জায়গায় নেতাজী লিখেছিলেন: 'কাল-ই আমি বিমানে এক দীর্ঘ যাত্রা শুরু করছি; কে জানে, এই বিমান যাত্রাই হয়ত আমার শেষ যাত্রা; এতেই হয়ত আমি দুর্ঘটনায় মারা যাব।'' '

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, শ্রী ভাস্করণ তাঁর সাক্ষ্যে আরও অনেক কথা বলেছিলেন; কিন্তু সে সব নিয়ে এই মুহূর্তেই আমি কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে প্রস্তুত নই। শুধু বর্তমান প্রসঙ্গের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। এবার শুনুন, আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেদিনকার সেই ঘটনাবলী সম্পর্কে কি বলেছেন।

ভদ্রলোকের নাম কর্ণেল হবিবুর রহমান ; নেতাজীর শেষ বিমান যাত্রার একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী। যুদ্ধ-শেষে ব্রিটিশের হাতে বন্দী হবার পর, ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারদের প্রশ্নের উত্তরে কর্ণেল রহমান বলেছিলেন : 'আমরা ব্যাঙ্ককে পৌঁছবার পর জেনারেল ভোঁসলে আমাদের একটা গাড়িতে করে একটা বাংলোয় নিয়ে গেলেন। সেখানে জেনারেল ইসোদা এবং হাচাইয়া ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা হল। তাঁরা জানালেন, জাপ সরকারের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে তাঁরা তখনও কোন নির্দেশ পাননি। ফলে তাঁদের পক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের আলাদাভাবে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা প্রস্তাব করলেন, নেতাজী যেন নিজে সায়গনে গিয়ে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। এবং তাঁরা এ-ও জানালেন যে, এ ব্যাপারে সহোযা করার জন্য তাঁরা দুজনেই নেতাজীর সঙ্গে সায়গনে যেতে রাজি আছেন। এরপর বৈঠক শেষ হল ; নেতাজীর সঙ্গে আমরা আমাদের বাংলোয় ফিরে এলাম।'

খুব-ই ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভাস্করণ যে বললেন, বৈঠকটা নেতাজীর বাংলোতেই হয়েছিল, এবং রুদ্ধদ্বারকক্ষে—তার কারণ কি? তা হলে কে মিথ্যে কথা বলছেন? তা ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের নামই বা এক এক সময় এক এক রকম হচ্ছে কেন? এই অসঙ্গতির পেছনের কারণটা কি?

মাননীয় বিচারপতিগণ, আপনারা হয়ত বলবেন যে, এমনও তো হতে পারে যে নেতাজী ইসোদা ও হাচাইয়ার সঙ্গে কয়েকবার বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন ; এবং তার মধ্যে কোনটা হয়েছিল নেতাজীর বাংলোতে, কোনটা আবার ইসোদার বাড়িতে। আর যেটা নেতাজীর বাংলোতে হয়েছিল সেটারই বর্ণনা দিয়েছেন ভাস্করণ ; এবং যেটা ইসোদার বাড়িতে হয়েছিল, সেটার কথা

বলেছেন কর্ণেল রহমান।

আমি স্বীকার করছি তা হতে পারে, এবং তা হওয়া সম্ভবও। কিন্তু মাননীয় আদালত, একটা বিষয় যে আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না! হবিবুর বলছেন, জেনারেল ভোঁসলে নেতাজী ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে একটা গাড়িতে করে একটা বাংলোয় নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেই বাংলোতে জেনারেল ইসোদা এবং হাচাইয়া আগে থাকতেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা পৌঁছবার পরই তাঁদের উভয় তরফের মধ্যে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যদি তাই হয়, যদি হবিবুরের বক্তব্য অনুযায়ী সকলে মিলে ইসোদা এবং হাচাইয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য কোন বাংলোতে গিয়েই থাকেন, যেখানে ওই দুজন বিশিষ্ট জাপানী উচ্চপদস্থ কর্মচারী আগে থাকতেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাহলে জেনারেল ইসোদার সে কথা অস্বীকার করার কারণ কি? কেন বহুভাবে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি সে ঘটনার কথা স্বীকার করতে চাইছেন না? কেন তিনি বারবার বলছেন যে, না, আমিই নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁর বাংলোতেই গিয়েছিলাম, তিনি কখনও আমার কাছে আসেননি! বলুন, এই রহস্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? কেন কেউ না কেউ ব্যাপারটা সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলছেনই? কেন একজন না একজন আসল ঘটনাকে চেপে যাচ্ছেন? বলুন, এর কারণ কি?

আপনাদের সুবিধের জন্য খোসলা কমিটির সামনে দেওয়া জেনারেল ইসোদার সাক্ষ্যের কিছুটা বিবরণ আমি তুলে ধরছি। নেতাজী স্বাগত সমিতির কৌঁসুলী শ্রী বলরাজ ত্রিখা যখন ইসোদাকে প্রশ্ন করেন: 'আপনি কি ব্যাঙ্কক-বিমানঘাঁটি থেকে নেতাজীকে সোজা আপনার বাংলোতে নিয়ে গিয়েছিলেন?' তখন ইসোদা পরিষ্কার বলেন: বিমানঘাঁটি থেকে নেতাজীর আমার বাংলোতে

আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না প্রয়োজন হলে আমিই তাঁর অফিসে যেতাম।'

এরপর ত্রিখা জানতে চান: 'তাহলে আপনার বাড়িতে বসে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে কোন আলোচনাই হয়নি?'

জবাবে ইসোদা বলেন: 'হ্যাঁ, আলোচনা হয়েছিল। তবে সেটা আমার বাড়িতে নয়, তাঁর অফিসে।'

এ থেকে আপনারা কি বুঝলেন? হবিবুর-ই মিথ্যেবাদী—তাই নয় কি? তাছাড়া আর কী-ই-বা অনুমান করা যেতে পারে? একদিকে ভাস্করণ এবং ইসোদা—দুজনই বলছেন যে বৈঠকটা নেতাজীর বাড়িতেই হয়েছিল; অন্যদিকে একমাত্র হবিবুর-ই বলছেন যে, না, সেটা ইসোদার বাড়িতেই হয়েছিল। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটাকেই তো আমরা মেনে নেব, তাই না?

কিন্তু অত ধৈর্যহারা হলে তো আমাদের চলবে না। এ যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র! হাজার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এর অবয়ব! একে কি এত সহজে বোঝা সম্ভব! এত সহজে কি এর নাগাল পাওয়া যাবে!

না, তা কখনও সম্ভব হবে না। যদি হত, তাহলে আজ আমি এভাবে আপনাদের বিবেকের দুয়ারে করাঘাত করতে আসতাম না। আজ এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নথীপত্র ঘেঁটে, সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে এই মামলা সাজাবার চেষ্টা করতাম না। সোজাসুজি দেখিয়ে দিতাম আসামীকে। বলতাম, এই হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারী, আর এই হচ্ছে তার অপরাধ। আপনারা এবার ওর বিচার করুন—, বলুন, ও 'দোষী' না 'নির্দোষী'? যদি মনে করেন ও দোষী, তবে চটকে দিন ওকে ফাঁসিতে।

ব্যাস, ঝামেলা চুকে যেত; সব কিছু ফর্সা হয়ে যেত দিনের আলোর মত। তারপর সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে ফিরে যেতাম ঘরে—শুয়ে পড়তাম অবসন্নতার কোলে। আস্তে আস্তে চোখ

জুড়িয়ে আসত ঘুমে। তারপর শুরু হত স্বপ্ন দেখার পালা। নিদ্রা-দেবীর হাত ধরে এগিয়ে যেতাম এক স্বপ্নের রাজ্যে। সেখানে পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা হত— অনেকের সঙ্গেই আলাপ উঠত জমে। তারই মাঝখানে হয়ত হঠাৎ-ই চোখে পড়ে যেত সেই মানুষটিকে ; সেই হারিয়ে যাওয়া ভারত-পথিককে।

থাক, আর নয়। যে স্বপ্ন কখনও সফল হবে না, সে স্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না। তার থেকে আসুন, যে কথা বলছিলাম, তাই বলি। হবিব বলেছেন, নেতাজী ইসোদার বাড়িতে গিয়েছিলেন, আর ইসোদা বলছেন যে তিনি জানেনি। তাহলে এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, এই দুজনের মধ্যে কার কথাকে আমরা বিশ্বাস করব ? কাকে বলব সত্যবাদী ?

ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আসুন এ ব্যাপারে আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী কি বলছেন, সেটা একবার শোনা যাক। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের বারই নভেম্বর ব্যাঙ্ককে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের জেরার উত্তরে কে· ওয়াতানাবে নামে একজন জাপানী ভদ্রলোক, যিনি যুদ্ধের সময় জাপ সামরিক দপ্তরে দোভাষীর কাজ করতেন; তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ষোলই বা সতেরই অগস্ট ব্যাঙ্ককে নেতাজীর সঙ্গে ইসোদার একটা বৈঠক হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'ওই দিন জেনারেল ইসোদার বাড়িতে একটা বৈঠক হচ্ছিল। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা, কর্ণেল কাগাওয়া, নেতাজী, মেজর জেনারেল ভোঁসলে এবং লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল হবিবুর রহমান। আমার ডাক পড়েছিল ওঁদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য। কিন্তু আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বৈঠক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ইসোদা কোন দোভাষী ছাড়াই কথা বলছিলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল নেতাজীকে কিভাবে মাঞ্চুরিয়ায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তাই।'

এ থেকে কি বোঝা যাচ্ছে ? হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এবার

আপনারাই বলুন, এরপর কাকে সত্যবাদী বলবেন, আর কাকেই বা বলবেন মিথ্যুক? ভাস্করণকে কোন পর্যায়ে ফেলবেন? কিংবা ইসোদাকে? অথবা হবিবকে? অথবা ওয়াতানাবেকে? বলুন, কি আপনাদের রায়?

ঠিক আছে, এখনই বলার দরকার নেই; আপনারা ভাবুন। আপনারা নিজেদের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিষয়টার বিচার বিশ্লেষণ করুন। তারপর, চূড়ান্ত রায় দেবার সময় এ প্রশ্নটারও একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন; এটাকেও আপনাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার অঙ্গীভূত করে নেবেন—তা হলেই হবে; তাহলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

এবার চলুন, ঘটনার তালে তালে পা ফেলে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই। খোঁজ করে দেখি তাঁর কর্মসূচীর ভেতর সেদিন আর কোন্ কোন্ বিষয় ছিল? ব্যাঙ্ককে সেদিন নেতাজী আর কি কি করেছিলেন?

আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে ভাস্করণের ওপর আমরা যথেষ্ট নির্ভর করতে পারি। কারণ, সেদিন প্রায় সারাটা রাতই তিনি নেতাজীর সাথে সাথে ছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটা কাজেই তিনি কোন না কোনভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেই ভাস্করণের এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছেঃ 'নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে পাওয়া দ্রব্য সামগ্রীর বেশ কিছু অংশ সেদিন আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকজনদের মধ্যে বিলি করে দিলেন। কাউকে দিলেন একটা ঘড়ি, কাউকে একটা সোনার হার, কাউকে এক জোড়া চুড়ি, আবার কাউকে একসেট বোতাম। আর বাকি যা রইল, প্রায় তিরিশ কেজি সোনা এবং সমপরিমাণের সোনার গহনা—সেগুলো ভর্তি করে নিলেন তিন চারটে সুটকেসে এবং একটা বড় ব্যাগে।'

ভাস্করণ যখন তাঁর বিবৃতি দিচ্ছিলেন খোসলা কমিটির সামনে

তখন সরকার পক্ষের কৌঁসুলী শ্রী ভাসিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন 'এই সব গহনা এবং সোনার কি কোন তালিকা ছিল ?'

ভাস্করণ জবাবে বলেন : 'হ্যাঁ ছিল, এবং সেটা আমিই তৈরি করেছিলাম। তারমধ্যে দুটো বড় সোনার মালার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে অছে ; আমিই সেগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম সুটকেসের ভেতর।'

মাননীয় আদালত, এই ঘটনাটার কথা আপনাদের বললাম বিশেষতঃ এই কারণেই যে এর থেকে আপনারা অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারবেন যে, কিছু কিছু সাক্ষীর জবানবন্দী অনুযায়ী, নেতাজী আবার সিঙ্গাপুরে কিংবা ব্যাঙ্ককে কিংবা স্যায়গনে ফিরে আসবেন মনস্থ করেই টোকিওর পথে রওয়ানা দিয়েছিলেন বলে যা বলা হয়েছে সেটা কত ভেক ! সেটা কত হাস্যকর ! আমি মনে করি, এই সামান্য ঘটনাটাই একথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, চূড়ান্তভাবে অন্তর্ধান করবেন ঠিক করেই নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেছিলেন। আর সে কারণেই তিনি ব্যাঙ্ক থেকে সব সোনা-দানা আগে থাকতে তুলে এনে জড় করেছিলেন ব্যাঙ্ককে। এবং তার মধ্য থেকে কিছুটা বিলি বন্দোবস্ত করে, বাকিটা নিয়ে তিনি রওয়ানা দিয়েছিলেন নিরুদ্দেশের পথে।

শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্ককে সংঘটিত আরও একটা ঘটনা নেতাজীর চূড়ান্ত অন্তর্ধানের ইঙ্গিতবহ। সেখানে থাকাকালীনই তিনি এক বিশেষ আদেশবলে মেজর জেনারেল ভোঁসলেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ করেন। ফলে তাঁর নিজের ওপর যে দায়িত্ব ছিল, সেটা ভাগ হয়ে যায় দুজনের মধ্যে। এম. জেড. কিয়ানি হন রাষ্ট্রপ্রধান, আর জে. কে. ভোঁসলে হন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

এই তিনটে ঘটনা—কিয়ানির নিয়োগ, ভোঁসলের পদোন্নতি এবং বিপুল পরিমাণ সোনা নিজের সঙ্গে নেওয়া থেকে কি এটাই স্পষ্টভাবে

প্রমাণিত হয় না যে নেতাজী আর ফিরবেন না ঠিক করেই যাত্রা শুরু করেছিলেন? তিনি রাশিয়ায় চলে যাবেন মনস্থ করেই সিঙ্গাপুর থেকে রওয়ানা দিয়েছিলেন?

এখন আপনারা নিশ্চয় প্রশ্ন তুলবেন, যদি তাই হয়, যদি নেতাজী রাশিয়ায় চলে যাবেন বলেই মনস্থ করে রেখেছিলেন তবে আবার দেবনাথ দাসকে কেন তিনি তাঁর স্থলপথে ভারতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাটা তৈরি রাখতে বলেছিলেন? কেন তিনি ব্যাঙ্কক থেকে যাত্রার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিকল্পনাটা ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা যাচাই করে নিয়েছিলেন?

এর উত্তরে আমি মাত্র দুটো শব্দ ব্যবহার করব। সে শব্দ দুটো হল: 'নেতাজী-স্টাইল'। এ ছাড়া আমার শব্দ ভাণ্ডারে এমন কোন শব্দ নেই যা দিয়ে আমি বিষয়টাকে এত সহজভাবে বোঝাতে পারি। আমি মনে করি—এ স্টাইলটা নেতাজীর একান্তই নিজস্ব স্টাইল। তিনি তার ছোটবেলা থেকেই এই স্টাইলটা ব্যবহার করে এসেছেন। যখনই শত্রু পক্ষের চোখে ধুলো দেবার প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি এই বিশেষ স্টাইলটা ব্যবহার করেছেন—তারজন্য তাঁর বন্ধুদের বিভ্রান্ত করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, তখন থেকে আমি আপনাদের কী বোঝাতে চাইছি, আশা করি, এতক্ষণে তা আপনারা বুঝে উঠতে পেরেছেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের সবার কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমার বক্তব্য বিষয়টা কি—আমি ঠিক কী বলতে চাইছি। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়, চলুন, সময়ের তালে পা ফেলে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই এই কাহিনীর পরবর্তী অংশে। খুঁজে দেখি, সেই পর্বে আর কোন্ রহস্য-সুন্দরী সন্দেহের কালো ওড়নায় মুখ ঢেকে তৃষ্ণিত-নয়নে প্রতীক্ষা করছে আমাদের তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টির শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়ার বাসনায়। খুঁজে দেখি, আর কোন্ কাল-দস্যু বিস্মৃতির বিস্তৃত প্রান্তরে ক্রমাগত গহ্বর খুঁড়ে

চলেছে সময়ের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া তথ্যের বিপুল ঐশ্বর্যকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায়। চলুন, আজ সবাই মিলে ষড়যন্ত্রের বেড়া-জাল ভেঙ্গে উদ্ধার করে নিয়ে আসি সেই ওড়না-ঢাকা রহস্য-সুন্দরীকে। চলুন, সকলে একত্রিত হয়ে জোর করে গিয়ে বন্ধ করে দিই সেই কাল-দস্যুর গহ্বর-খোঁড়াকে। চলুন, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই এই কাহিনীর পরবর্তী অংশে।

হে মহামান্য আদালত, সেই অংশটুকু শুরু হয়েছিল সতেরই অগস্ট ভোর হওয়ার আগেই। তখনও উদয় 'সূর্যের দেশ নিপ্পনের আকাশ টপকে ঘুম-ভাঙ্গ সূর্যটা এসে পৌঁছতে পারেনি ব্যাঙ্ককের সীমানায়। তখনও রাত-জাগা তারাদের সতর্ক প্রহরা শেষ হয়নি নীল দিগন্তে। এমন সময় নেতাজী ভাস্করণকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন আইয়ারকে, হবিবকে, প্রীতমকে, গুলজারাকে, দেবনাথকে এবং আবিদকে। তলব পেয়ে ছ ছজন বিশ্বস্ত সেপাই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন নেতাজীর ঘরে ; সার বেঁধে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

প্রত্যেকের মুখের ওপর বেশ ভাল করে একবার চোখ দুটোকে বুলিয়ে নিলেন সর্বাধিনায়ক। তারপর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন : 'আপনারা সবাই তৈরি ?'

ছ ছটা কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে উত্তর দিল : 'হ্যাঁ স্যার, তৈরি।'

উত্তর শুনে খুশি হলেন মহানায়ক। বললেন : 'ঠিক আছে, তাহলে আর দেরি করার প্রয়োজন নেই ; আমরা এখনই রওয়ানা দেব।'

এবার শুরু হল বিদায়ের পালা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর, উত্তপ্ত নয়নের জল আর বক্ষচাপা বেদনার হা হুতাশ—মানব ইতিহাসের সেই চিরন্তন ইতিকথা! যে নাটক ইতিপূর্বে আরও লক্ষ-কোটিবার অভিনীত হয়েছে—ব্যাঙ্ককের বাংলোতে শুরু হল আবার সেই একই নাটকের অভিনয়। নেতাজী এগিয়ে এলেন বাইরের বারান্দার দিকে—ধীরে, অতি ধীরে, অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। তাঁর সে চলায়

কোন ক্লান্তি ছিল না ; কোন বিচ্যুতি ছিল না ; কোন বিক্ষেপ ছিল না। তবু, তারই মাঝে কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটছিল! কোথায় যেন একটা বেসুরো তাল বাজছিল! কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম হচ্ছিল!

এদিকে ততক্ষণে বারান্দায় জড়ো হয়ে গেছে ছ জন ছাড়া বাকি সবাই। তাদের প্রত্যেকের শরীরেই রাত-জাগার ক্লান্তি, প্রত্যেকের মুখেই বিচ্ছেদের বিষন্নতা, প্রত্যেকের চোখেই আতঙ্কের দৃষ্টি। তারা জানে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় দিতে হবে তাদের প্রাণপ্রিয় মানুষটিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সব চাওয়া-পাওয়া, সব দেওয়া-নেওয়া। তারপর, অবশিষ্ট থাকবে যা—সে তো শুধু স্মৃতি, স্মৃতি আর স্মৃতি। সেই স্মৃতির আঁচল ধরেই আসবে একটার পর একটা বিনিদ্র রজনী, একটার পর একটা দুশ্চিন্তা, একটার পর একটা আতঙ্ক। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে, শেষ পর্যন্ত সেই মানুষটি তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছেন তো! মনে হবে, তাঁর যাত্রা-পথে হঠাৎ কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয়নি তো! মনে হবে, কোন ষড়যন্ত্রের যাদুকর তাঁকে নিয়ে আবার মায়ার খেলা খেলবার চেষ্টা করেনি তো!

হে মাননীয় বিচারপতিগণ, আমার কথা শুনে আপনারা হয়ত ভাবছেন, আমি আমার কল্পনার প্রলেপ বুলিয়ে সেদিনকার সেই ঘটনাকে রঙে-রসে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। হয়ত মনে করছেন আপনাদের প্রভাবিত করার জন্যই আমি সব ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ আমার কল্পনা নয়—এ বাস্তব-সত্য। বরং, আমার মনে এই ভেবে আক্ষেপ হচ্ছে যে, হাজার চেষ্টা করেও আমি সেদিনকার সেই মর্মস্পর্শী মুহূর্তটির বিন্দু-মাত্র প্রতিফলন ঘটাতে পারছি না আপনাদের চোখের সামনে। আমার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে এই ভেবে যে, এত চেষ্টা করেও আমি এমন কোন শব্দ-সম্ভার সাজাতে পারছি-না যা দিয়ে

সেই বিষাদ-ঘন মুহূর্তটির যথাযথ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। তবে একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, সেদিন সেই মানুষগুলোর মনের অবস্থা যে কী ছিল—তা শুধু আমি কেন, কারও পক্ষেই ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; কোন ভাষাতেই তা প্রকাশযোগ্য হতে পারে না। তবু তারই মাঝে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা বিবরণ আমাদের হৃদয়কে কিছুটা আন্দোলিত কোরে তোলে; আমাদের অনুভূতিকে অন্ততঃ সামান্য পরিমাণেও নাড়া দিয়ে যায়।

আপনাদের অবগতির জন্য বলি, সেই প্রত্যক্ষদর্শীর নাম শ্রী এস. এ. আইয়ার; তাঁর লেখা স্মৃতিকথা 'আনটু হিম এ উইটনেস'। এই অসাধারণ আত্মজীবনীটিতেই তিনি সেই বিদায়-মুহূর্তের এমন একটি অসামান্য চিত্র এঁকে রেখেছেন যা কখনও ভোলা যাবে না; যা কখনও ভোলা সম্ভব হবে না। আজ আমি আপনাদের সামনে যা কিছু বলছি, জানবেন, আইয়ারের দেওয়া বর্ণনার তুলনায় তা নিতান্তই নিষ্প্রভ; তাঁর লেখনীর কাছে আমার মুখ-নিসৃত শব্দগুলো নিতান্তই হাস্যকর। তবু আমাকে তা বলতে হচ্ছে, কারণ, সে ঘটনার, বেড়াজাল অতিক্রম করতে না পারলে আমরা কিছুতেই ব্যাঙ্কক বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না।

আমি আগেই আপনাদের বলেছি, নেতাজী এগিয়ে এলেন বাইরের বারান্দার দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন বেদনা হত মানুষ—যাদের মনে তখন এক অশান্ত ঘূর্ণীর উথাল-পাথাল। তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এতটুকুও ঝুঁকলেন না—নির্ভিক সৈনিকের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে ডান হাতটাকে বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে; একান্ত বিশ্বস্ত মানুষগুলোকে আহ্বান জানালেন শেষবারের মত করমর্দন করার জন্য।

এবার আর কারও পক্ষে নিজেকে সংযত করে রাখা সম্ভব হল না। ভাস্করণ, পিল্লাই, রেজভি—কেউই আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তাঁদের মনের আবেগকে। প্রতিটি হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার যেন

মুহূর্তের মধ্যে খুলে গেল; প্রত্যেকটি নয়নের বাঁধ ভেঙ্গে নেমে এল অশ্রুর বন্যা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে নেতাজী কি করলেন? হে মাননীয় বিচার পতিবৃন্দ, শুনলে আপনারা অবাক হবেন, যাঁর চোখে কেউ সারা-জীবনে এক ফোঁটা অশ্রু দেখেনি, হাজার আঘাত সত্ত্বেও যাঁকে কেউ কখনও এতটুকু বিচলিত হতে দেখেনি, সতেরই অগস্টের ভোরে, সেই ইস্পাত-দৃঢ় মানুষটিই একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর আটচল্লিশ বছর ছ মাস চব্বিশ দিনের জীবনে সেদিনই তিনি প্রথম চোখের জল ফেললেন; সেদিনই তিনি প্রথম তাঁর হৃদয়ের আবেগের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। এরই মধ্যে, কখন যেন সবার অলক্ষ্যে টক্‌টকে লাল সূর্যটা এসে হাজির হয়ে গেছে পূবের আকাশে। নেতাজী বুঝলেন, আর অপেক্ষা করা চলে না— তাতে বিপদের সম্ভাবনাই শুধু বৃদ্ধি পাবে। তাই সহকর্মীদের বললেন গাড়িতে উঠতে; নিজেও এগিয়ে এসে উঠলেন একটা মোটরে।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ব্যাঙ্ককের এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে ছুটে চলল দুটো মিলিটারি গাড়ি। অমনভাবে প্রচণ্ড গতিতে দুটো গাড়িকে ছুটে যেতে দেখে পথচারীরা সত্যি একটু অবাক হল। তবে কেউ কিছু বোঝার আগেই গাড়ি চলে গেল দৃষ্টির বাইরে—শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটা নাম না জানা পথের কুকুর ঘেঁউ ঘেঁউ শব্দে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাল এই দ্রুততার বিরুদ্ধে।

সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই গাড়ি এসে পৌঁছে গেল এয়ার-পোর্টে। মুহূর্তের মধ্যে নেমে পড়লেন সব ক জন আরোহী। সঙ্গে যা মালপত্র ছিল তা-ও নামিয়ে ফেলা হল চটপট।

আগে থাকতেই দুটো জাপানী বম্বার অপেক্ষা করছিল সেখানে। নেতাজী তাঁর দলবল সহ এগিয়ে গেলেন সেদিকে। দু জন ভারতীয়

সহকর্মী ছাড়াও তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনজন জাপানী অফিসার। এরা হলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং নিগেশী।

সম্পূর্ণ দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এর এক দলে রইলেন নেতাজী, হবিবুর, আইয়ার, প্রীতম, এবং নিগেশী; অন্য দলে রইলেন ইসোদা, হাচাইয়া, গুলজারা, আবিদ এবং দেবনাথ। দুটো দল দুটো বিমানে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল যাত্রা। সকাল ঠিক আটটার সময় ব্যাঙ্কক বিমান-বন্দর ছেড়ে দুটো বিমানই রওয়ানা দিল সায়গনের পথে।

ঠিক তিনটে ঘণ্টা সময় লাগল জাপানী বম্বারের। তিন ঘণ্টা পর দুপুর এগারটা নাগাদ দুটো বিমানই একসঙ্গে এসে নামল সায়গনে।

এরপরই শুরু হল আসল নাটক।

নেতাজী যে সায়গনে আসছেন একথা আগে থাকতে কেউ জানত না। শুধু চন্দ্রমল নামে এক ভদ্রলোক কিভাবে যেন খবরটা জেনে গিয়েছিলেন কোথা থেকে। তাই বিমান যখন এরোড্রামের মাটি ছুঁল, তখন দেখা গেল ওই একজন মাত্র লোক-ই সেখানে অপেক্ষা করছেন ওঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

'মাননীয় আদালত, ব্যাঙ্কক থেকে সায়গন আগমন পর্যন্ত কি কি ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই ঘটনা সম্পর্কে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কখন কি কথা বলেছেন—সে বিষয়ে আমি এবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমে দেখুন যাত্রার সময় এবং সাইগনে পৌঁছবার সময় সম্পর্কে কার কি বক্তব্য। যদিও প্রত্যেকেই বলেছেন যে দুটো বিমানই প্রায় একই সময়ে যাত্রা করেছিল এবং একই সময়ে সায়গনে এসে পৌঁছেছিল, তবু তারই মাঝে কিভাবে যেন দু দুটো ঘণ্টার ব্যবধান ঘটে গেল! প্রথম বিমানের যাত্রী আইয়ার খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন: 'আমরা সকাল ঠিক আটটার সময় ব্যাঙ্কক থেকে যাত্রা করলাম এবং দুপুর ঠিক এগারটায়

এসে পৌঁছলাম সায়গন বিমান-বন্দরে।'

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিমানের যাত্রী শ্রী দেবনাথ দাসের বক্তব্যটা কি তা একবার শুনুন। শ্রী দাস শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন: 'আমরা সকাল আটটা নাগাদ সায়গনে এসে পৌঁছলাম।' তার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে যাত্রা শুরু করেছিলাম ব্যাঙ্কক থেকে।'

এবার আসুন কর্ণেল হবিবুর রহমানের বক্তব্যটা একটু যাচাই করে নেওয়া যাক। কর্ণেল রহমান খোসলা কমিটির সামনে হাজির হতে অস্বীকার করেছেন এই যুক্তিতে যে তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর যা কিছু বলার ছিল তা তিনি শাহনওয়াজ কমিশনের কাছেই বলেছেন, সুতরাং আবার আর একটা কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। অতএব শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে দেওয়া কর্ণেল রহমানের বিবৃতিকেই আমরা তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য বলে ধরে নিতে পারি।

এই বক্তব্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি: 'সকাল সাতটা নাগাদ দুটো বিমানই একসঙ্গে ব্যাঙ্কক থেকে রওয়ানা দিয়েছিল এবং সকাল দশটার সময় দুটো বিমান একসঙ্গে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে নেমেছিল।'

এরপর বাকি আছেন আর একজন সাক্ষী। তিনি লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা। শ্রী ইসোদা খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন: 'দুপুর ঠিক এগারটার সময় দুটো বিমানই এসে নামল সায়গন বিমানবন্দরে।'

মাননীয় আদালত, ব্যাঙ্কক থেকে যাত্রার সময় এবং সায়গনে এসে পৌঁছবার সময়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত আমরা তিন ঘণ্টার ব্যবধান পেয়েছি। চারজন সাক্ষীর মুখ থেকে শুনেছি তিনটে বিভিন্ন বক্তব্য। প্রথম বিমানের যাত্রী ছিলেন আইয়ার এবং রহমান দুজনেই। এরা দুজনই যাত্রার সময় এবং পৌঁছনর সময়ের দু রকম

বিবরণ দিয়েছেন—ছ্জনের বক্তব্যে এক ঘণ্টার ব্যবধান ঘটেছে। কিন্তু সব থেকে অবাক করেছেন দ্বিতীয় বিমানের যাত্রীরা। তাঁদের ছ্জনের দেওয়া সময়ের মধ্যে ব্যবধান ঘটেছে পুরো তিনটে ঘণ্টার। দেবনাথ দাস যেখানে বলছেন যে বিমান সায়গনের মাটি ছুঁয়েছিল সকাল ঠিক আটটায়, ইসোদার সেখানে বক্তব্য হচ্ছে যে, না, ওটা হবে বেলা ঠিক এগারটা। এবার আপনারাই বলুন, এই পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের কোনটাকে আমরা গ্রহণ করব? সঠিক ইতিহাস লেখার জন্য কোন সময়টাকে নির্দিষ্ট করব?

তাছাড়া কে কোন বিমানে করে যাত্রা করেছিলেন, তা-ও কেউ ঠিক করে বলে উঠতে পারছেন না। আইয়ার যেখানে বলছেন যে, নেতাজী, হবিব, প্রীতম, নিগেশী এবং তিনি একই বিমানে ছিলেন; সেখানে হবিবের বক্তব্য হচ্ছে যে, না, তিনি ওদের বিমানে ছিলেন না, ছিলেন এমন একটা বিমানে যে বিমানের যাত্রী ছিলেন ইসোদা, হাচাইয়া, হাসান এবং প্রীতম। অন্ততঃ উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে হবিব যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, এবং যে বিবৃতি খোসলা কমিটির সামনে পেশ করা হয়েছিল—তা থেকে আমরা এটাই জানতে পারছি। অথচ মজার ব্যাপার দেখুন, হবিবের বিবৃতি অনুযায়ী যে দেবনাথ দাসের নেতাজীর বিমানে থাকার কথা সেই দেবনাথ দাস নিজে কিন্তু বলছেন যে তিনি তা ছিলেন না; তিনি ছিলেন ইসোদার বিমানে এবং সেই বিমানে একবারের জন্যও তিনি হবিবকে দেখতে পাননি। আবার ইসোদা এ সম্পর্কে কি বলছেন তা-ও শুনুন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী হবিব কখনই তাঁর বিমানে ছিলেন না, এবং গুলজারা—যাকে হবিব চড়িয়ে দিয়েছিলেন নেতাজীর বিমানে—তিনি সারাটা পথ ইসোদার সঙ্গে বসেই এসেছিলেন ব্যাঙ্কক থেকে সায়গন পর্যন্ত।

হে মহামান্য আদালত, আপনারাই বলুন, এই অদ্ভুত ঘটনাবলীর বিবরণ শুনতে শুনতে আপনাদের নিজেদের মনেই কি বিভ্রান্তির

সৃষ্টি হচ্ছে না? আপনাদের নিজেদের কাছেই কি ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে না? আপনাদের নিজেদেরই কি মনে হচ্ছে না যে সবই যেন কেমন ঘোলাটে! সবই যেন কেমন ধোঁয়াশা!

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা-ই। এই মামলা চলাকালীনই আপনারা দেখতে পাবেন—প্রতিটি সাক্ষীই সাক্ষ্য দেবার সময় নিজেকে শতকরা এক শ ভাগ প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করছেন, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার তারা প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দিতে এসে একজন আরেকজনের ঠিক বিপরীত ঘটনার কথা বলছেন; প্রত্যেকেই পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য রাখছেন। সুতরাং আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ওরা সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী হবেন তাহলে প্রত্যেকেই এমন উলটো-পালটা কথা বলছেন কেন? কেন তাদের প্রতিটি কথার মধ্যে এমন সীমাহীন অসঙ্গতি?

একটু আগেই আপনাদের সায়গন বিমান বন্দরে পৌঁছন পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছি। সে সম্পর্কে কার কি বক্তব্য তা-ও বলেছি। এবার শুনুন, বিমানঘাঁটিতে পৌঁছবার পর কি কি নাটক অনুষ্ঠিত হল তার কাহিনী।

আইয়ার বলেছেন: 'সায়গন বিমানবন্দরে নামার পরই নেতাজী এবং জাপানী অফিসারদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি কিছুটা আলোচনা হল। তারপরই ইসোদা ও হাচাইয়া বিমানে দালাত অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। উদ্দেশ্য, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী আলোচনা করা। আর আমরা, নেতাজীসহ অন্য সবাই গাড়িতে করে চলে এলাম শহরে; সেখানে এসে আশ্রয় নিলাম ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সদস্য শ্রী নারায়ণ দাসের বাড়িতে।'

আইয়ারের এই বক্তব্য আমরা জানতে পারছি খোসলা কমিটির সামনে দেওয়া তাঁর সাক্ষ্য থেকে। অবশ্য আইয়ার সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতেও ওই একই কথা লিখেছিলেন; তবে সেখানে ছিল আর একটা অতিরিক্ত সংযোজন—শ্রীচন্দ্রমল নামে এক ভদ্রলোক,

যিনি নেতাজীর সায়গনে আসার খবরটা কিভাবে যেন আগে ভাগেই জেনে ফেলেছিলেন এবং সকাল থেকে এসেই অপেক্ষা করছিলেন বিমানঘাঁটিতে।

যাই হোক, বিশ-ত্রিশ বছরের ব্যবধানে ঘটনার কিছুটা এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তারজন্য কিছু মনে করাটা আমাদের ঠিক উচিত হবে না। তার থেকে আসুন, অন্য দু একজন সাক্ষী সে ঘটনার কি বিবরণ দিচ্ছেন তা শোনা যাক।

কর্ণেল হবিবুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে বলেছেন: 'সায়গন বিমানবন্দরে নেমে আমরা দেখলাম, বেশ কয়েকজন জাপানী অফিসার নেতাজীর সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছেন। সেখানে ভারতীয় কেউ ছিল না। বিমান থেকে নেমেই লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা এবং হাচাইয়া ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির স্টাফের একজন কর্ণেলের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর তাঁরা দুজনেই নেতাজীকে জানালেন যে তখনই নেতাজীর তেরাউচির সদর-দপ্তরে যাওয়াটা খুবই দরকার। কারণ, উভয়ের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ওঁদের কথায় নেতাজী রাজি হলেন। কিন্তু আধঘণ্টা পরেই তাঁরা আবার এসে জানালেন যে আত্মসমর্পণের পর চারদিকে যেরকম বিশৃঙ্খলা চলেছে তাতে নেতাজীর তেরাউচির সঙ্গে দেখা করে কোন লাভ হবে না। ফলে সবাই মিলে আমরা শহরের পথে রওয়ানা দিলাম।'

কর্ণেল রহমানের বক্তব্যের পর শুনুন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদার বক্তব্যটা কি। জেনারেল ইসোদা খোসলা কমিশনের সামনে বলেছেন: 'আমি সায়গন বিমানবন্দরে নেমে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির স্টাফ অফিসার কর্ণেল টাডার কাছে শুনলাম যে নেতাজী এবং তাঁর ছ জন সহকর্মীকে নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে যে বিমান দুটো এসেছে সে বিমানের কোনটাই সায়গন থেকে আর এগোতে পারবে না। নেতাজীকে এবার অন্য একটা বিমানে করে যাত্রা করতে

হবে ; এবং সে বিমানে শুধু নেতাজী ছাড়া অন্য কোন ভারতীয়ের জায়গা হবে না। খবরটা শুনে আমি বেশ বিচলিত হলাম, এবং নেতাজীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সব শুনে নেতাজী বললেন, তিনি তাঁর সহকর্মীদের ফেলে রেখে কোথাও যাবেন না ; এবং আমাকে অনুরোধ করলেন, সেই ধরণের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। আমি কর্ণেল টাডাকে নেতাজীর বক্তব্য বললাম। কিন্তু কর্ণেল টাডা সোজাসুজি বললেন, তারপক্ষে সে ধরণের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না ; নেতাজীকে যেতে হলে জেনারেল সিদেই যে বিমানে যাচ্ছেন সেই বিমানে করেই যেতে হবে ; এবং যেতে হবে একাই। কর্ণেল টাডার এই বক্তব্যে আমি খুশি হতে পারলাম না। তাই ঠিক করলাম, নিজে গিয়েই দেখা করব ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে ; তাঁকে গিয়ে বুঝিয়ে বলব সব ব্যাপারটা। এবং সেই উদ্দেশ্যেই রওয়ানা দিলাম দালাতের পথে।'

এবার বলুন, তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিনটে বিবৃতির মধ্যে কোন্‌টাকে আমরা গ্রহণ করব ? আইয়ারেরটা, হবিবেরটা, নাকি ইসোদারটা ?

যদি আইয়ারের বক্তব্য মেনে নিই তাহলে হবিবকে বলতে হয় মিথ্যেবাদী। কারণ, বিমান থেকে নেমেই আইয়ার দেখেছিলেন চন্দ্রমলজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এমনকি তিনি যে সকাল থেকে ওঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সেটাও জেনে নিতে ভুল হয়নি আইয়ারজীর। কিন্তু বেচারা হবিবের ভাগ্যটাই খারাপ ! সারাটা বিমানবন্দর তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি একজন ভারতীয় কেন—কয়েকজন জাপানী ছাড়া আর কোন জাতের কোন লোককেই দেখতে পেলেন না !

শুধু কি তাই ? হবিব যেখানে শুনলেন যে নেতাজীকে তেরাউচির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য ইসোদা অনুরোধ করছেন, সেখানে কিনা স্বয়ং ইসোদাই বলছেন যে, তিনি নন, বরং নেতাজীই নাকি

তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য! বলুন, এখন কার কথাটা বিশ্বাস করবেন? কাকে বলবেন সত্যবাদী, আর কাকে বলবেন মিথ্যের রাজা? হবিবকে, আইয়ারকে, না ইসোদাকে? নাকি তিনজনকেই?

মাননীয় আদালত, এ তো সবে শুরু! ভেলকি-বাজির কিছুই তো এখনও আপনারা দেখে উঠতে পারেননি। এরপর যতই সামনে এগোবেন, দেখবেন, ততই ভেলকির মেলা; ততই যেন আজগুবি ঘটনার ধাক্কাধাক্কি—হৈ হট্টগোল! সেই হট্টগোলের মাঝখান থেকে আসল রহস্যকে খুঁজে বের করা সত্যিই খুব দুরূহ কাজ! সত্যিই তা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার! কিন্তু তারজন্য ঘাবড়ে গেলে তো চলবে না—যে ভাবেই হোক, এগিয়ে তো আমাদের যেতেই হবে। সুতরাং চলুন, সেই মহাজনের পথই অনুসরণ করি।

এখন পর্যন্ত আমরা যা জানতে পেরেছি তা হল, সাইগন বিমান-বন্দর থেকেই হাচাইয়া এবং ইসোদা চলে গেলেন দালাতে; আর নেতাজী তাঁর দলবলসহ গিয়ে উঠলেন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের গৃহ-নির্মাণ দপ্তরের সেক্রেটারি শ্রীনারায়ণ দাসের বাড়িতে। সেখানে থাকা-কালীন কি কি ঘটনা ঘটেছিল তার এক চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন আইয়ার তাঁর 'আনটু হিম এ উইট্নেস' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন:
'নারায়ণ দাসের বাড়িতে পৌঁছবার পরই নেতাজী জামা জুতো খুলে স্নান করতে গেলেন এবং স্নান সেরে এসেই শুয়ে পড়লেন বিছানায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে জড়িয়ে এল তাঁর চোখের পাতা। কাল সারারাত এক পলকের জন্যও ঘুমোতে পারেননি উনি; আজ যদি অন্ততঃ চার-পাঁচ ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘুমোতে পারেন তাহলেই কিছুটা আরাম পাবেন।

'কিন্তু যা হবার নয়, তা কখনোই হয় না। মাত্র আধ ঘণ্টাও হয়নি নেতাজী শুয়েছেন, এমন সময় একটা গাড়ি খুব দ্রুতবেগে ছুটে এসে থেমে গেল দরজার সামনে। তা থেকে নেমে এলেন

হিকারী কিকানের যোগাযোগরক্ষাকারী অফিসার ক্যাপ্টেন কিয়ানো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন: "অত্যন্ত জরুরী একটা খবর আছে, নেতাজীকে ডেকে দিন।"

'আমরা ওর কথায় রাজি হলাম না। হবিব বললেন: "নেতাজী এখনই শুয়েছেন। কি ব্যাপার আগে বলুন; না হলে তাঁকে ডেকে দেওয়া সম্ভব হবে না।"

'হবিবের কথা শুনে ক্যাপ্টেন কিয়ানো বললেন: "এখনই একটা বিমান এখান থেকে ছাড়বে। তাতে একটাই মাত্র আসন আছে। নেতাজী যদি তাতে যেতে রাজি থাকেন তবে তাঁকে এখনই আসতে হবে।"

'খুবই জরুরী সংবাদ। আমরা সকলেই চাইছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেতাজী যেন সায়গন ত্যাগ করে চলে যান। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে হল। হবিব তাঁকে ডেকে তুলে বললেন: "স্যার, জাপানীরা খবর পাঠিয়েছে, এখনই একটা বিমান এখান থেকে রওয়ানা দেবে। তাতে মাত্র একটাই আসন আছে। আপনি যদি চান…"

'হবিবকে থামিয়ে দিয়ে নেতাজী বললেন: "বিমানটা যাচ্ছে কোথায়?"

'হবিব কাঁচুমাচু হয়ে বললেন: "তা আমি ঠিক জানি না। তাছাড়া ক্যাপ্টেন কিয়ানোও বলছেন যে তিনিও তা জানেন না।'

'কথাটা শুনে নেতাজী বেশ বিরক্ত হলেন। বললেন: "তাহলে ক্যাপ্টেন কিয়ানোকে গিয়ে বল, যিনি জানেন যে বিমানটা কোথায় যাচ্ছে, তাঁকেই যেন উনি পাঠিয়ে দেন। কারণ, সেটা কোথায় যাচ্ছে তা না জেনে এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না।"

'নেতাজী যা যা বললেন, হবিব ফিরে এসে ক্যাপ্টেন কিয়ানোকে ঠিক সেই সেই কথাগুলোই বলে গেলেন হুবহু। সঙ্গে সঙ্গে কিয়ানো উঠে বসলেন গাড়িতে। যত জোরে গাড়িটা এসেছিল, মনে হল

তার থেকেও যেন দ্বিগুণ বেগে সেটা বেরিয়ে গেল ফটক ছেড়ে।

'বোধহয় আধ ঘণ্টাও কাটেনি; এরই মধ্যে আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। এবার গাড়ি থেকে নামলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির একজন প্রাচীন স্টাফ অফিসার। বারান্দা পার হয়ে তাঁরা সোজা চলে এলেন নেতাজীর ঘরের সামনে। দরজার কাছে এগিয়ে এসে নেতাজী ওঁদের অভিনন্দন জানালেন; প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

'তারপর শুরু হল আলোচনা। রুদ্ধদ্বারকক্ষে চলল গোপন শলা-পরামর্শ। সেখানে তখন নেতাজী, ইসোদা, হাচাইয়া এবং তেরাউচির সেই স্টাফ অফিসারটি ছাড়াও আরও একজন ভারতীয় ছিলেন—তিনি কর্ণেল হবিবুর রহমান। হবিবকে সঙ্গে নিয়েই নেতাজী তাঁর চূড়ান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন জাপানীদের সঙ্গে।

'কিছুক্ষণ পরেই নেতাজী এবং হবিব বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। জাপানীরা তখনও সেই ঘরের মধ্যেই বসে রয়েছে। আমরা বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম। নেতাজী আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "গুলজারা আর প্রীতম কোথায়?"

'বললাম: "পাশের ঘরেই আছেন।"

'নেতাজী বললেন: "এখনই ওদের ডাকুন; অত্যন্ত জরুরী একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

'সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের ডাকতে পাঠান হল। দেখলাম, নেতাজী বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ওই বারান্দাটুকুর মধ্যেই তিনি পায়চারী করা শুরু করে দিয়েছেন। তারপর দশ-সেকেণ্ড কাটতে না কাটতেই জিজ্ঞাসা করলেন: "কি, ওরা এল?"

'বললাম: "আসছেন স্যার, এখনই এসে পড়বেন।"

'আমার কথা শুনে নেতাজী রেগে উঠলেন। বেশ ঝাঁঝাল

কণ্ঠে বললেন : "ওদের গিয়ে বলুন, এখন সাজ-পোষাক করার সময় নয়। যে যেভাবে আছে সেভাবেই যেন চলে আসে। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের।"

'নেতাজীর কথা শেষ হতে না হতেই জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন গুলজারা আর প্রীতম। আমরা সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। ভেতরে থেকে এঁটে দেওয়া হল দরজার ছিটকিনি। নেতাজী মাঝখানে দাঁড়ালেন, আমরা ছ জন তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন : 'ওরা বলছেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে একটা প্লেন ছাড়ছে। তাতে একটাই মাত্র আসন খালি রয়েছে ; এবং সেটা ওরা আমাকেই দিতে চাইছেন। অর্থাৎ ওদের প্রস্তাব মেনে নিলে আমাকে একাই যেতে হবে ওদের সঙ্গে। এবার, এই পরিস্থিতিতে আপনারাই বলুন, আমি এ প্রস্তাব মেনে নেব, কি নেব না ?"

'মনে হল যেন রুদ্ধ-কক্ষে বজ্রপাত হল। মনে হল যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে। নেতাজীর কথা শুনে ছ ছটি প্রাণী নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আমাদের মধ্য থেকেই কে যেন বলে উঠলেন : "স্যার, ওদের কাছে আর একটা আসন অন্ততঃ চান। ওদের বলুন অন্ততঃ আর একটা আসন দিতে যাতে আমাদের মধ্যে কেউ আপনার সঙ্গে যেতে পারে। আমরা এই পরিস্থিতিতে কি করে আপনাকে একা ছেড়ে দেব !"

'নেতাজী বললেন : "আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা বলছেন, ওদের পক্ষে একটার বেশি আসন দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।"

'দেবনাথ বললেন : "তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখুন নেতাজী। মাত্র একটা অতিরিক্ত আসন ওদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না, এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

'নেতাজী দেবনাথের কথায় বাধা দিয়ে বললেন : "আমার প্রশ্ন তা নয়। আমি আমার সহজ সরল প্রশ্নটার সোজাসুজি জবাব চাইছি। অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে আমি একটা আসন নেব কি নেব না ?"

'আমরা চাইছিলাম না যে নেতাজী সায়গনে থাকুন ; কারণ, তাতে তাঁর বিপদের আশঙ্কা ছিল যথেষ্ট। যে কোন মুহূর্তে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সায়গনে এসে পৌঁছবার সম্ভাবনা ছিল। তাই বললাম : "স্যার, দয়া করে জাপানীদের আবার বলুন, আর অন্ততঃ একটা আসন দিতে। তবে শেষ পর্যন্ত ওরা যদি কিছুতেই তা দিতে না পারেন তাহলে আপনি একাই যাবেন। আর যাওয়ার আগে ওদের বলে যাবেন, আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আমরা যাতে যথাশীঘ্র গিয়ে পৌঁছতে পারি তার জন্য ওরা যেন বিমানের ব্যবস্থা করে দেন।"

'মুহূর্তের মধ্যে দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন নেতাজী ; পেছনে পেছনে গেলেন হবিব। জাপানীরা যে ঘরে অপেক্ষা করছিলেন, ওঁরা গিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে। তারপর কয়েক মিনিট কথাবার্তা চলল দু পক্ষে ; শেষে নেতাজী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বললেন : "আমরা আর একটা আসন পাচ্ছি। হবিব আমার সঙ্গে আসুক।"

'কোথায় যাচ্ছেন নেতাজী, প্লেনটার গন্তব্যস্থল কি, কিছুই জানতে চাইলাম না আমরা কেউ। কোন প্রশ্ন করলাম না তাঁকে, আর তিনিও সে সম্পর্কে বললেন না একটা কথাও। তবে আমরা জানতাম, এবং এ-ও জানতাম যে তিনি জানতেন আমরা জানি, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। আমরা জানতাম তিনি মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছেন এবং তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল দাইরেন।

'এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন : "আইয়ার, আপনি এবং গুলজারাও আমার সঙ্গে আসুন। যদিও আমি নিশ্চিত যে ওরা এই প্লেনে আর আমাদের জায়গা দিতে পারবে না, তবু

আর একবার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখি। যদি আরও ছুটো জায়গা পাওয়া যায় তবে আপনারাও আমার সঙ্গেই যাবেন। আর যদি তা না পাই তবে বিমানবন্দর থেকেই মালপত্র নিয়ে আবার ফিরে আসবেন।" '

মাননীয় আদালত, এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের আইয়ারের দেওয়া বর্ণনা শোনালাম। এবার শুনুন সেদিনকার সেই ঘটনা সম্পর্কে কর্ণেল হবিবুর রহমানের বক্তব্যটা কি। কর্ণেল রহমান উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের জেরার উত্তরে বলেছেন: 'বিকেল তিনটে নাগাদ হাচাইয়া এবং ইসোদা এসে নেতাজীকে খবর দিলেন যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণের ব্যাপারে মার্শাল তেরাউচি টোকিও থেকে তখন পর্যন্ত কোন নির্দেশ পাননি। সুতরাং তারপক্ষে সে সম্পর্কে কোন পরামর্শ দেওয়াও সম্ভব নয়। এই কথা যখন হচ্ছিল তখন সেখানে হাচাইয়া, ইসোদা ও নেতাজী ছাড়া আমি এবং আইয়ার উপস্থিত ছিলাম। জাপানী-দের কথা শোনার পর নেতাজী তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের টোকিওতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন বিমান পাওয়া যাবে কিনা, যাতে আমরা সেখানে বসেই আলাদা-ভাবে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এরপর নেতাজী গুলজারা, প্রীতম, হাসান, দেবনাথ, আইয়ার এবং আমার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন। আমরা সবাই মত দিলাম যে, হ্যাঁ, তা সম্ভব। কারণ সায়গন থেকে টোকিও পর্যন্ত এলাকা তখনও জাপানীদের দখলেই রয়েছে। তাই ঠিক হল, জাপানীরা যদি আমাদের জন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে গুলজারা, হাসান, আইয়ার এবং আমি নেতাজীর সঙ্গে টোকিওতে যাব।'

হে ন্যায়াধীশগণ, হবিবের বিবৃতি শুনে আপনারা কি বুঝলেন? আইয়ারের বিবরণের সঙ্গে হবিবের বিবরণের কি কোন পার্থক্য

আপনাদের চোখে পড়ছে ? এই দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা শুনে কি আপনাদের মনে হচ্ছে যে, এঁদের মধ্যে কেউ না কেউ মিথ্যে কথা বলছেন ? কিংবা, দুজনের কেউ-ই সত্যি কথা বলছেন না ?

কী চমৎকার ব্যাপার দেখুন ! আইয়ার বলছেন ঃ 'রুদ্ধদ্বারকক্ষে চলল গোপন শলা-পরামর্শ। সেখানে তখন নেতাজী, ইসোদা, হাচাইয়া এবং তেরাউচির সেই স্টাফ অফিসারটি ছাড়াও আরও একজন ভারতীয় ছিলেন—তিনি কর্ণেল হবিবুর রহমান।' অথচ কর্ণেল হবিবুর বলছেন যে, না, তা নয় ঃ 'এই কথা যখন হচ্ছিল তখন সেখানে হাচাইয়া, ইসোদা ও নেতাজী ছাড়াও আমি এবং আইয়ার উপস্থিত ছিলাম।' এবার বলুন, আমরা যারা মুর্খ, যারা সোজা কথা সোজাভাবে বুঝতে অভ্যস্ত তারা এ থেকে কি সিদ্ধান্তে আসব ? কার কথাকে বিশ্বাস করব ? কার বিবরণকে মানব তথ্যনিষ্ঠ বলে ?

আবার দেখুন, নেতাজী কোথায় যাচ্ছিলেন, সে সম্পর্কে দুই মহারথীর বক্তব্যে কী আকাশ-পাতাল তফাৎ ! হবিবুর বলছেন ঃ 'আমরা সবাই মত দিলাম যে, হ্যাঁ, তা সম্ভব। কারণ সায়গন থেকে টোকিও পর্যন্ত এলাকা তখনও জাপানীদের দখলেই রয়েছে। তাই ঠিক হল, জাপানীরা যদি আমাদের জন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে গুলজারা, হাসান, আইয়ার এবং আমি নেতাজীর সঙ্গে টোকিওতে যাব।' অথচ আইয়ার সাহেব, হবিব যার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনিও টোকিও যাত্রার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোকটি নিজে কিন্তু বলছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা ! তাঁর ভাষায় ঃ 'কোথায় যাচ্ছেন নেতাজী, প্লেনটার গন্তব্যস্থল কি, কিছুই জানতে চাইলাম না আমরা কেউ। কোন প্রশ্ন করলাম না তাঁকে, আর তিনিও সে সম্পর্কে বললেন না একটা কথাও। তবু আমরা জানতাম, এবং এও জানতাম যে তিনি জানতেন আমরা জানি, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। আমরা জানতাম তিনি মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছেন, এবং

তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল দাইরেন।' বলুন, এই পাগলের প্রলাপকে বিশ্বাস করার জন্য কি আমরা আমাদের মস্তক বন্ধক দেব? বলুন, এই হাস্যকর বিবৃতিগুলোকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নেবার জন্য কি আমরা নির্বুদ্ধিতা দেখাবার প্রতিযোগিতায় নামব?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এইসব কথাবার্তা শুনে আপনারা যে চাপা হাসি হাসছেন তা দেখেই আমি খুশি। আমি এই ভেবে অন্ততঃ আনন্দিত হচ্ছি যে, ওই সব প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে দাবিদার মানুষগুলোর বক্তব্য যে কী ঠুনকো, কী পরস্পর-বিরোধী সেটা অন্ততঃ আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তবুও বলি, মতলববাজ কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে, ঘটনা ঘটার তিরিশ বছর পরে এইসব বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা বিস্মৃতির ছোঁয়া তো লাগবেই। আমি তা জানি, এবং জানি বলেই ইচ্ছাকৃতভাবেই ইদানিংকার দেওয়া বিবৃতির উল্লেখ না করে ঘটনা ঘটে যাবার ঠিক অনতিবিলম্বে কর্ণেল হবিব এবং এস. এ. আইয়ার যে বিবরণ দিয়েছিলেন সেটাকেই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এখন আপনারাই বলুন, এতদিন পর হয়ত কারও স্মৃতিবিভ্রম ঘটা সম্ভব, কিন্তু উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের নভেম্বর মাসের মধ্যেই যে ওঁদের স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটে গিয়েছিল—একথা কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আমাদের কি এই আজব বক্তব্যকেও মেনে নিতে হবে যে, জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় নেতাজী যে আইয়ারকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আইয়ার নিজেই সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন? কিংবা এ-ও কি আমরা ধরে নেব যে, নেতাজী টোকিও যাচ্ছেন বলা সত্ত্বেও একমাত্র হবিবুর রহমান ছাড়া আর কেউই সে কথা শুনতে পাননি? কারণ, শাহনওয়াজ কমিটি অথবা খোসলা কমিটি—কোন কমিটির সামনেই সেদিন সায়গনে নেতাজীর বাংলোয় উপস্থিত থাকার দাবিদার ছ জন মানুষের মধ্যে একমাত্র হবিব ছাড়া আর কেউই একথা বলেননি যে, নেতাজী

তাঁদের বলেছিলেন, তিনি টোকিও যাচ্ছেন, এবং তাদেরকেও টোকিওতেই নিয়ে যাবেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, শাহনওয়াজ সাহেব কিন্তু আর সবার বক্তব্যকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে একমাত্র হবিবের বক্তব্যকেই আঁকড়ে ধরলেন! এবং গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে রায় দিলেন: 'সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নেতাজীর পক্ষে প্রথমেই টোকিও যাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।'

কারণ ছিল কি ছিল না সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে, নেতাজী এবং তাঁর সহকর্মীদের জন্য বিমানে অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইসোদা এবং হাচাইয়া সায়গন বিমান বন্দরে পৌঁছবার পরই যে দালাতে ছুটে গিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা কি দাঁড়াল সেটা একবার জেনে নেওয়া যাক। আপনারা জানেন জেনারেল ইসোদা খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছিলেন: 'আমি সায়গন বিমানবন্দরে নেমে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির স্টাফ অফিসার কর্ণেল টাডার কাছে শুনলাম যে নেতাজী এবং তাঁর ছ জন সহকর্মীকে নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে যে বিমান ছুটো এসেছে সে বিমানের কোনটাই সায়গন থেকে আর এগোতে পারবে না। নেতাজীকে এবার অন্য একটা বিমানে করে যাত্রা করতে হবে; এবং সে বিমানে শুধু নেতাজী ছাড়া অন্য কোন ভারতীয়ের জায়গা হবে না। খবরটা শুনে আমি বেশ বিচলিত হলাম, এবং নেতাজীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সব শুনে নেতাজী বললেন, তিনি তাঁর সহকর্মীদের ফেলে রেখে কোথাও যাবেন না; এবং আমাকে অনুরোধ করলেন, সেই ধরণের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। আমি কর্ণেল টাডাকে নেতাজীর বক্তব্য বললাম। কিন্তু কর্ণেল টাডা সোজাসুজি বললেন, তাঁর পক্ষে সে ধরণের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না—নেতাজীকে যেতে হলে জেনারেল সিদেই যে বিমানে যাচ্ছেন সেই বিমানে করেই যেতে হবে, এবং যেতে হবে একাই। কর্ণেল টাডার এই বক্তব্যে আমি

খুশি হতে পারলাম না। তাই ঠিক করলাম, নিজে গিয়েই দেখা করব ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে ; তাঁকে গিয়ে বুঝিয়ে বলব সব ব্যাপারটা। এবং সেই উদ্দেশ্যেই রওয়ানা দিলাম দালাতের পথে।'

দালাতে পৌঁছে কি কি ঘটল সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইসোদা বলেছেন: 'দালাতে সদরদপ্তরে গিয়ে কমাণ্ডার-ইন-চিফ ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে আমি দেখা করলাম যাতে নেতাজীর অনুরোধ রক্ষা করা যায় সেজন্য। ফিল্ড মার্শালের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আমার কথা হল এবং তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন যে নেতাজী তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীসভার অন্য তিনজন সদস্যকে নিয়ে যেতে পারবেন।'

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, কথাটা খেয়াল করুন: তেরাউচির সঙ্গে ইসোদার দেখা হল, এবং তেরাউচি অনুমতি দিলেন নেতাজীর সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য তিনজন সদস্যকে নিয়ে যাবার জন্য। এবার নিশ্চয়ই আপনারা জানতে চাইবেন, তাহলে ইসোদা কেন নেতাজীর বাংলোতে এসে বললেন যে, শুধুমাত্র একটা আসনই পাওয়া যাচ্ছে? এবং কেন তিনি অনেক পীড়াপীড়ির পর হবিবের জন্য আর একটা আসন দিতে সম্মত হলেন?

অবাক হবেন না, হে ন্যায়াধীশগণ, আগেই তো আমি আপনাদের বলেছি, একটার পর একটা ভেলকি-খেলা দেখার জন্য প্রস্তুত হোন। সেই ভেলকি খেলাই তো এখন চলেছে। না হলে একই দিনে, মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে একই লোক কিভাবে একেবারে বিপরীত-ধর্মী দুটো কথা বলেন? কিভাবে আগের 'হ্যাঁ' টাকে পরমুহূর্তেই সোজাসুজি 'না' বলে বসেন? কিভাবে 'দেখা করেছি' শব্দ দুটো আকস্মিকভাবে 'দেখা করিনি' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়? বলুন, ভেলকি ছাড়া এটা কি কখনও সম্ভব?

এই ইসোদার ব্যাপারটাই ধরুন না কেন! ভদ্রলোক প্রথমে বললেন, তাঁর সঙ্গে মার্শাল তেরাউচির দেখা হয়েছিল, এবং স্বয়ং

তেরাউচিই তাঁকে বলেছিলেন যে, নেতাজী তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য তিনজন সদস্যকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এক ঘণ্টা পরে সেই একই লোক, সেই একই কমিশনের সামনে বললেন: 'না, তেরাউচির সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।'

হাসবেন না, মাননীয় বিচারপতিগণ, এই সামান্য কথাটুকু শুনেই হেসে উঠবেন না। এরকম আরও শত শত হাস্যকর অসঙ্গতি আপনাদের সামনে উপস্থিত হবে। তাই, এই ছোট অসঙ্গতিটুকুর কথা শুনে এখনই যদি হেসে ওঠেন, তাহলে পরে যে হাসতে হাসতে আপনাদের দম বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সংযত হোন; আপাততঃ হাসি বন্ধ করার চেষ্টা করুন। শুনুন, জেনারেল ইসোদার বক্তব্যটা কি।

ইসোদা বলছেন: 'না, দালাতে মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। আমি দেখা করেছিলাম তাঁর স্টাফ অফিসার ইয়ানোর সঙ্গে।'

জেনারেল ইসোদার কথা শুনে খোসলা সাহেবের মত একজন ঝানু আই. সি. এস অফিসারেরও মাথা ঘুরে গেল। তিনিও তখন বলতে বাধ্য হলেন: 'মিস্টার ইসোদা, আপনি তো আজই এখানে বললেন যে আপনি দালাতে গিয়ে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এবং আপনার অনুরোধেই তেরাউচি নেতাজী এবং তাঁর মন্ত্রীদের জন্য আরও তিনটে অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আবার এখন আপনিই বলছেন যে, তেরাউচির সঙ্গে আপনার দেখাই হয়নি! এই বক্তব্য দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক?'

খোসলা সাহেবের কথা শুনে ইসোদা কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি বেশ সপ্রতিভভাবেই বললেন: 'না, তেরাউচির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, আমি তাঁর স্টাফ অফিসার ইয়ানোর সঙ্গেই

দেখা করেছিলাম। ইয়ানোই ছিলেন তখন তেরাউচির প্রধান সহকারী, এবং তাঁর মাধ্যমেই আমি তেরাউচির অভিমত জানতে পেরেছিলাম।'

খোসলা এবার জানতে চাইলেন: 'আপনি তো ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে দেখা করার জন্যই সাইগন থেকে দালাত পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন, তাই নয় কি?'

ইসোদা বললেন: 'হ্যাঁ, ঠিক তাই; ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি দালাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাতে সময় না থাকাতে তাঁর সঙ্গে আর দেখা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।'

শুনুন কথা! যার সঙ্গে দেখা করার জন্য অতদূর থেকে ছুটে যাওয়া, শেষ পর্যন্ত কিনা তাঁর সঙ্গেই সময়াভাবে দেখা করা সম্ভব হল না! এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? এই অদ্ভুত কথাটাকেও কি আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে? এমন মনগড়া বিচিত্র কাহিনীকেও কি আমরা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নেব?

এবার দেখুন, আরও কী বিচিত্র কাহিনী শোনাচ্ছেন জেনারেল ইসোদা। খোসলা যখন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে নেতাজীর জন্য বাড়তি আসনের অনুরোধ জানাতেই যে তিনি দালাত যাচ্ছেন সে কথা কি আগে থাকতেই দালাত সদর-দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল? তখন ইসোদা বললেন: 'হ্যাঁ, আমি সায়গন থেকেই দালাত ঘাঁটিতে খবর পাঠিয়েছিলাম যে, আমি দালাতে যাচ্ছি। এবং আমার খবর পেয়েই কর্ণেল ইয়ানো বিমানঘাঁটিতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে দেখা করে আমার কোন লাভ হবে না। কারণ, তাঁর হাতে তখন অতিরিক্ত কোন বিমান ছিল না।'

এরপর খোসলা সাহেব প্রশ্ন করেন: 'তাহলে আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ফোনে কিংবা অন্য কোনভাবে মার্শাল তেরাউচি কিংবা অন্য কোন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেননি?'

খোসলার প্রশ্নের উত্তরে ইসোদা স্পষ্ট ভাষায় বলেন : 'না।'

মাননীয় আদালত, আপনারা মনে রাখবেন, খোসলা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ইসোদা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, না, তাঁর সঙ্গে তেরাউচি কিংবা অন্য কোন জেনারেলের কোন কথাই হয়নি। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্ট কিন্তু ঠিক এর উলটো কথাটাই বলছে। সেই রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে এখনও একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে। : 'দালাত বিমানবন্দরে পৌঁছনর পর কর্ণেল ইয়ানো জেনারেল ইসোদাকে জানালেন যে, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে দেখা করে কোন লাভ হবে না ; তবে তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন বিমানবন্দরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য। কিছুক্ষণ পর সাউদার্ণ আর্মির চিফ অব স্টাফ জেনারেল নুমাতা জেনারেল ইসোদার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে তিনি বিষয়টা ফিল্ড মার্শালের নজরে এনেছেন এবং খুব শীঘ্রই একটা বিমানে নেতাজীর আসন ছাড়াও অন্য দু তিনটে আসনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বলুন, কোন্ কথাটা আমরা বিশ্বাস করব ? যে লোকটা একবার বলেছেন যে তাঁর সঙ্গে কোন জেনারেলের কোন কথাই হয়নি তাঁর কথা, নাকি যিনি বলছেন যে, জেনারেল নুমাতার সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছিল, তাঁর কথা ? যদি দুটো পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের বক্তা দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হতেন তা হলে না হয় ভোটের জোরে ঠিক করে ফেলা যেত যে, এদের মধ্যে একজন সত্যবাদী, অন্যজন মিথ্যুক। কিন্তু যেখানে দুটো বক্তব্যই একজনের মুখ থেকে বের হয়েছে, এবং যিনি দু বারই আদালতের সামনে শপথ নিয়েই বলেছেন যে, যা বলেছেন তা সত্যিই, তখন আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব যে কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা মিথ্যে ? কিভাবে বলব যে তাঁর সঙ্গে 'কোন জেনারেলের কথা হয়নি' ; কিংবা কিভাবে বলব যে, তার সঙ্গে 'জেনারেল নুমাতার কথা হয়েছিল ?' বলুন, এমন

ম্যাজিক কোন সাধারণ ম্যাজিসিয়ানের পক্ষে দেখান সম্ভব কি? বলুন, আপনাদের মধ্যে কেউ এমন ম্যাজিক দেখাতে পারবেন কি?

শুধু তাই নয়, আরও শুনুন, দালাত বিমানঘাঁটির ঘটনা সম্পর্কে মহামান্য ইসোদা আরও কী অদ্ভুত কথা বলেছেন। আপনারা শুনলেন, শাহনওয়াজ কমিটির সামনে তিনি বলেছেন, দালাত বিমানবন্দরে অপেক্ষা করাকালীন জেনারেল নুমাতা তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন; কিন্তু খোসলা কমিটির সামনে কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে সেই ইসোদাই একেবারে বিপরীত কথা বলে বসলেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য হল: 'দালাত বিমানবন্দরে নামার পরই জেনারেল নুমাতা এবং কর্ণেল ইয়ানো আমাকে জানালেন যে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে দেখা করে কোন লাভ হবে না; এবং তারপরই আমি সায়গনে ফিরে এলাম।'

মজাটা একবার দেখুন আপনারা! শাহনওয়াজ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় যে জেনারেল নুমাতাকে ইসোদা ফোনের ওপ্রান্তেই আটকে রেখেছিলেন, সেই নুমাতাকেই এবার তিনি এনে হাজির করলেন একেবারে বিমানবন্দরে। শুধু তাই নয়, দালাত বিমানবন্দরে নামার পরই কর্ণেল ইয়ানো এবং জেনারেল নুমাতার মুখ থেকে নিরাশার বাণী শুনেই উনি আবার চেপে বসলেন সেই ছোট্ট সামরিক বিমানটাতে। তারপর ভোঁ করে উড়ে এসে নামলেন সোজা সায়গনে।

এবার আসুন, সায়গন ফিরে এসে জেনারেল ইসোদা কী কী ম্যাজিক দেখালেন সে সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর করা যাক। জেনারেল ইসোদা সায়গন বিমানঘাঁটিতে ফিরে আসার পরবর্তী ঘটনাবলীর কথা বলতে গিয়ে খোসলা কমিশনের সামনে বলেছেন: 'সায়গনে ফিরে আসার পর কর্ণেল টাডা আমাকে জানালেন যে চারজন নয়, নেতাজী সহ মোট দু জন ওই বিমানে যেতে পারবেন। আমি তখন নেতাজীকে সে কথা বললাম। এবং আমার কথা শুনে

নেতাজী বললেন যে তা হলে তিনি যাবেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম: "যে-কোন মুহূর্তে সব বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং, সঙ্গে আর মাত্র একজনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও আপনার উচিত এখনই রওয়ানা দেওয়া।" এবং এ-ও বললাম: "রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়াটাই হবে যুক্তিযুক্ত।" তারপর তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিনিট দশেক ধরে আলোচনা করলেন, এবং আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

জেনারেল ইসোদার বক্তব্য থেকে দুটো জিনিসের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ, তিনি বলছেন, সায়গনে ফিরে আসার পর তিনি কর্ণেল টাডার কাছ থেকে জানলেন যে চারটে নয়, নেতাজীর জন্য বিমানে দুটো আসন পাওয়া যাবে। এবং নেতাজীকে তিনি সে কথা বলাতে নেতাজী প্রথমে সে ব্যবস্থা মেনে নিতে অরাজী হলেন; তারপর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে এসে বললেন যে, হ্যাঁ, তিনি রাজি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কথা অনুযায়ী রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য নেতাজী সেই ব্যবস্থাটাই মেনে নিলেন, এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মাননীয় বিচারপতিগণ, এই প্রসঙ্গে আমি আবার একবার শ্রী আইয়ারকে স্মরণ করছি। তাঁর লেখা আত্মজীবনী থেকে আমি আবার আপনাদের সেই বিশেষ লাইন কটা পড়ে শোনাচ্ছি, যেখানে তিনি বলেছেন: 'আমরা সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। ভেতর থেকে এঁটে দেওয়া হল দরজার ছিটকিনি। নেতাজী মাঝখানে দাঁড়ালেন; আমরা ছ জন তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের সবার মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন: "ওরা বলছেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে একটা প্লেন ছাড়ছে। তাতে একটাই মাত্র আসন খালি রয়েছে; এবং সেটা ওরা আমাকেই দিতে চাইছেন। অর্থাৎ ওদের প্রস্তাব মেনে নিলে

আমাকে একাই যেতে হবে ওদের সঙ্গে। এবার এই পরিস্থিতিতে আপনারাই বলুন, আমি এ প্রস্তাব মেনে নেব কি নেব না ?"

'মনে হল, যেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে বজ্রপাত হল। মনে হল, যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে। নেতাজীর কথা শুনে আমরা ছ ছটি প্রাণী নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আমাদের মধ্য থেকেই কে যেন বলে উঠল : "স্যার, ওদের কাছে অন্ততঃ আর একটা আসন চান। ওদের বলুন, অন্ততঃ আর একটা আসন দিতে যাতে আমাদের মধ্যে কেউ আপনার সঙ্গে যেতে পারে। আমরা এই পরিস্থিতিতে কী করে আপনাকে একা ছেড়ে দেব !

'নেতাজী বললেন : "আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা বলছে, ওদের পক্ষে একটার বেশি আসন দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।"

মাননীয় আদালত, আমার মনে হয় বর্তমান আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এতটা উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। এতটা উদ্ধৃতি থেকেই আপনারা সেদিনকার সেই নাটকীয় মুহূর্তটির একটা স্পষ্ট চিত্র কল্পনা করে নিতে পারবেন। আপনারা চোখ বুজে একবার চিন্তা করুন : হন্তদন্ত হয়ে নেতাজী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ছ জন সহকর্মীকে নিয়ে ঢুকলেন অন্য একটা ঘরে। তারপর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সেই চরম দুঃসংবাদ—জাপানীরা তাঁকে মাত্র একটাই আসন দিতে রাজি হয়েছে ; এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে একাই যাত্রা করতে হবে নিরুদ্দেশের পথে।

এবার ভাবুন, সেদিন সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনে অন্য ছ জন মানুষের মনের অবস্থা কী হয়েছিল ! তাঁরা মনে মনে কতটা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন ! ভবিষ্যত কল্পনা করে তাঁদের মনে কী ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল !

অথচ ইসোদা বলছেন, সায়গন বিমান বন্দরে নেমেই তিনি কর্নেল

টাডার কাছে শুনলেন যে চারটে নয়, মাত্র দুটো আসন পাওয়া যাবে নেতাজীর জন্য। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা গিয়ে জানালেন নেতাজীকে। কিন্তু নেতাজী প্রথমে এ ব্যবস্থায় রাজি হলেন না। শেষে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে এসে জানালেন যে, আপাততঃ তিনি এ প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন, তবে তাঁদের কথা দিতে হবে যে এর পরের বিমানেই তাঁর সহকর্মীদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

যদি তাই হয়, যদি আমরা ধরেই নিই যে জেনারেল ইসোদা সত্যি কথাই বলছেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে শ্রী আইয়ার মিথ্যে কথা বলছেন। কারণ, শ্রী আইয়ার বলছেন, নেতাজী জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, ওরা একটাই মাত্র আসন দিতে রাজি হয়েছে। অথচ ইসোদা বলছেন, তিনি দালাত থেকে সায়গন বিমান ঘাটিতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ণেল টাডার কাছে শুনলেন যে মোট দুটো আসন পাওয়া যাবে, এবং মুহূর্তমাত্র দেরি না করে খবরটা জানিয়ে দিলেন নেতাজীকে।

যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, তবে আমার প্রশ্ন, নেতাজী ঘরের বাইরে এসে তাঁর সহকর্মীদের কেন বললেন যে, বিমানে মাত্র একটাই আসন পাওয়া গেছে? এমনকি, আইয়ারের বিবরণ থেকে আমরা এ-ও দেখতে পাচ্ছি যে, ওঁদের মধ্যেই একজন যখন নেতাজীকে অনুরোধ জানালেন জাপানীদের আরও একটা আসনের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বলতে, তখন নেতাজী স্পষ্ট ভাষায়ই বললেন: 'আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা বলছে ওদের পক্ষে একটার বেশি আসন দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।'

মাননীয় আদালত, আপনারাই বলুন, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন মানুষের বক্তব্যের মধ্যে এমন চূড়ান্ত অসঙ্গতির কি ব্যাখ্যা হতে পারে? এই বিপরীতধর্মী বক্তব্য শুনে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে

আসতে পারি ?

আমার মতে, এই ঘটনার দুটোই ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ ইসোদা যা বলছেন সেটাই ঠিক। অর্থাৎ তিনি নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে দুটো আসন পাওয়ার কথাই বলেছিলেন। কিন্তু নেতাজী তাঁর সহকর্মীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বাইরে এসে বললেন যে, ওরা মাত্র একটা আসন দিতেই রাজি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি কি করবেন,—যাবেন না থাকবেন ? নেতাজীর এ কথা শুনে তাঁর সহকর্মীরা বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন ; এবং তাঁরা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, যাতে আর একটা আসন পাওয়া যায় তারজন্য। ফলে নেতাজীর পক্ষে এক ঢিলে দুটো পাখি মারা সম্ভব হল। প্রথমতঃ, তিনি তার সহকর্মীদের দাবি দুটো আসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলেন। দ্বিতীয়তঃ, হবিব ছাড়া আর কাউকে যাতে সঙ্গে নিয়ে যেতে না হয়, তার ব্যবস্থাও পাকা করে ফেললেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতের পরিকল্পিত দুর্ঘটনার জন্য একজন ভারতীয় প্রত্যক্ষ-দর্শী নির্বাচনের কাজটা অতি সহজেই সমাধা হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যেটা দেওয়া যেতে পারে, তা হল : আইয়ার যা বলছেন সেটাই ঠিক। ইসোদাই ক্যাপ্টেন কিয়ানোকে দিয়ে প্রথম খবর পাঠিয়েছিলেন যে বিমানে মাত্র একটাই আসন পাওয়া যাচ্ছে। এবং ক্যাপ্টেন কিয়ানো ফিরে আসার পর তিনি নিজে গিয়েও সেই একই কথা বলেছিলেন। এর কারণ, তিনি চাইছিলেন, নেতাজী যাতে খুব বেশি হলেও আর একটা আসনের বেশি না চান সে রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। না হলে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন মাত্র অতি বিশ্বস্ত ভারতীয় সাক্ষীকে তৈরি রাখার যে পরি-কল্পনাটা তাঁরা করেছিলেন তা যে কোন সময়ে ভেস্তে যেতে পারত। কেননা, অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই সবসময় বেশি থাকে। সেজন্য নেতাজী যাতে কিছুতেই একজনের বেশি ভারতীয়কে সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারেন প্রথম থেকেই তাঁরা সে

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা সে চেষ্টায় সাফল্যলাভও করেছিলেন।

হে মহামান্য বিচারপতিবৃন্দ, আমি আমার যৎসামান্য বুদ্ধি দিয়ে যে দুটো বিকল্প ব্যাখ্যা ভেবে পেয়েছি, সে দুটো ব্যাখ্যার কথাই আপনাদের বললাম। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন, এই ব্যাখ্যা দুটোর মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য? কিংবা কোনটাই গ্রহণযোগ্য কিনা?

যদি এই ব্যাখ্যা দুটোর কোনটাই আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হয়; যদি মনে করেন, এই দুটো ব্যাখ্যার কোনটাই তেমন জোরদার নয়, তাহলে আমি একথা বলতে বাধ্য হব যে, ইসোদা, হাচাইয়া, আইয়ার, হবিবুর, প্রীতম, গুলজারা, হাসান এবং দেবনাথ—এঁদের মধ্যে কেউ-ই সত্যি কথা বলছেন না। প্রত্যেকেই একটা তৈরি করা গল্পকে তোতাপাখির মত মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। এবং যেহেতু সেটা গল্প, যেহেতু সেটার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্কই নেই—সেহেতু, মুখস্থ করা সত্ত্বেও এক একজনের মুখ থেকে এক একবার এক এক রকম বুলি বের হচ্ছে; এক একজন এক এক বার এক এক রকম কাহিনী বলতে বাধ্য হচ্ছেন। বলুন, এছাড়া এই অসঙ্গতির আর কি ব্যাখ্যা করা চলে? বলুন, এই পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যকে আর কিভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি?

শুধু কি তাই? শাহনওয়াজ কমিটির সামনে দেওয়া কর্ণেল প্রীতম সিং-এর সাক্ষ্য থেকে আমরা তো স্পষ্টই জানতে পারছি যে, নেতাজী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সহকর্মীদের কাছে বলেছিলেন যে, জাপানীরা নাকি তাঁকে একলা নিয়ে যেতেই বেশি উৎসুক, এবং সে কথাই তাঁরা তাঁকে বলেছে। যদি তাই হয়, যদি প্রীতম সিং-এর কথাই সত্যি হয়, তাহলে কি আমরা এ ধরণের একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, বিমান দুর্ঘটনার পরিকল্পনাটা আগেই তৈরি

হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই পরিকল্পনার কথা যাতে বাইরে জানা-জানি হয়ে না যায়, যাতে নেতাজীর অন্তর্ধানের পর কারও মুখ ফস্‌কে একথা বের হয়ে না পড়ে যে, বিমান দুর্ঘটনাটা আসলে হয়ইনি,—সে কারণেই প্রথম থেকেই জাপানীরা সতর্কতা অবলম্বন করতে চাইছিল ? সে কারণেই তাঁরা সবার কাছ থেকে নেতাজীকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল ? বলুন, এ ধরণের একটা অনুমান করাটা কি খুবই অন্যায় হবে ? বলুন, এমন একটা সিদ্ধান্তে আসাটা কি নিতান্তই বোকামি বলে মনে হবে ?

আরও একটা কথা আপনাদের বলি। খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় খোসলা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ইসোদা বলেছেন যে সায়গন থেকে দালাত যাত্রাকালীন তাঁর বিমানের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট নেউই। অথচ দেখুন, ওই একই কমিটির সামনে আইয়ার তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন : 'আমি জানতে পারলাম যে জেনারেল ইসোদা এবং হাচাইয়া বিমানে দালাত যাচ্ছেন ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী আলোচনা করতে।'

শুধু আইয়ারই নন, শাহনওয়াজ কমিটির সামনে কর্ণেল প্রীতম সিং‌ও স্বীকার করেছেন যে, সায়গন বিমানঘাঁটিতে আলোচনার পর লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা এবং হাচাইয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচির সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে বিমানে দালাতের পথে রওয়ানা দিলেন। এবার বলুন, এই ছোট্ট ঘটনাটুকু সম্পর্কে আপনারা কি বলবেন? কাকে সত্যবাদী বলে প্রশংসাপত্র দেবেন ? কাকে বলবেন মিথ্যেবাদী ?

মাননীয় আদালত, বিমানে আসন পাওয়ার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হল ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক অদ্ভুত কাহিনীও আমরা জানতে পারলাম। এবার আসুন, আসনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সলা হয়ে যাবার পর কি কি ঘটনা ঘটল সেদিকে একটু নজর দিই।

এই প্রসঙ্গে শ্রী আইয়ারের লেখা আত্মজীবনীর পাতাটা আর একবার উলটে দেখা যাক। শ্রী আইয়ার পরবর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন: 'নেতাজী আমাকে এবং গুলজারাকে ব্যাগ নিয়ে ওঁর সঙ্গে বিমানবন্দর পর্যন্ত যেতে বললেন, যদি শেষ পর্যন্ত আর একটা আসন পাওয়া যায়।

'আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করলাম না। আমরা তৈরি হয়েই ছিলাম। যে যার মালপত্র নিয়ে উঠলাম গিয়ে গাড়িতে। দুটো গাড়ি রওনা দিল বিমানবন্দরের দিকে। প্রথমটাতে ছিলেন নেতাজী, হবিব আর আমি; দ্বিতীয়টাতে ছিলেন গুলজারা, প্রীতম, আবিদ আর দেবনাথ। আমাদের গাড়িটা যখন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছল তখন পেছনের গাড়িটার কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। এভাবেই কেটে গেল প্রায় কুড়ি মিনিট, কিন্তু তবুও দ্বিতীয় গাড়িটা আর এসে পৌঁছয়ই না। আমরা সবাই বেশ অধৈর্য হয়ে পড়ি। ওদিকে বিমানের প্রপেলারটা ঘুরে চলেছে ঘণ্টাখানেক ধরে। শুনলাম, জাপানী সেনাপতি সিদেই-ও ওই বিমানেই যাচ্ছেন। তিনি প্রায় দু ঘণ্টা ধরে বিমানের ভেতর বসে অপেক্ষা করছেন নেতাজীর জন্য। কিন্তু গাড়িটা এসে না পৌঁছনতে ক্রমাগত দেরি হয়ে যাচ্ছে। শেষে জাপানীরা বললেন, আর দেরি করা উচিত হবে না; নেতাজী ওই মালগুলো ফেলে রেখেই রওয়ানা দিন। কিন্তু নেতাজী ওদের কথায় রাজি হলেন না। বললেন: "না, তা সম্ভব নয়। ওই গাড়িতে আমার অনেক জরুরী কাগজপত্র রয়ে গেছে; সেগুলো না নিয়ে আমি কিছুতেই যাব না।"

'অবশেষে দ্বিতীয় গাড়িখানা এসে পৌঁছল। জানা গেল, তাতে কিছু যান্ত্রিক গোলোযোগ ঘটার ফলেই এই দেরি।'

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় গাড়িটাতে কী এমন জরুরী কাগজপত্র ছিল যা ফেলে নেতাজী যেতে পারছিলেন না? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে খোসলা কমিটির সামনে দেওয়া আইয়ারের বিবৃতির

সাহায্য গ্রহণ করাই আমার মনে হয় সঙ্গত হবে। খোসলা সাহেব যখন আইয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই গাড়িতে করে নেতাজীর কি কি মাল আসছিল, তখন আইয়ার বলেন: 'তাতে কয়েকটা সুটকেস আসছিল। গাড়ি এসে পৌঁছবার পর তা থেকে সুটকেস-গুলো নামিয়ে বিমানে ওঠান হল। নেতাজী দ্রুত বিমানের দিকে এগিয়ে গেলেন; জেনারেল সিদেইর সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং ইসোদা ও হাচাইয়াকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন: "জয়হিন্দ।" তিনি আমার দিকে কিছুটা এগিয়ে এলেন, তারপর বললেন: "আইয়ার, চলি, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে; জয়হিন্দ।" এরপর দ্রুত পদক্ষেপে বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কর্ণেল হবিবও আমাদের সবাইকে "জয়হিন্দ" বলে বিদায় অভিনন্দন জানালেন এবং নেতাজীর সঙ্গেই বিমানের ভেতর চলে গেলেন। বিকেল সওয়া পাঁচটা নাগাদ বিমান সায়গন বিমানবন্দর ছেড়ে যাত্রা করল।'

বাংলো থেকে বের হয়ে নেতাজীর বিমান সায়গন বিমানঘাঁটি ত্যাগ করা পর্যন্ত কি কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে এই হল আইয়ারের বর্ণনা। এবার শুনুন সেই ঘটনাবলীর বিষয়ে জেনারেল ইসোদা কি বলেছেন। জেনারেল ইসোদা খোসলাকে বলেছেন: 'আমি নেতাজীকে বললাম: "আপনি তাড়াতাড়ি জেনারেল সিদেইর সঙ্গে চলে যান। তিনি রাজি হলেন; কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তাঁর মালপত্র নিয়ে। তিনি সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম: "আপনি চিন্তা করবেন না; জেনারেল সিদেই আপনার মালপত্রের ব্যবস্থা পরে করে দেবেন।" তিনি তখন তাঁর মালপত্রের এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে যেতে রাজি হলেন এবং বাকি দুই তৃতীয়াংশ সঙ্গে নিলেন। সেগুলো বিমানে তোলা হল। তখন নেতাজীর মন্ত্রীসভার সেক্রেটারি, সম্ভবতঃ আবিদ হাসান

বললেন যে, তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া আর একটা বিশেষ উপহার আছে এবং সেটা আসছে। তাই, বিমান ছাড়তে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হয়ে গেল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওঁরা যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে গেলেন কর্ণেল হবিবুর রহমান। তারও সাথে বেশ কিছু মালপত্র ছিল।'

আইয়ারের বক্তব্যের পর জেনারেল ইসোদার কথা আপনারা শুনলেন। এবার শুনুন কর্ণেল হবিবুর রহমানের বিবরণ। হবিব শাহনওয়াজ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছিলেন: 'নেতাজী অন্য সবাইকে বললেন মালপত্র নিয়ে বিমানঘাঁটিতে আসবার জন্য। কারণ, শেষ পর্যন্ত যদি আরও আসন পাওয়া যায়, তাহলে ওঁরাও আমাদের সঙ্গেই যাবেন। কিন্তু তা আর পাওয়া গেল না।' এরপর মালপত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে হবিব বলেছেন: 'নেতাজীর সঙ্গে ঠিক কটা মাল ছিল, তা আমার মনে নেই। তবে আমার হাতে ছিল একটা ছোট স্যুটকেস। আমি যতদূর মনে করতে পারছি, তা থেকে বলতে পারি নেতাজীর সঙ্গে একটা বড় স্যুটকেস এবং দুটো ছোট স্যুটকেস ছিল। সায়গন বিমানঘাঁটিতে আবিদ হাসান আমাকে বলেছিলেন যে, বড় স্যুটকেসটায় জামা-কাপড় ছিল, আর ছোট স্যুটকেস দুটোতে ছিল সোনার গহনা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র। আমাদের খুব দ্রুত বিমানে উঠতে হয়েছিল, কারণ, জাপানীরা বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা ধরে বিমানের এঞ্জিন চলছিল। আমরা বিমানে ওঠার আগেই জেনারেল সিদেই বিমানের দরজা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।'

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমি আপনাদের এই যে বর্ণনাটুকু শোনালাম, এটা যথেষ্ট সংক্ষেপিত বর্ণনা। আপাততঃ আমরা যে-বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি, তারজন্য এই বর্ণনাটুকুই যথেষ্ট হবে বলে আমি আর অন্য বক্তব্যগুলোকে এই মুহূর্তেই আপনাদের সামনে হাজির করলাম না। প্রয়োজনবোধে পরে সে সব কাহিনী

বলা যাবে।

তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দেওয়া তিনটে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনারা শুনলেন। এবার আসুন, সেই বিবরণগুলোকে একবার যাচাই করে নেওয়া যাক। প্রথম কথা : আইয়ার বলছেন, নেতাজী নাকি একমাত্র তাঁকে এবং গুলজারাকেই বলেছিলেন মালপত্র নিয়ে বিমানঘাঁটিতে আসবার জন্য। কারণ, যদি আরও আসন পাওয়া যেত, তাহলে ওঁরাও নেতাজীর সঙ্গেই যেতেন। কিন্তু হবিব বলছেন ঠিক উলটো কথা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নেতাজী সবাইকেই বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে বিমানবন্দর পর্যন্ত আসবার জন্য। এবং আইয়ারের বিবরণ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, হবিব, আইয়ার, গুলজারা ছাড়াও প্রীতম, হাসান এবং দেবনাথও নেতাজীর সঙ্গেই বিমানবন্দর পর্যন্ত এসেছিলেন। তাহলে এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, আইয়ার তাঁর আত্মজীবনীতে অন্য কথা লিখলেন কেন? কেন তিনি বললেন যে নেতাজী কেবলমাত্র দুজনকেই বিমানঘাঁটি পর্যন্ত যেতে বলেছিলেন? অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পাঁচজনই সেদিন বিমানঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কেন একই লোকের বক্তব্যের মধ্যে এমন অসঙ্গতি?

দ্বিতীয় কথা : কোন গাড়িতে কে ছিলেন সে সম্পর্কে আইয়ার বলছেন, প্রথম গাড়িটায় ছিলেন তিনি, নেতাজী এবং হবিব ; আর দ্বিতীয় গাড়িটায় ছিলেন গুলজারা, প্রীতম, আবিদ আর দেবনাথ। শ্রী আইয়ার তাঁর জবানবন্দীতে এও বলেছেন যে, প্রথম গাড়িটা এসে পৌঁছবার প্রায় আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় গাড়িটা এসে পৌঁছল। সেট থেকে সুটকেসগুলো নামিয়ে বিমানে ওঠান হল। তারপর নেতাজী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বিমানে উঠলেন এবং বিদায় অভিনন্দন জানাবার পর বিমান ছেড়ে দিল। অথচ দেখুন, বিমান ছাড়তে দেরি হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইসোদা বলছেন : "মালপত্র বিমানে তোলা হল তারপর নেতাজীর মন্ত্রীসভার সেক্রেটারি, সম্ভবতঃ আবিদ হাসান

বললেন যে, তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া একটা বিশেষ উপহার আছে এবং সেটা আসছে। তাই বিমান ছাড়তে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হয়ে গেল।' আবার রহমানের বক্তব্য হচ্ছে, বিমানঘাঁটিতে আবিদ হাসান তাঁকে বলেছিলেন, বড় সুটকেসটায় নেতাজীর জামা-কাপড় ছিল এবং অন্য ছুটো সুটকেসে সোনার গহনা ও কাগজপত্র ছিল। সেই তিনটে সুটকেস বিমানে তোলার পরই বিমান তার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করে। এবার বলুন, এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টাকে বিশ্বাস করব? আইয়ার বলছেন, দ্বিতীয় গাড়িটা আসতে দেরি হওয়ার জন্যই বিমান ছাড়তে দেরি হচ্ছিল। কারণ, তাতে খুব জরুরী কাগজপত্র ছিল। কিন্তু ইসোদা বলছেন, মালপত্র তোলার পরও আবিদ হাসান বলেছিলেন যে একটা জরুরী উপহার আসছে, এবং সে কারণেই বিমান ছাড়তে দেরি হয়ে গেল। এখন যদি ধরে নেওয়া যায়, হবিব কথিত ছু বাক্স সোনার গহনার কথাই আবিদ বলেছিলেন, তাহলে আগে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে নেতাজী নিজের সঙ্গে যে মালপত্র নিয়ে এসেছিলেন সেটা বিমানে তোলার পরই তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন দ্বিতীয় গাড়ির মালপত্রের জন্য। যদি তাই হয় তাহলে যে আর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, আইয়ারের বর্ণনা অনুযায়ী আবিদ হাসান তো ছিলেন সেই গাড়িটায় যেটা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মাঝপথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং মেরামতির পর প্রায় আধঘণ্টা দেরিতে এসে পৌঁছেছিল বিমানবন্দরে। এবং আইয়ার ও হবিবের বক্তব্য মেনে নিলে, ওই গাড়িটা এসে পৌঁছবার পরই মালপত্র বিমানে তোলা হয়েছিল এবং তারপরই নেতাজীকে নিয়ে বিমান আকাশে উড়েছিল। সুতরাং এই সব পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে থেকে আমরা কার কথাটাকে সত্য বলে মেনে নেব? কোন্‌টাকে ঘটনা এবং কোন্‌টাকে রটনা কিংবা কল্পনা বলে ধরব?

তৃতীয় কথা : ইসোদা বলেছেন, তিনি নেতাজীকে বলে-

ছিলেন : 'আপনি চিন্তা করবেন না ; জেনারেল সিদেই আপনার মালপত্রের ব্যবস্থা পরে করে দেবেন।' কথাটা খুবই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পরে বলতে কত পরে ? কবে ?

মাননীয় আদালত, জেনারেল সিদেই সম্পর্কে এবার আমাকে দু একটা কথা বলতে দিন। যুদ্ধের সময় জেনারেল সিদেই ছিলেন বর্মা রনাঙ্গণের চিফ অব জেনারেল স্টাফ। শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে দেওয়া নিগেশীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, 'তিনি ছিলেন রাশিয়ার ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাপানের তরফে মূল খুঁটি। তাছাড়া রুশ এবং জার্মান ভাষার ওপরও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল।' বলা হয়েছে, জাপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে মাঞ্চুরিয়ায় জাপ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন এবং সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্যই তিনি সতেরই অগস্ট বিমানে করে দাইরেন যাচ্ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার, জাপান সরকার পনেরই অগস্ট সরকারীভাবে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এবং যদিও রাশিয়ার সঙ্গে তখনও তাদের যুদ্ধ-বিরতি ঘটেনি, তবে আশা করা হচ্ছিল যে, যে-কোন মুহূর্তে তা ঘটতে পারে।

সুতরাং আসুন, এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদার বক্তব্যের বিশ্লেষণ করে দেখি। জেনারেল ইসোদা বলছেন, তিনি নেতাজীকে বলেছিলেন, মালপত্রের ব্যাপারে তাঁকে চিন্তা করতে হবে না ; জেনারেল সিদেই পরে তাঁর মালপত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ কথার অর্থ কি ? একটু আগে জেনারেল ইসোদা নিজেই তো নেতাজীকে বলেছিলেন যে, 'যে-কোন মুহূর্তে সব বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সঙ্গে আর মাত্র একজনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও আপনার উচিত এখনই রওয়ানা দেওয়া।' যদি তাই হয়, তবে জেনারেল সিদেই পরে কিভাবে নেতাজীর মালপত্র নেতাজীর কাছে পৌঁছে দিতেন ? ইঙ্গ-মার্কিন

বাহিনী সমস্ত এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে নেওয়ার পর সেটা কিভাবে সম্ভব হত ?

এই প্রশ্নের উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই নেতাজীর মাল নেতাজীকে পৌঁছে দেওয়া হত, তাহলে তার উত্তরে বলতে বাধ্য হব, সে ব্যবস্থাটা সম্ভব হত তখনই, যখন কিনা নেতাজীও তাদের হাতে বন্দী হতেন এবং তাদের দখলীকৃত এলাকার মধ্যেই থাকতেন। কিন্তু বাস্তবে তো ব্যাপারটা তা ঘটছিল না। জেনারেল ইসোদা তো নিজেই বলেছেন যে, আমি নেতাজীকে বললাম: 'রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়াটাই হবে যুক্তি-যুক্ত।' তাহলে ? তাহলে কিভাবে একথা মেনে নেব যে, নেতাজী ইঙ্গ-মার্কিনদের দখলীকৃত এলাকার মধ্যেই থাকবেন ধরে নিয়ে ইসোদা তাঁকে বলেছিলেন, জেনারেল সিদেই পরে তাঁর মালপত্রের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন ? কি করে ভাবব যে, নেতাজী রাশিয়ায় চলে যাচ্ছেন জানার পরও ইসোদা ভেবেছিলেন যে তাঁর মালপত্র পরে পৌঁছে দেওয়া যাবে ? বলুন, এমন উদ্ভট কথা ভাবা কি সম্ভব ? বলুন, এমন বিচিত্র চিন্তা কি কারও মাথায় আসে ?

অন্য প্রসঙ্গে আসার আগে আমি শেষবারের মত নেতাজীর চূড়ান্ত লক্ষ্যপথ সম্পর্কে আর একবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিতে চাই। সায়গন বিমান বন্দর থেকে যাত্রার মুহূর্তে নেতাজীর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কার কি ধারণা ছিল, কে কি জানতেন সে সম্পর্কে আসুন, আর একবার তদন্ত করে দেখা যাক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখি, নেতাজীর একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী কর্ণেল হবিবুর রহমান কি বলছেন। কর্ণেল রহমান উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারদের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন: 'আমি যতটা জানি, নেতাজীর উদ্দেশ্য ছিল টোকিওতে আই. এন. এর আলাদাভাবে

আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনা সেরেই আবার সিঙ্গাপুরে ফিরে আসা।' একথা শুনে যে-কেউই বলতে পারে, হবিব ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবেই মিথ্যে কথা বলেছিলেন ; কারণ, তখন সেটাই ছিল স্বাভাবিক : শত্রু পক্ষের কাছে কেউ-ই কখনও সত্য কথা বলে না।

আমি এ যুক্তি নিশ্চয়ই মেনে নেব, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে বিনীতভাবে এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হব যে, শাহনওয়াজ কমিটিকেও কি আপনারা শত্রুপক্ষ বলে মনে করেন ? যদি তা না হয়, তবে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন উঠবে, হবিব সেখানেও কেন সেই এক-ই কথা বললেন যে, 'ইসোদা এবং হাচাইয়া নেতাজীর টোকিও যাওয়ার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তাঁরা বারবার বহু অসুবিধের কথা বলছিলেন ; তারমধ্যে যানবাহনের অসুবিধেই ছিল প্রধান।' অর্থাৎ এবারও হবিবের বক্তব্য হচ্ছে, নেতাজী টোকিওতেই যাচ্ছিলেন, রাশিয়ায় নয়।

ভাল কথা। এবার শুনুন, আইয়ারের বর্ণনা। আইয়ার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'আমরা জানতাম, এবং এ-ও জানতাম যে তিনি জানতেন আমরা জানি, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। আমরা জানতাম তিনি মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছেন ; তাঁর লক্ষ্যস্থল দাইরেন।' উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ কমিটি এবং একাত্তর সালে খোসলা কমিটির সামনেও শ্রী আইয়ার ওই একই বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর কথায় : 'যদিও তিনি আমাদের বললেন না যে তাঁর গন্তব্যস্থল কোথায়, এবং যদিও আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন, তবে আমরা জানতাম, ওই বিমান মাঞ্চুরিয়াতেই যাচ্ছে। কারণ, সেটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।'

এ গেল আইয়ারের বক্তব্য। এবার শুনুন জেনারেল ইসোদা সে ব্যাপারে কি বলছেন। কিছুক্ষণ আগেই, খোসলা কমিটির সামনে দেওয়া জেনারেল ইসোদার যে বিবৃতিটার কথা আপনাদের

শুনিয়েছি তা থেকেই কিছুটা অংশ আবার শোনাচ্ছি। জেনারেল ইসোদা বলেছেন : 'আমি নেতাজীকে বললাম : "যে কোন মুহূর্তে সব বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সঙ্গে আর মাত্র একজনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও আপনার উচিত এখনই রওয়ানা দেওয়া।" এবং এ-ও বললাম : "রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়াটাই হবে যুক্তিযুক্ত।" তারপর তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিনিট দশেক ধরে আলোচনা করলেন, এবং আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।'

তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? ইসোদার প্রস্তাব মেনে নিয়ে নেতাজী একজন সঙ্গীসহ রাশিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন, তাই নয় কি?

এবার শুনুন সাউদার্ণ আর্মির স্টাফ অফিসার কর্ণেল ইয়ানোর বক্তব্য। শাহনওয়াজ কমিটির সামনে কর্ণেল ইয়ানো বলেছেন : 'ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেতাজীর টোকিওতে পৌঁছন প্রয়োজন। এবং যেহেতু বিমানে জায়গা কম ছিল, সেহেতু তিনি ঠিক করেছিলেন যে ওই বিমানে নেতাজী একাই যাবেন।' অর্থাৎ ইয়ানোর বক্তব্য অনুযায়ী নেতাজী রাশিয়ায় নয়, জাপানেই যাচ্ছিলেন।

ইয়ানোর কথা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে বলতেই হয়, নেতাজী জাপানেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু গোলমাল বেঁধেছে হাচাইয়ার বিবৃতি নিয়ে। খোসলা কমিটির সামনে হাচাইয়া বলেছেন : 'নেতাজী বললেন, তিনি জাপান যেতে চান। আমার মনে হয়, তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, তিনি মাঞ্চুরিয়ায় যাবেন; কিন্তু আমাদের বললেন, তিনি জাপান যেতে চান।'

এর কারণ কি? তিনি যদি মাঞ্চুরিয়ায়ই যেতে চাইবেন, তবে একজন জাপানী মন্ত্রীকে কেন বলবেন যে, আমি জাপানে যাব? এ রহস্যের অর্থ কি? তাছাড়া নেতাজী যদি হাচাইয়াকে বলেই

থাকেন যে তিনি জাপানে যেতে চান, তাহলে হাচাইয়ার কেন মনে হল যে, জাপান নয়, নেতাজী মাঞ্চুরিয়ায় যেতে চাইছেন ? এই মনে হওয়ার পেছনের কারণটা কি ? নেতাজীর কথার মধ্যে তিনি এমন কি সূত্র পেলেন যার জন্য তাঁর ও কথা মনে হল ?

এবার আসুন, শ্রী দেবনাথ দাসের বক্তব্যটা শুনি। শ্রী দাস উনিশ শ সত্তর সালে এক বিবৃতিতে বলেছেন : 'সাইগন ত্যাগ সম্পর্কে জাপানীরা একেবারে শেষ পর্যায়ে তাদের পরিকল্পনাকে বদলে ফেলেছিল। তারা নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়ার পরিবর্তে জাপানে নিয়ে যেতে চায়। জাপানীদের এ প্রস্তাবে নেতাজী মোটেই খুশি হতে পারেননি। তিনি সেকথা আমাকে বলেছিলেন।'

হে মাননীয় বিচারপতিগণ, আপনারা একবার ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখুন, প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবিদার মানুষগুলো প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কেন এমন পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন ? কেন তাঁদের কারও বক্তব্যেই কোন যোগসূত্র থাকছে না ? কেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাবি করেও বলতে পারছেন না যে, আসলে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল ! হবিব বলছেন, টোকিও যাচ্ছিলাম এবং ঠিক ছিল ফিরে আসব। আইয়ার বলছেন, টোকিও যাচ্ছিলেন না, যাচ্ছিলেন মাঞ্চুরিয়ায় এবং ঠিক ছিল ফিরে আসবেন না। ইসোদা বলছেন, ফিরবেন না ঠিক করেই যাত্রা করেছিলেন রাশিয়ার পথে। ইয়ানো বলছেন, রাশিয়ায় নয়, যাচ্ছিলেন টোকিওতে। হাচাইয়া বলছেন, টোকিও নয়, যাচ্ছিলেন মাঞ্চুরিয়াতে। আর দেবনাথ দাস বলছেন, মাঞ্চুরিয়া নয়, যাচ্ছিলেন জাপানে। এবার আপনারাই বলুন, আসলে নেতাজী যাচ্ছিলেন কোথায় ? কোনটা ছিল তাঁর আসল গন্তব্যস্থল ?

মালপত্রের ব্যাপারেও দেখুন, প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া বর্ণনার মধ্যে কী আসমান্ জমিন ফারাক। হবিব বলছেন : 'আবিদ হাসান

নেতাজীর মালপত্র বিমানে তুলে দিলেন। তাতে ছুটো বড় সুটকেস এবং ছুটো বড় এটাচিকেস ছিল।' এ বর্ণনাটা তিনি দিয়েছিলেন উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে উনি তখন বলেছিলেন : 'সুটকেস এবং এটাচিকেসের মধ্যে কি ছিল তা আমি জানতাম না। কোন রকম সোনাদানা যে উনি নিয়ে যাচ্ছিলেন তা-ও আমার কাছে ছিল আজানা।'

ভাল কথা ; শত্রুপক্ষের কাছে সত্য কথা বলাটা কখনই উচিত নয়। সেদিক থেকে দেখলে হবিব ওদের কাছে সত্য কথাটা না বলে ভালই করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ কমিটির সামনে উনি যা বলেছিলেন, অন্ততঃ সেটা সত্য কথা ছিল তো ? নাকি তার মধ্যেও কিছুটা মিথ্যের ভেজাল মিশিয়ে দিয়েছিলেন হবিব সাহেব ?

শাহনওয়াজ কমিটির সামনে মালপত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে উনি বলেছেন : 'নেতাজীর সঙ্গে ঠিক কটা মাল ছিল সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে নেতাজীর সঙ্গে ছিল একটা বড় সুটকেস আর ছুটো ছোট সুটকেস।' অর্থাৎ আগের বারের ছুটো সুটকেসের মধ্য থেকে একটা সুটকেশ বেমালুম নিরুদ্দেশ !

যাই হোক, সুটকেসের মধ্যে কি ছিল সে সম্পর্কে হবিব কি বলছেন শুনুন। তাঁর বক্তব্য : 'আবিদ হাসান বিমানঘাটিতে আমাকে বলেছিলেন যে, বড় সুটকেসটার মধ্যে নেতাজীর জামা-কাপড় ছিল এবং ছোট সুটকেস ছুটো পূর্ণ ছিল সোনার গহনায়।'

মাননীয় আদালত, লক্ষ্য করুন, হবিব বলছেন, আবিদ হাসান বলাতেই নাকি তিনি জানতে পেরেছিলেন যে বড় সুটকেসটায় জামা-কাপড় ছিল, আর অন্য ছুটোয় ছিল সোনাদানা। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার কি দেখুন, শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, তথাকথিত ছুর্ঘটনায় পতিত বিমানের প্রধান চালক মেজর

তাকিজাওয়া নাকি বিমানে অত ভারী ভারী মাল ওঠাবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন, এবং তাঁর কথা মতই নেতাজী নিজেই তাঁর স্যুটকেস থেকে জামাকাপড় এবং বইপত্র বার করে দেন।'

এবার বলুন, এদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করব? হবিবকে, নাকি শাহনওয়াজকে? কারণ, শাহনওয়াজ বলছেন, তাকিজাওয়া আপত্তি করাতেই নাকি নেতাজী নিজেই জামা-কাপড় এবং বইপত্র স্যুটকেস থেকে বের করে দেন। অথচ হবিব কিনা সেখানে বলছেন যে, হাসানের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন, একটা স্যুটকেসে নেতাজীর জামা-কাপড় ছিল। শাহনওয়াজের বক্তব্য অনুযায়ী বিমানবন্দরে সবার সামনে নেতাজী স্যুটকেস থেকে জামা-কাপড় বের করে ফেলা সত্ত্বেও বেচারা হবিব তা দেখতে পেলেন না! জামা-কাপড়ের খবরটা তাঁকে শেষ পর্যন্ত জানতে হল কিনা হাসানের কাছ থেকে! সত্যি, কী বিচিত্র এই দেশ! কী বিচিত্র এই দেশের মানুষ! জাপানীরা যেটা এক পলকেই দেখতে পেল, এ দেশের মানুষের চোখ খোলা থাকতেও তা চোখে পড়ল না! সত্যি, বিচিত্র ব্যাপারই বটে!

অন্য দুটো স্যুটকেসের ভেতরের সোনা-দানার ব্যাপারেও শুনুন কী আজব কাণ্ড! নেতাজীর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হওয়া সত্ত্বেও স্যুটকেসের ভেতরে কি আছে সেটা জানতে কর্ণেল হবিবকে যেখানে আবিদ হাসানের স্মরণাপন্ন হতে হল সেখানে তথাকথিত বিমানেরই এক যাত্রী, মেজর তারো কোনো, যিনি নিজেকে সেই বিমানেরই দিগ্‌দর্শক, অর্থাৎ নেভিগেটর হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, এবং যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বিমানে ওঠার সিঁড়ির মুখেই তাঁর সঙ্গে নেতাজীর প্রথম আলাপ হয়, এবং যিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁর আগে তিনি কখনও একবারের জন্যও নেতাজীকে চাক্ষুষ দেখেননি, সেই নব-পরিচিত লোকটিকেই নাকি নেতাজী পরিচয়ের পর-মুহূর্তেই স্যুটকেস খুলে দেখিয়েছিলেন যে কি অমূল্য সম্পদ তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন!

না, না, অমন করে হেসে উঠবেন না মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ ! আপনাদের হাসির শব্দে সেইসব আই. সি. এস পাশ বিচারপতিদের মর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে যারা মনে করেন যে নেতাজী ওই রকম খেলো চরিত্রেরই মানুষ ছিলেন। যারা মনে করেন, নেতাজী ছ্যাবলার মত যাকে তাকে যখন তখন যে কোন গুপ্ত কথা বলে দিতেন, তাঁর পেটে কোন কথা থাকত না—তারা আপনাদের হাসি শুনে সত্যিই বিচলিত বোধ করবেন। সুতরাং, অনুরোধ করছি, কাউকে মনে আঘাত দেবেন না ; অনুগ্রহ করে আপনারা আপনাদের হাসি সম্বরণ করুন।

মাননীয় আদালত, যা বলছিলাম, তাই বলি। তারো কোনোর বক্তব্য অনুযায়ী নেতাজী নাকি সত্যি সত্যিই তাঁকে সুটকেস খুলে সোনার গহনা দেখিয়েছিলেন। তিনি খোসলা সাহেবকে বলেছেন : 'নেতাজীর সঙ্গে ছুটো সুটকেস ছিল। তার একটা তিনি আমাকে খুলে দেখালেন। তাতে প্রচুর সোনার জিনিসপত্র ছিল।'

মনে হয়, কোনোর কথা শুনে খোসলা সাহেব নিজেও মনে মনে বেশ ঘাবড়ে যান। তাই তিনি কোনোকে আবার জিজ্ঞাসা করেন : 'নেতাজী নিজেই আপনাকে সুটকেস খুলে দেখালেন ?'

উত্তরে মিচকি হাসি হেসে কোনো বললেন : 'হ্যাঁ, তিনিই দেখালেন।'

সত্যি, নেতাজী কী ছ্যাবলাই না ছিলেন! কিন্তু মাননীয় আদালত, সেই ছ্যাবলা নেতাজীই কোনোকে তিনটে সুটকেস না দেখিয়ে মাত্র ছুটো সুটকেস দেখালেন কেন, সেটা একটু খোঁজ করে দেখবেন কি ? একবার ওঁদের ছুজনের কাছেই জানতে চাইবেন কি, হবিব এবং কোনোর মধ্যে কে সত্যি কথা বলছেন, আর কে বলছেন মিথ্যে ?

এবার শুনুন, আরও বিচিত্র কাহিনী। ইহাদো তাকাহাসি নামে একজন ভদ্রলোক, যিনি এককালে জাপ সেনাবাহিনীতে স্টাফ

অফিসার হিসেবে কাজ করতেন, এবং যিনি দুর্ঘটনায় পতিত তথাকথিত বিমানের যাত্রী ছিলেন বলে দাবি করছেন তিনি খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে নেতাজীর সঙ্গের মালপত্র সম্পর্কে কী অদ্ভুত কথাই না বলছেন! নেতাজী স্বাগত সমিতির কৌঁসুলী মিত্রিখা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন: 'নেতাজী তাঁর সঙ্গে কি কি মাল নিয়ে যাচ্ছিলেন?' তখন তাকাহাসি স্পষ্ট বলেন: 'নেতাজীর সঙ্গে কোন মালপত্রই ছিল না।'

হ্যাঁ, মাননীয় বিচারপতিগণ, ঠিক ওই ভাষায়, ওই শব্দেই তাকাহাসি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, নেতাজীর সঙ্গে কোন মালপত্রই ছিল না।

কিন্তু আইয়ারের কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে বলতে হয় যে,—ছিল। কারণ আইয়ার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'অবশেষে দ্বিতীয় গাড়িটা এসে পৌঁছল। তা থেকে নেতাজী এবং হবিবের মালপত্র নামিয়ে সরাসরি বিমানে তোলা হল।'

আইয়ারের বিবরণ পড়লে আমরা জানতে পারি যে মালপত্র-গুলো গাড়ি থেকে নামিয়েই সরাসরি বিমানে তোলা হয়েছিল। সেগুলো ভারী ছিল বলে কেউ যে কোনরকম আপত্তি জানিয়েছিল, এবং সেই আপত্তির জন্যই যে নেতাজী স্যুটকেস খুলে তা থেকে জামাকাপড় ও বইপত্র বের করে দিয়েছিলেন এমন কথা কিন্তু আইয়ার কোথাও বলেননি।

আপনারা বলতে পারেন, আইয়ার হয়ত তাঁর স্মৃতিকথায় ঘটনাটার উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে তা নয়, আইয়ারের দেওয়া আর একটা বিবরণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি শোনালেই তা আপনারা বুঝতে পারবেন। শাহনওয়াজ বলেছেন তাকিজাওয়ার আপত্তির জন্যই নাকি নেতাজী স্যুটকেস থেকে জামা-কাপড় এবং বইপত্র বের করে দেন। অথচ একাত্তর সালে, শাহনওয়াজের বক্তব্য শোনার পরও, আইয়ার খোসলা কমিটির

সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে তাঁর সেই পুরান বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। এবারও তিনি বলেছেন : 'দ্বিতীয় গাড়িটা এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তা থেকে সুটকেসগুলো নামিয়ে বিমানে তোলা হল।'

এখন বাকি আছেন আর একজন মাত্র—তিনি লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদা। ইসোদা খোসলা কমিটির কাছে বলেছেন : 'মাল নিয়ে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হল। নেতাজীর সঙ্গে অনেকগুলো মালপত্র ছিল, এবং তার সবকিছুই তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম, জেনারেল সিদেই পরে তাঁর মালপত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন। তখন তিনি তাঁর মালপত্রের এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে যেতে রাজি হলেন এবং বাকি দুই তৃতীয়াংশ সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেগুলো বিমানে ওঠান হল। এরপর হাসান বললেন যে, ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের পক্ষ থেকে আর একটা উপহার আছে, এবং সেটা আসছে। সে কারণে বিমান ছাড়তে আরও কিছুক্ষণ দেরি হয়ে গেল।'

মাননীয় বিচারপতিগণ, এবার বলুন, আমরা কার কথা বিশ্বাস করব? হবিবের? তাকিজাওয়ার? কোনোর? তাকাহাসির? আইয়ারের? নাকি ইসোদার? অথবা কারোই নয়? কারণ, হবিব যেখানে একবার দেখলেন চারটে সুটকেস, অন্যবার দেখলেন তিনটে, সেখানে মেজর তারো কোনো দেখলেন মাত্র দুটো আর মেজর তাকাহাসি দেখলেন একটাও নয়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার তাকাহাসি যেখানে দেখলেন যে একটাও সুটকেস নেই, সেখানে ইসোদা দেখলেন বেশ কিছু মালপত্র রয়েছে। তাছাড়া, ইসোদা যেখানে দেখলেন যে নেতাজী এক তৃতীয়াংশ মালপত্র ছেড়ে রেখে গেলেন সেখানে আইয়ার দেখলেন যে তিনি সব মালপত্রই সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আবার হবিব যেখানে বলছেন যে হাসানের কাছে তিনি শুনেছিলেন একটা সুটকেসে নেতাজীর জামা কাপড় ছিল,

সেখানে তাকিজাওয়ার বক্তব্য, কোন শোনাশুনির মধ্যে তিনি ছিলেন না ; তিনি নিজেই নেতাজীকে বাধ্য করেছিলেন জামাকাপড় এবং বইপত্রগুলো বাদ দিয়ে দিতে। অথচ ইসোদা বলছেন, তাকিজাওয়া নয়, তিনিই নেতাজীকে ওগুলো বাদ দিতে বলেছিলেন। শুধু তাই নয়; আইয়ারের মত একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী যেখানে জানতে পারলেন না নেতাজীর সুটকেসে কি আছে, হবিবের মত একজন একান্ত আপনজনকে যেখানে খবরটা জানতে হল হাসানের মারফত, ইসোদার মত একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পক্ষেও যেখানে জানা সম্ভব হল না আসল ব্যাপারটা কি, সেখানে তারো কোনো কিন্তু মুহূর্তের পরিচয়েই জেনে গেলেন সবকিছু ; নেতাজী নিজেই নাকি তাঁকে আগ বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন অমূল্য রত্নের খনিটাকে। এবার বলুন, এই ষষ্ঠরথীর মধ্যে কাকে মহারথী বলে মেনে নেব? কাকে বলব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ?

মালপত্রের কথা থাক, এবার আসুন নেতাজীর বিমানঘাঁটিতে এসে পৌঁছন, এবং ঠিক ক'টায় বিমানের যাত্রা শুরু হল সে সম্পর্কে কে কি বলছেন সেটা একবার যাচাই করে দেখি।

প্রথমেই শুনুন আইয়ারের বক্তব্য। আইয়ার তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: 'প্রায় এক ঘণ্টা আগে থাকতে বিমানের এঞ্জিন চালু ছিল। আমরা পৌঁছবার আধ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় গাড়িটা এসে পৌঁছল।' তা থেকে মালপত্র সোজা বিমানে তোলা হল। নেতাজী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানের ভেতরে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটা ছাড়ল ; তখন বিকেল ঠিক পাঁচটা পনের।'

পঁচিশ বছর পরে আইয়ার খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসেও ঠিক ওই একই কথা বলেছেন। সেখানেও তাঁর বক্তব্য: বিমান ছেড়েছিল বিকেল পাঁচটা পনেরতে। তার প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে নেতাজী বিমান বন্দরে এসে পৌঁছেছিলেন। অর্থাৎ আইয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী চারটে তিরিশ থেকে

পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই নেতাজী বিমান বন্দরে এসে গিয়েছিলেন।

এবার শুনুন হবিবের বক্তব্য। শাহ্নওয়াজ কমিটির সামনে হবিব বলেছেন: 'আমাদের খুব ব্যস্ততার মধ্যে বিমানে উঠতে হয়। জাপানীরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। আধ ঘণ্টা যাবৎ বিমানের এঞ্জিন চালু ছিল। মালপত্র ওঠাবার পরই যাত্রা শুরু হয়।'

এখানেও দেখছি সেই একই কথা। অর্থাৎ আইয়ার যে সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন, হবিবও ঠিক সেই সময়ই বলছেন। সুতরাং আসুন, এবার তৃতীয় সাক্ষীর বক্তব্যটা কি তা শোনা যাক।

তৃতীয় সাক্ষী হচ্ছেন জেনারেল ইসোদা। খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে ইনি বলেছেন: 'বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিমান সায়গন ছাড়ল। তার আগে নেতাজীর মালপত্র নিয়ে কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। মালপত্র বিমানে তোলা হলে হাসান বললেন, আর একটা উপহার আসছে। সে কারণে কিছুক্ষণ দেরি হল।'

ইসোদার বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে আইয়ার এবং হবিবের বর্ণনার খুব একটা পার্থক্য নেই। সুতরাং, ধরে নেওয়া যেতে পারে, ইসোদাও নেতাজীর বিমান বন্দরে আসার সময় সাড়ে চারটে নাগাদই নির্দ্দিষ্ট করছেন। অতএব আসুন, এ সম্পর্কে আর কোন্ প্রত্যক্ষদর্শী কি বলছেন সেটা শুনি।

মাননীয় আদালত, মেজর তারো কোনোর নাম আপনারা আগেই শুনেছেন। সেই যে ভদ্রলোক, যাকে নেতাজী নিজে থেকে সেধে সোনার গহনাপত্র দেখিয়েছিলেন, তিনিই হচ্ছেন মেজর তারো কোনো। নেতাজীর সায়গন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন সম্পর্কে এই তারো কোনোর বক্তব্যটা কি তা শুনুন। খোসলা কমিটির সামনে তারো কোনো বলেছেন: 'সকাল এগারটা থেকে চারটে পর্যন্ত আমি বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলাম। তারপর সিঁড়ি

বেয়ে বিমানে উঠলাম ; নেতাজীও আমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠলেন। ঠিক চারটে নাগাদ বিমান সায়গন ত্যাগ করল।' তারো কোনোর কথা শুনে নেতাজী স্বাগত সমিতির কৌঁসুলী শ্রী বলরাজ ত্রিখা জিজ্ঞাসা করেন : 'নেতাজী ঠিক কটার সময় বিমানবন্দরে এসেছিলেন ?' ত্রিখার প্রশ্নের উত্তরে কোনো বলেন : 'আমি তা দেখিনি।'

শুনুন কথা ! নেতাজী ওনাকে সুটকেস খুলে ধনরত্ন দেখালেন, ওনারা একই সঙ্গে বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন, এবং সব থেকে বড় কথা সকাল এগারটা থেকেই নাকি উনি সেখানে এসে বসেছিলেন, অথচ যাঁর আসার অপেক্ষায় বিমান ছাড়তে দেরি হয়ে যাচ্ছিল, এবং যিনি এসে না পৌঁছনতে বিমানের অন্যসব যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, সেই সব থেকে জরুরী মানুষটি যখন ওই রকম একটা ফাঁকা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলেন তখন কিন্তু উনি আর তাঁকে দেখতে পেলেন না ! এমনকি খবরটা জানতেও পারলেন না ! তাছাড়া অন্য সবার বিমান যেখানে পাঁচটা কিংবা সোয়া পাঁচটায় আকাশে উড়েছে, ওনার বিমান সেখানে চারটের পর আর এক্ মিনিটও অপেক্ষা করতে পারেনি, সোজা উড়ে গেছে আকাশে ; অথবা ইচ্ছে করলে বলতে পারেন—মহাকাশে।

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনাদের তো আগেই বলেছি, এরপর আরও অনেক, অনেক, অনেক ভেলকি দেখতে হবে ; দেখতে হবে আরও বহু অদ্ভুত যাদু। আমার সেই প্রতিশ্রুত ভেলকি এবং যাদুগুলোর মধ্যে এটা হচ্ছে এক বিচিত্রতম ভেলকি ; এক চমৎকার যাদু। এমন যাদু আজকালকার বাজারে খুব কমই দেখা যায় ! এমন ভেলকি এই ভেলকিবাজির যুগেও খুব কমই চোখে পড়ে !

মেজর তারো কোনোর ভেলকি দেখার পর আসুন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আর একজন প্রথম শ্রেণীর ভেলকিবাজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিরো নোনোগাকির। যদিও আমরা জানি

শাহনওয়াজ কমিটির মতে মেজর তাকিজাওয়াই ছিলেন তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত বিমানটির মুখ্য চালক তবু তর্কের খাতিরে মেনে নিতে হচ্ছে যে, এই নোনোগাকি নামক মানুষটিও ওই একই বিমানের মুখ্য-চালক ছিলেন। কারণ, খোসলা কমিটির কাছে কর্ণেল নোনোগাকি সেই দাবিই জানিয়েছেন। অতএব আসুন, এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীটির বক্তব্য আমরা অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে শুনি।

কর্ণেল নোনোগাকি একাত্তর সালে খোসলাকে বলেছেন: 'বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিমান সায়গন বিমানবন্দর ত্যাগ করল। তার ঠিক দু ঘণ্টা আগে নেতাজী বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন।' অর্থাৎ নোনোগোকির বর্ণনা অনুযায়ী বেলা তিনটের সময় নেতাজী বিমান বন্দরে এসেছিলেন।

এবার শুনুন এই নোনোগোকিরই দেওয়া অন্য একটা বর্ণনা। উনিশ শ উনসত্তর সালে জাপানের ইওমিউরি সিম্বুন পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নোনোগাকি বলেছিলেন: 'সতেরই অগস্ট বিকেল চারটে নাগাদ আমরা যখন সায়গন বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা দিতে যাচ্ছি তখন একই ধরণের আর একটা ভারী বোমারু বিমান এসে নামল সেখানে। সেই বিমান থেকে নেমে এলেন নেতাজী আর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিদেই।'

অবাক হবেন না, হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বিমানে করে নেতাজীর আগমনের কথা শুনে অমন অবাক হয়ে যাবেন না। এমনতর বিস্ময়গুলোকে মেনে নেবার অভ্যাস করুন। না হলে যে প্রতি পদে পদে আপনাদের হোঁচট খেতে হবে! প্রতি পদে পদে ঘাবড়ে যাবেন আপনারা!

আপনাদের চোখের অমন বিস্ময়পূর্ণ চাহনী দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত মাত্র কটা বিষয়ই বা হাজির করেছি আপনাদের সামনে! এরমধ্যেই আপনারা এমন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন! অথচ দেখুন, এর থেকে বহুগুণ অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা

শুনেও শাহনওয়াজ খান কিংবা জি. ডি. খোসলা সাহেব বিন্দুমাত্র বিস্মিত হননি। এর থেকে আরও বহু বিচিত্র কাহিনী শোনা সত্ত্বেও ওঁদের মধ্যে কেউই বলেননি যে ব্যাপারটা মোটেই বোধগম্য হচ্ছে না। বরং ওঁরা দুজনেই একবাক্যে, মহানন্দে, ভারত সরকারের মনের মত কথাটাই বলে দিয়েছেন। ওঁদের মতে তাইহকুতে সংঘটিত বিমান দুর্ঘটনাতেই নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ, উলটো-পালটা কথা শুনেই আপনারা অমন বিস্মিত হয়ে যাবেন না; আজব আজব কাহিনী শুনেই অমন অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকান শুরু করবেন না। মনে রাখবেন, আপনাদের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস দেখলে, যারা সেই ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষী দিতে এসেছেন তারা মনে মনে যেমন আঘাত পাবেন—তেমনই যারা আই. সি. এস. পাস করে কিংবা সামরিক বাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে ভবিষ্যত নিশ্চয়তার খোঁজে জীবন সংগ্রামে নেমেছেন তাঁরাও যথেষ্ট দুঃখিত হবেন। অতএব আসুন, কারও মনে দুঃখ না দিয়ে সাধারণভাবে, অতি সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে এই মামলার সাক্ষ্য প্রমাণগুলোকে অনুধাবন করুন; সেগুলোকে বিশ্লেষণ করুন; এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন—কে দোষী আর কে নির্দোষী?

মাননীয় আদালত, একবার চিন্তা করে দেখুন, একই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী, বিভিন্ন সময়ে, কত বিভিন্ন কথা বলতে পারেন! আইয়ার, হবিব এবং ইসোদা যেখানে বলছেন যে সাড়ে চারটে নাগাদ নেতাজী বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছিলেন এবং পাঁচটা থেকে সওয়া পাঁচটার মধ্যে যাত্রা করেছিলেন, সেখানে তায়োো কোনো বলছেন, উনি বিমানবন্দরে ঠিক কটায় এসেছিলেন তা আমি জানি না, তবে চারটের সময় যে যাত্রা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। অর্থাৎ আইয়ার, হবিব এবং ইসোদা নেতাজীকে যখন বিমান বন্দরে এসে পৌঁছতে দেখলেন, তায়োো কোনো তার প্রায় আধ ঘণ্টা আগেই দেখলেন নেতাজী বিমানবন্দর

ত্যাগ করে তুরেনের পথে যাত্রা করেছেন ! আবার তারো কোনো যখন দেখলেন যে নেতাজী তাঁর সঙ্গেই সায়গন ছেড়ে রওয়ানা দিলেন, তখন নোনোগাকি কিন্তু দেখলেন যে না, নেতাজী সায়গন ছেড়ে চলে গেলেন না, বরং অন্য একটা বিমানে করে সিদেইর সঙ্গে সায়গনে এসে নামলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, 'এই নোনোগাকিই আবার এক সময় দেখলেন, চারটে নয়, তিনটের সময়ই নেতাজী বিমানবন্দরে এসে হাজির হয়ে গেছেন এবং বেশ খোশ-মেজাজে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করছেন। অথচ তিনিই একসময় দেখেছিলেন, তাঁর শিক্ষক সিদেই, সেনাবাহিনীর কলেজে যাঁর কাছে তিনি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেই অতি পরিচিত মানুষটির সঙ্গে নেতাজী একটা ভারী বোমারু বিমান থেকে নামলেন ! এবার বলুন, এই পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বর্ণনার কোন্‌টা আমরা বিশ্বাস করব ? আইয়ার, হবিব এবং ইসোদার কথা যদি বিশ্বাস করি তাহলে বলতে হয় বাকি দুজন সাক্ষী মিথ্যে কথা বলছেন। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাহলে তো খোসলা সাহেবের ন্যায়বিচারের প্রতিই কটাক্ষ করা হবে। কারণ, উনি যে ওই দুজনকেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে প্রশংসাপত্র দিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া নোনোগাকি যখন বলছেন যে সেই বিমানে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর শিক্ষাগুরু সিদেইও এসেছিলেন, সেটাই বা একেবারে উড়িয়ে দিই কি করে ? আর যাই হোক, কোন ছাত্রের পক্ষে তাঁর গুরুকে চিনে নিতে ভুল হবে—এমন কথা কল্পনাই বা করব কিভাবে ? কিভাবে বলব যে তা হতেও পারে ?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বিষয়টা আমি আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি ; আপনারাই চিন্তা করুন। চিন্তা করে ঠিক করুন, এ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ? ততক্ষণে আমি অন্য একটা প্রসঙ্গে আসছি। সে প্রসঙ্গটা হল : নেতাজী বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবার পর থেকে বিমানে আরোহণের সময় পর্যন্ত কি কি ঘটনা

ঘটেছিল, এবং সেই সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা কে কি কথা বলছেন ?

আগে থাকতেই বলে নিই, এ ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্য আমি বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে আপনাদের সামনে হাজির করব। কারণ, আমার ধারণায়, নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত এ বিষয়টা সত্যিই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এ সম্পর্কে কোন্ সাক্ষী কি বলছেন, এবং কতজন সাক্ষী কত রকম কথা বলছেন সেটা জানাটা খুবই জরুরী। কেননা, আমার বিশ্বাস, তার মধ্য থেকেই আমরা এই কাহিনীর অনেকগুলো ছিদ্রকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হব; তার মধ্য থেকেই আবিষ্কার করতে পারব তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত বিমানের চালক এবং যাত্রী বলে দাবিদার মানুষগুলোর দাবির অযৌক্তিকতা কতখানি।

এবারে আসুন, এক এক করে সাক্ষীদের পরীক্ষা করা শুরু করি। প্রথমেই দেখি ওই সময়টুকুর ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রী এস. এ. আইয়ার কি বলছেন। নিজের স্মৃতিকথা, শাহনওয়াজ কমিশন এবং খোসলা কমিশন—এই তিন জায়গায়তেই আইয়ার বলেছেন: 'আমরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবার প্রায় এক ঘণ্টা আগে থাকতেই বিমানের এঞ্জিন চালু করে রাখা হয়েছিল'। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয় গাড়িটা এসে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র তোলা হল বিমানে। নেতাজী দ্রুত বিমানের দিকে এগিয়ে গেলেন। জেনারেল সিদেই বিমানের ভেতরেই বসেছিলেন, তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে নেতাজীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর নেতাজী ইসোদা, হাচাইয়া এবং আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে চলে গেলেন। পেছনে পেছনে গেলেন হবিব। ওঁরা ভেতরে যাবার পরই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সওয়া পাঁচটা নাগাদ বিমান যাত্রা শুরু করল।' অর্থাৎ আইয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী প্রথমতঃ, বিমান আকাশে ওড়ার জন্য একেবারে তৈরিই ছিল। এমনকি সে কারণে তার এঞ্জিনটাও প্রায় এক ঘণ্টা

আগে থাকতেই চালু করে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, সিদেই বিমানের ভেতরেই বসেছিলেন। নেতাজী সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলে তিনি বেরিয়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তৃতীয়তঃ, নেতাজী এবং হবিব বিমানে ওঠার পরই বিমান চলতে শুরু করে দেয়।

এবার শুনুন, হবিবের বিবরণ। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে হবিব বলেছিলেন: 'নেতাজী এবং আমি যখন বিমানের ভেতরে ঢুকলাম, তার আগেই অন্য সবাই ভেতরে বসে গিয়েছিলেন। নেতাজী ভেতরে ঢোকামাত্র জেনারেল সিদেই তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।'

মাননীয় আদালত, যারা বলবেন যে হবিব ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের অনেক মিথ্যে কথা বলেছিলেন, আমি তাদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন নেতাজীর সঙ্গের সোনাদানা কিংবা নেতাজীর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর বিভ্রান্তিকর বিবরণদানের ব্যাপারে একমত হলেও, এক্ষেত্রে কিছুতেই একমত হতে রাজি নই। কারণ, সোনাদানা কিংবা গন্তব্যস্থল সম্পর্কে হবিবের পক্ষ থেকে ব্রিটিশকে বিভ্রান্ত করার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কেননা, হবিব যদি ব্রিটিশদের বলতেন যে, তিনি দেখেছিলেন নেতাজী সঙ্গে করে অনেক সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছিলেন তাহলে সাথে সাথে তাঁর ওপর এ প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার দায়িত্বও এসে পড়ত যে, তিনি যখন বলছেন শুধুমাত্র আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই নেতাজী টোকিওতে যাচ্ছিলেন তখন সঙ্গে এত সোনাদানা নিয়ে যাওয়ার কারণ কি ছিল? তাছাড়া দুর্ঘটনার পর অত সোনাদানা গেলই বা কোথায়? শুধু তাই নয়, গন্তব্যস্থলের ব্যাপারেও হবিবের তরফে ব্রিটিশকে বিভ্রান্ত করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল। কারণ, তিনি যদি তাদের বলতেন যে, আমরা মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আরও বহু প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। কিন্তু বিমান যাত্রার মুহূর্তে জেনারেল

সিদেই বিমানের ভেতরে ছিলেন, না বাইরে ছিলেন—সে সম্পর্কে ব্রিটিশদের বিভ্রান্ত করার কোন কারণই থাকতে পারে না। অবশ্য কেউ যদি গায়ের জোরে একথা বলতে চান যে, আসলে যেহেতু হবিব প্রত্যেকটা কথাই মিথ্যে বলেছিলেন সেহেতু ও কথাটাও সত্যি বলেননি, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্য আমার কিছুই বলার থাকবে না। কিন্তু গায়ের জোরের প্রশ্ন যদি বাদ দেওয়া হয়, যদি সুস্থ মস্তিষ্কের যুক্তিকেই মেনে নিতে হয়, তাহলে বলব, হবিব ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে যে কথা বলেছিলেন, সে কথাই ঠিক। অর্থাৎ নেতাজী বিমানে ওঠার অনেক আগে থাকতেই জেনারেল সিদেই বিমানের ভেতরে বসেছিলেন, এবং নেতাজী ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান।

এবার শুনুন হবিবের দ্বিতীয় বর্ণনা। উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ কমিটির সামনে হবিব বলেছেন: 'আমাদের বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই বিমানে উঠতে হয়েছিল। কেননা জাপানীরা খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল, এবং প্রায় আধঘণ্টা ধরে বিমানের এঞ্জিন চালু ছিল। আমরা বিমানে ওঠার আগেই জেনারেল সিদেই বাইরে বেরিয়ে এসে নেতাজীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর জেনারেল সিদেই, নেতাজী এবং আমি—পরপর বিমানের ভেতরে প্রবেশ করলাম।' অর্থাৎ হবিবের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথমতঃ, বিমানটা যাত্রার জন্য একেবারে তৈরি হয়েই ছিল। এমন কি তাঁর জন্য তাঁর এঞ্জিনটাকেও চালু করে রাখা হয়েছিল। তবে আইয়ারের বিবরণের সঙ্গে হবিবের বিবরণের সামান্য গড়মিল হচ্ছে এক্ষেত্রে যে আইয়ার বলছেন, তাঁরা বিমানবন্দরে পৌঁছবার প্রায় এক ঘণ্টা আগে থাকতেই এঞ্জিন চালু করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু হবিব বলছেন যে, না, তা নয়; বিমানযাত্রার ঠিক আধঘণ্টা আগেই এঞ্জিন চালু করা হয়। অর্থাৎ তাঁরা বিমানবন্দরে পৌঁছবার পরই এঞ্জিন চলতে শুরু করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমবার তিনি দেখেছিলেন, নেতাজী বিমানের

ভেতরে ঢোকার পরই সিদেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলেন, নেতাজী বিমানে প্রবেশ করার আগেই সিদেই এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। তৃতীয়তঃ, হবিব নিজেই হচ্ছেন শেষ যাত্রী যিনি বিমানে প্রবেশ করার পরই বিমানযাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এবার আসুন, এ সম্পর্কে জেনারেল ইসোদার বক্তব্যটা কি তা শোনা যাক। জেনারেল ইসোদা খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন: 'নেতাজীর জন্য বিমান ছাড়তে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। মালপত্র এসে পৌঁছবার পর সেগুলোকে বিমানে তোলা হল। তারপর নেতাজী এবং কর্ণেল রহমান বিমানে উঠলেন। অন্যান্য যাত্রীরা তার আগেই বিমানের ভেতরে বসে গিয়েছিলেন।' অর্থাৎ, ইসোদার বর্ণনা মত, প্রথমতঃ, নেতাজী এবং হবিবই সবার শেষে বিমানে উঠেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সিদেই বিমানের বাইরে এসে নেতাজীকে অভিনন্দন জানাননি, তিনি ভেতরেই বসেছিলেন।

এবার দেখুন মেজর তারো কোনো কি বলছেন। মেজর কোনোর বক্তব্য হচ্ছে: 'নেতাজী ঠিক কখন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছিলেন তা আমি দেখিনি। আমরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বিমানে উঠলাম, আগেও নয়, পরেও নয়। বিমানে ওঠার মুখেই জেনারেল সিদেই আমার সঙ্গে নেতাজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর আগে নেতাজী অনেকক্ষণ ধরে জেনারেল সিদেইর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।' অর্থাৎ তারো কোনোর মতে, প্রথমতঃ, বিমানযাত্রার আগে সিদেই বিমানের বাইরেই ছিলেন এবং নেতাজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিমানে ওঠবার জন্য নেতাজী কিংবা অন্যান্যরা যে খুব একটা তাড়াহুড়ো করছিলেন, তা নয়। তৃতীয়তঃ, নেতাজী এবং হবিবই সবার শেষে বিমানে উঠেছিলেন বলে অন্যান্য সাক্ষীরা যা বলছেন তা ঠিক নয়; অন্ততঃ মেজর কোনো নিজে যে ওঁদের সঙ্গেই বিমানের ভেতরে ঢুকেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজের মনে কোন

সন্দেহই নেই।

তারো কোনোর বক্তব্যের পর শুনুন মেজর ইহাদো তাকাহাসির বক্তব্যটা কি? তাকাহাসি খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন: 'আমি বিমানবন্দরে এসে দেখলাম লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সিদেই, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল নোনোগাকি, মেজর তারো কোনো এবং নেতাজী দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তারপর নেতাজী এগিয়ে গিয়ে বিমানে উঠলেন। তিনি বিমানে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমিও উঠলাম। অর্থাৎ মেজর তাকাহাসি বলতে চাইছেন, প্রথমতঃ, বিমানে ওঠার আগে নেতাজী সিদেইসহ অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, নেতাজীই যে বিমানে সবার শেষে উঠেছেন তা নয়, অন্ততঃ মেজর তাকাহাসি নিজেই তাঁর পরে উঠেছেন। তৃতীয়তঃ, হবিবের বক্তব্য অনুযায়ী, জাপানীরা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বলে আমরা যা শুনেছি তা মিথ্যে। সবকিছু খুব স্বাভাবিকভাবেই চলছিল।

মেজর তাকাহাসির বক্তব্য আপনারা জানলেন; এবার জানুন কর্ণেল সিরো নোনোগাকির বক্তব্যটা কি? কর্ণেল নোনোগাকি খোসলা কমিশনের সামনে বলেছেন: 'বেলা তিনটে নাগাদ নেতাজী বিমানবন্দরে এলেন। তারপর দু ঘণ্টা ধরে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। কর্ণেল টাডা ওঁনাকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, উনিই হচ্ছেন চন্দ্র বোস। এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন যাতে আমি ওঁনাকে ওই নামে না ডাকি। কেননা, তাতে ওঁনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।' এরপর নোনোগাকি বলছেন: 'সবার আগে জেনারেল সিদেই গিয়ে বিমানে উঠলেন। তারপর নেতাজী, এবং তারপর অন্যান্যরা। অর্থাৎ তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথমতঃ, প্রায় দু ঘণ্টা ধরে সিদেই বিমানের বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সিদেই-ই সবার আগে গিয়ে বিমানে উঠলেন। তৃতীয়তঃ, নেতাজী বিমানে ওঠার পরও আরও অনেকেই

বিমানে উঠেছিলেন। চতুর্থতঃ, বিমানে ওঠা এবং তাড়াতাড়ি যাত্রা করার ব্যাপারে কর্ণেল নোনোগাকি এই লোকগুলোর মধ্যে কোন রকম ব্যস্ততা দেখতে পাননি।

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমি এবার আপনাদের সামনে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি। আমি জানতে চাইছি, এ সম্পর্কে আপনাদের মতামতটা কি? আপনারা বলুন, একই ঘটনার বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হচ্ছে কেন? কেন আইয়ার, হবিব, ইসোদা, কোনো, তাকাহাসি এবং নোনোগাকি—এঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দাবি করা সত্ত্বেও কিছুতেই সেই ঘটনার একই বিবরণ দিতে পারছেন না? কেন, আইয়ার যেখানে বলছেন যে জাপানীদের এত বেশি তাড়া ছিল যে তারা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বিমানের এঞ্জিনকে চালু করে রেখেছিল, সেখানে নোনোগাকি বলছেন যে, না, কোন তাড়াই ছিল না। কেননা, যদি সত্যিই তাড়া থাকত তবে বিমানের প্রতিটি যাত্রী দু ঘণ্টা ধরে বাইরে ঘোরাফেরা করতেন না; অন্ততঃ জেনারেল সিদেই বিমানে ওঠার আগেই তাঁরা বিমানে উঠে বসে থাকতেন। তাছাড়া আইয়ার, হবিব এবং ইসোদা যেখানে বলছেন যে নেতাজী এবং হবিবই সবার শেষে বিমানে উঠেছিলেন, এবং তাঁদের ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিমান চলতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে কোনো, তাকাহাসি এবং নোনোগাকি বলছেন যে, না, ওটা মিথ্যে; ওঁরা বিমানে ওঠার পরও অন্যান্যরা বিমানে উঠেছিলেন। অন্ততঃ তাঁরা নিজেরা তো বটেই। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসব? পরের তিনজনকে মিথ্যেবাদী বলব, নাকি প্রথম তিনজনকে? অথবা এমন একটা দৃশ্যের কল্পনা করে নেব যে, কলকাতা শহরে অনেক সময় আমরা চলন্ত বাস-ট্রামে যেমনভাবে ছুটে গিয়ে উঠি, ওঁরাও ঠিক সেভাবেই বিমান ছেড়ে দেবার পরই ছুটে গিয়েই তাতে উঠেছিলেন?

মাননীয় আদালত, কথাটা যদিও হাসির মতই শোনাচ্ছে, তবু

এছাড়া আর কী-ই বা আমরা কল্পনা করতে পারি বলুন? যেখানে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখলেন যে, বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং সেটা চলতে শুরু করল, সেখানে অন্য তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী তথা সেই বিমানেরই যাত্রী বলছেন যে তারপরও তাঁরা বিমানে উঠেছিলেন। বলুন, এ থেকে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে আসব? কোন্টাকে ঘটনা বলব, আর কোন্টাকেই বা বলব রটনা?

তারপর দেখুন, জেনারেল সিদেইর ব্যাপারটা। আইয়ার বলছেন যে, তিনি সিদেইকে বিমানের বাইরে বেরিয়ে এসে নেতাজীর সঙ্গে করমর্দন করতে দেখলেন, এবং হবিব বললেন, যদিও প্রথমবার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ সালে তিনি সিদেইকে করমর্দন করতে দেখেননি, তবে ছাপ্পান্ন সালে দেখেছিলেন; সেখানে তারো কোনো, তাকাহাসি এবং নোনোগাকি বলছেন যে, ওসব মিথ্যে কথা— সিদেইর বিমানের বাইরে এসে নেতাজীর সঙ্গে করমর্দন করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, তিনি তো প্রায় ছ ঘণ্টা ধরে বিমানের বাইরে দাঁড়িয়েই নেতাজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। সুতরাং তাঁর যদি নেতাজীর সঙ্গে করমর্দন করার ইচ্ছেই হত তাহলে তিনি সেটা তখনই সেরে নিতে পারতেন; সেজন্য তাঁর একবার বিমানের ভেতরে গিয়ে আবার বাইরে বের হয়ে আসার কোন প্রয়োজন হত না। অথচ ইসোদা বলছেন, ওরা সবাই মিথ্যুক, একমাত্র সত্যবাদী আমি। কারণ একমাত্র আমিই দেখতে পেয়েছি যে; জেনারেল সিদেই বিমানের বাইরেই বের হননি; তিনি সব সময় ভেতরেই বসেছিলেন। এবার বলুন, এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোন্টাকে আমরা তথ্যপূর্ণ এবং যুক্তিনিষ্ঠ বলে মেনে নেব? কাকে মনে করব আসল প্রত্যক্ষদর্শী, আর কাকে মনে করব নকল প্রত্যক্ষদর্শী? বলুন, এ সম্পর্কে আপনাদের মতামতটা কি? বলুন, আপনারা এ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

হে মাননীয় আদালত, আপনারা ভাবুন; বিষয়টাকে খুব গভীর-

ভাবে চিন্তা করুন। এখনই, এই মুহূর্তেই এ প্রশ্নের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন নেই। যখন চূড়ান্ত রায় দেবেন, তখন বিষয়টাকে মনে রাখলেই আমি খুশি হব। তখন যদি আপনারা এই অসঙ্গতি-গুলোকে আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব; তাহলেই মনে করব যে আমার এতদিনকার এত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে; এতদিনকার এত প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

এবার আসুন, অন্য একটা ব্যাপার, যেটা প্রায় সবারই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সে সম্পর্কে দু একটা কথা বলে নিই। আপনারা জানেন, ইসোদা এবং হাচাইয়া নেতাজীর সঙ্গে তাঁর বাংলোতে দেখা করে তাঁকে মোট দুটো আসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব নেতাজীর অন্য পাঁচজন সহকর্মীকে তাঁরা নেতাজীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তবুও নেতাজী তাঁর সহকর্মীদের তাঁর সঙ্গে মালপত্রসহ বিমানবন্দর পর্যন্ত আসতে বলেছিলেন এই আশায় যে, যদি বিমানবন্দরে গিয়েও কোন অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা যায় তা হলে তিনি ওঁদের মধ্য থেকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এবার শুনুন, সে ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হল।

খোসলা কমিটির সামনে আইয়ার যখন তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন খোসলা সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'আচ্ছা মিস্টার আইয়ার, বাড়তি আসন পাওয়া সম্পর্কে এর আগে আপনি যা বলেছিলেন, বিমানবন্দরে কি সে সম্পর্কে কোন কথাই হল না?'

খোসলার এই প্রশ্নের উত্তরে আইয়ার বলেছেন: 'না, সে ব্যাপারে আর কোন কথাই হল না। কারণ, বোঝা যাচ্ছিল, তেমন কোন সম্ভাবনা ছিল না।'

অথচ নোনোগাকি বলছেন যে, হ্যাঁ, কথা হয়েছিল। অবশ্য

আইয়ার যে অতিরিক্ত আসনের কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে নয়, বরং আইয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী যে দুটো আসন ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল সে দুটো আসন সম্পর্কেই। এ ব্যাপারে নোনোগাকির বক্তব্য হল : 'নেতাজীর সঙ্গে আরও পাঁচ ছ জন লোক ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল কমপক্ষে দুটো করে সুটকেস। তাঁরা প্রত্যেকেই যেন যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। এসব দেখে দো-ভাষীর মাধ্যমে আমি বললাম, নেতাজী এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে একজনের বেশি লোককে আমি নিতে পারব না। আমার কথা শুনে নেতাজী প্রথমে খুব আপত্তি জানালেন. কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবেই রাজি হলেন। তখন ঠিক হল রহমান তাঁর সঙ্গে যাবেন।'

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, একবার অনুগ্রহ করে দেখুন, গল্পের গরু কিভাবে তরতর করে গাছে উঠে যাচ্ছে! দেখুন, কিভাবে ধীরে ধীরে একটা সম্পূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনীর সৃষ্টি হচ্ছে! ইসোদা, হাচাইয়া, আইয়ার, হবিব, প্রীতম, দেবনাথ, গুলজারা, হাসান প্রভৃতি সকলেই যেখানে বলছেন যে দুটো আসন পাওয়ার ব্যাপারটা নেতাজীর বাংলোতেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানে নোনোগাকি ইওমিউরি সিম্বুন পত্রিকার প্রতিনিধিকে বললেন যে, না, ওটা আমিই ঠিক করেছিলাম। এবং আমার দয়াতেই সেদিন নেতাজী বিমানে জায়গা পেয়েছিলেন! বলুন, এরপর কি বলবেন? এরপর আর কিছু বলার আছে কি?

এবার শুনুন, আর এক নতুন কাহিনী। আমরা জানি, ইসোদা গিয়ে নেতাজীকে জানিয়েছিলেন যে বিমানে দুটোর বেশি আসন পাওয়া যাবে না। কারণ, কর্ণেল টাডা নাকি তাঁকে সে কথাই বলেছিলেন। কিন্তু এখন শুনছি যে না, ইসোদা নন, কর্ণেল টাডা নিজেই গিয়ে খবরটা দিয়েছিলেন নেতাজীকে—তাঁর বাংলোতে। এ সম্পর্কে একান্ন সালের জুন মাসে কর্ণেল টাডা আইয়ারকে

বলেছিলেন : 'যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফিল্ড মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচি টোকিওর সামরিক দপ্তরে বিষয়টা না জানিয়েই নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নেতাজীকে রুশ দখলীকৃত এলাকায় পাঠাবার জন্য সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এবং ঠিক হল জেনারেল সিদেই যে বিমানে দাইরেন যাচ্ছেন, নেতাজীকেও সেই বিমানে করেই পাঠান হবে। সেই সঙ্গে এ-ও ঠিক হল যে, দাইরেন পর্যন্ত নেতাজীর দেখাশোনা করবেন জেনারেল সিদেই ; তারপর নেতাজী নিজেই রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তখন আমরা রটিয়ে দেব যে নেতাজী দাইরেন থেকে অন্তর্ধান করেছেন। এই প্রস্তাব নিয়ে আমি দালাত থেকে সায়গনে এলাম, এবং নেতাজী যে বাংলোতে ছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালাম। এমন কি ওই বিমানে করেই আমার টোকিও যাওয়ার কথা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার আসনটা ছেড়ে দিলাম ; এবং সেই আসনে কর্ণেল হবিবুর রহমান গেলেন।'

মহামান্য আদালত, এবার দেখুন, আবার এক নতুন ভেলকি ! এতক্ষণ শুনে আসছিলাম, নেতাজীকে বিমানে ছুটো আসন দেবার কথা জানিয়েছিলেন জেনারেল ইসোদা, কিন্তু এখন হঠাৎ শুনছি যে জেনারেল ইসোদা নন, কর্ণেল টাডাই নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন ! এমনকি নেতাজীর অনুরোধ শুনে উনি নাকি এত বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত নিজের আসনটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন কর্ণেল হবিবের জন্য। অথচ দেখুন, জেনারেল ইসোদা কিন্তু বলছেন যে, না, তা নয়—কর্ণেল টাডা নন, তিনি নিজেই গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে ছুটো আসন পাবার খবরটা জানিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং এখন আপনারাই বলুন, এই তুই মহারথীর মধ্যে কাকে বিশ্বাস করব ? কার কথা বিশ্বাস করলে আমাদের পাপের বোঝাটা একটু হালকা হবে ? কাকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হিসেবে চিহ্নিত করলে আমাদের নরক

যন্ত্রণা ভোগের মেয়াদটা কিছুটা কমে যাবে ? বলুন, কাকে ?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, অনেক কথাই তো তখন থেকে বললাম ; অনেক সাক্ষ্য প্রমাণকেই তো আপনাদের সামনে হাজির করলাম, কিন্তু যে বিমানে করে নেতাজী নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিলেন বলে বলা হচ্ছে, সে বিমানটা কোন্ শ্রেণীর বিমান ছিল, তার যান্ত্রিক অবস্থাই বা ছিল কি রকম—সে সম্পর্কে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কথাই বলিনি। অথচ এই মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সেটা জানা আপনাদের পক্ষে একান্তই জরুরী। কারণ, বহু সাক্ষীই বলেছেন যে বিমানের প্রপেলার ভেঙ্গে পড়ার জন্যই নাকি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। সুতরাং আসুন, এবার সেই প্রসঙ্গেই প্রবেশ করি।

'তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত বিমান, যেটা সতেরই অগস্ট সন্ধ্যার সায়গন থেকে যাত্রা করেছিল, সেটা কোন ধাঁচের বিমান ছিল ?' খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানকালে নেতাজী স্বাগত সমিতির কৌঁসুলী শ্রী বলরাজ ত্রিখার এই প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ইসোদা বলেছিলেন : 'সেটা ছিল নতুন তৈরি সর্বাধুনিক ধাঁচের একটা বড় বোমারু বিমান।' অবশ্য জেনারেল ইসোদা উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে যখন শাহনওয়াজ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন তখনও ওই এক কথাই বলেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিমানটার নতুনত্ব সম্পর্কে এই ভদ্রলোকের মনে কোনকালেই কোন সন্দেহ ছিল না, এবং আজও নেই।

অথচ ওই বিমানেরই একজন যাত্রী, যাকে সর্বঘটের কাঁঠালী কলার সঙ্গে তুলনা করলে খুব একটা কিছু বাড়িয়ে বলা হবে বলে মনে হয় না, সেই কর্ণেল নোনোগাকি কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটির কাছে বলেছেন যে, বিমানটা ছিল একেবারেই পুরান। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ওল্ড মডেল, তাই।

আবার আমরা যদি ক্যাপ্টেন কৈকিচি আরাই এবং মেজর

তারো কোনোর কথা বিশ্বাস করি, তাহলে বলতে হয় যে কর্ণেল নোনোগাকি মিথ্যে কথা বলছেন। কারণ, আরাই এবং কোনো—এঁরা দুজনেই শাহনওয়াজ কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে স্বীকার করেছিলেন যে, তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত্ত বিমানটা ছিল একেবারে সর্বাধুনিক ধাঁচের।

কিন্তু মুশকিল বেঁধেছে ফরমোসা বাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল ইসায়ামাকে নিয়ে। তিনি সোজাসুজি বলে বসেছেন যে, না, আরাই এবং কোনো মোটেই সত্যি কথা বলছেন না। ওঁরা যা বলছেন সবটাই বানান। আসলে বিমানের এঞ্জিনটা ছিল একেবারেই ঝরঝরে।

অথচ আজব ব্যাপার দেখুন, তাইহকু বিমানঘাঁটিতে যিনি সেই বিমানটাকে পরীক্ষা করেছিলেন বলে দাবি করছেন সেই গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামোমোতো কিন্তু বলছেন ঠিক উলটো কথা। ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে তিনি বলছেন, তাঁকে নাকি ওই বিমানের পাইলট মেজর তাকিজাওয়া বলেছিলেন, বিমানের এঞ্জিনটা ছিল একেবারেই নতুন ; এবং সায়গন বিমানঘাঁটিতে সেটাকে বসান হয়েছিল।

হে মাননীয় আদালত, সব কথাই তো শুনলেন, এবার বলুন তো, বিমানটা আসলে কোন্ ধাঁচের বিমান ছিল? সর্বাধুনিক, নাকি একেবারেই ঝরঝরে? যে সব সাক্ষী বলেছেন যে তাঁরা বিমানটার অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ অবহিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কে সত্যি কথা বলছেন, আর কে বলছেন মিথ্যে? জেনারেল ইসোদা, কর্ণেল নোনোগাকি, ক্যাপ্টেন আরাই, মেজর কোনো, জেনারেল ইসায়ামা, ক্যাপ্টেন নাকামুরা—এঁরা কেউই তো ফালতু লোক নন; এঁদের প্রত্যেকেই তো জাপ সামরিক বাহিনীর বেশ দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন। অথচ এঁরা সবাই মিলে এমন দায়িত্বহীনের মত কথাবার্তা বলছেন কেন? কেন এঁদের একজনের কথার সঙ্গে অন্যের কথার

কোন মিলই হচ্ছে না? কেন এঁরা প্রত্যেকেই এমন অসঙ্গতিপূর্ণ বিবৃতি দিচ্ছেন? বলুন, এ থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসব?

মাফ করবেন মহামান্য বিচারপতিবৃন্দ, এই সব সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচার করার পর আমি যদি একথা বলি যে এঁরা প্রত্যেকেই ডাহা মিথ্যেবাদী, তাহলে সেটা কি খুবই অন্যায় বলা হবে? যদি বলি, ওঁদের মধ্যে অনেকেই নেতাজীর বিমান যাত্রা দেখেনইনি, তাহলেও কি কিছু ভুল বলা হবে? যদি বলি, নেতাজী যে বিমানে করে অন্তর্ধান করেছিলেন সে বিমান সম্পর্কে দু একজন ছাড়া আর কারও কিছু জানা-ই নেই, তাহলে কি সেটা মিথ্যে বলা হবে? তাছাড়া এ সম্পর্কে আর কী-ই বা বলতে পারি বলুন? কী বলা যেতে পারে? একজন জেনারেল যেখানে বলছেন যে বিমানের এঞ্জিনটা ছিল একেবারেই ঝরঝরে, অন্য একজন গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার সেখানে বলছেন যে, না, ওটা ছিল একেবারে আনকোরা নতুন! বলুন, এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? নেতাজী কি তাহলে একই সঙ্গে দুটো বিমানে করে যাত্রা করেছিলেন? তিনি কি একই সঙ্গে দুটো বিমানে করে তাইহকুতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন?

থাক, এ সম্পর্কে আমি আর কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। এখন এ ব্যাপারটা আপনাদের ওপর-ই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারাই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করুন, বক্তব্যগুলোকে বিচার করুন, এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন যুক্তিগুলোকে। তারপর রায়দানের সময় বলবেন, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক? কে সত্যি কথা বলছেন, আর কে বলছেন না? ইতিমধ্যে আসুন, আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গে প্রবেশ করি।

আপনারা শুনেছেন, বিকেল পাঁচটা থেকে সোয়া পাঁচটার মধ্যে বিমানটা সায়গন বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু যেটা শোনেননি, তা হল, সেই বিমানটাতে কজন যাত্রী ছিলেন, এবং তাঁরা কারা? আসুন, এবার আমি আপনাদের সেই কাহিনীই

শোনাই।

আপনারা এ কথা শুনলে আশ্চর্য হবেন কিনা জানি না, তবে আমি যখন কথাটা প্রথম শুনেছিলাম তখন খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে তুনিয়াতে কত রকমের অদ্ভুত কাণ্ডই না ঘটে চলেছে, অথচ আমরা তার সামান্য অংশমাত্রও জানতে পারছি না!

হে মাননীয় বিচারপতিগণ, আপনারা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন যে সেই অদ্ভুত কাণ্ডগুলো কি? আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন তার থেকে তু একটা উপমা দিতে। এবং আপনারা যে এটা বলবেন তা জেনেই আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তবু বলব, সেই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার যেটুকু এখন পর্যন্ত আমার জানার সৌভাগ্য হয়েছে, আমার নিজের ধারণা, আসল সংঘটিত ঘটনাবলীর তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য ; এমনকি বলা চলে সেটা শতকরা এক ভাগও নয়। তবু সেই সামান্য ভগ্নাংশ থেকেই আমি আপনাদের তু একটা নমুনা শোনাচ্ছি।

প্রথম নমুনা হচ্ছে : যে বিমান সেদিন সায়গন থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যাত্রা করেছিল, সে বিমানের যাত্রী তালিকা কি, কারা কারা তার চালক ছিলেন, সে সম্পর্কে সায়গনের জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কোন তথ্য নেই।

দ্বিতীয় নমুনা : অতবড় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে যে বিমান আকাশে উঠল, সে বিমানের যাত্রী তালিকা রাখাটা যে নিতান্তই প্রয়োজন, একথাটাও জাপ সামরিক বিভাগ স্বীকার করতে রাজি নয়।

তৃতীয় নমুনা : যে বিমানে নেতাজী এবং জেনারেল সিদেইর মত লোক যাচ্ছিলেন তার মুখ্য-চালক কে ছিলেন, তা-ও কেউ ঠিক করে বলতে পারছেন না।

চতুর্থ নমুনা : বিমানে ঠিক কত জন যাত্রী উঠেছিলেন, সামরিক দপ্তর তো নয়-ই, এমনকি বিমানের যাত্রীদের পক্ষেও তা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

. পঞ্চম নমুনা : বিমানটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটুকুতেই বা কারা কারা সাহায্য করেছিলেন, সে সম্পর্কে বিমানটা যারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে দাবি করছেন, তাঁরাও সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

এই গেল নমুনা। এবার শুনুন এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্যটা কি ?

ভারত সরকার নিয়োজিত দু দুটো তদন্ত কমিশন বহু অনুসন্ধান করেও এটা জানতে পারেননি যে সায়গন থেকে নেতাজী এবং জেনারেল সিদেইর মত দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের সতেরই অগস্ট সন্ধ্যা সওয়া পাঁচটা নাগাদ যে জাপানী বোমারু বিমানটা যাত্রা করেছিল সেটা চালাচ্ছিলেন কারা এবং তার যাত্রী তালিকাটাই বা কি ? এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে অনুসন্ধান করার পর যখন জানা গেল যে জাপ সামরিক মহলের হাতে সে ধরনের কোন তথ্যই নেই, তখন ওই দুটো কমিশন নিজেরাই আগ বাড়িয়ে এসে মন্তব্য করলেন : 'আসলে সে সময় জাপ সামরিক মহলে এমনই ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা চলছিল যে, ওসব ছোটখাটো ব্যাপারে নজর দেওয়ার মত মানসিক অবস্থাও তখন তাদের ছিল না।'

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে : শাহনওয়াজ এবং খোসলা কমিশন তৎকালীন জাপ সামরিক মহলের বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা কি আদপে ঠিক ? কারণ; এই দুটো কমিটির রিপোর্ট থেকেই আমরা জানতে পারছি যে, যদিও নেতাজীকে কোন নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দেবার জন্য জাপানীরা- তখন খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তবু তার মধ্যেও তারা নেতাজীকে দেখাশোনা করার জন্য ব্যাঙ্কক থেকে সায়গন পর্যন্ত একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও একজন মন্ত্রীকে নিয়োজিত করার কথাটা কিন্তু মোটেই ভুলে যায়নি। এমন কি নেতাজীর সায়গন থেকে দাইরেন পর্যন্ত যাত্রা

পথে লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সিদেইর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির থাকাটা যে খুবই প্রয়োজন, সে চিন্তাটাও সব সময়ই তাদের মাথায় গিজ্ গিজ্ করছিল। শুধু তাই নয়, তখন পর্যন্ত তথাকথিত বিশৃঙ্খল জাপ সামরিক মহলে নিয়োগ এবং বদলীর ব্যাপারটাও যে পুরো মাত্রায়ই চালু ছিল, এবং সেই ব্যবস্থা অনুযায়ীই যে লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ইসোদাকে মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধরত জাপ সেনাবাহিনীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা করে পাঠান হচ্ছিল, সে তথ্যটুকুও কিন্তু আমরা তাদের দেওয়া বিবরণ থেকেই জানতে পারছি। অথচ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিমানের যাত্রী তালিকা এবং বিমান চালকদের নাম লিখে রাখার মত সাধারণ ব্যাপারটা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্যই নাকি তা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইতিহাস বলে ঠিক উলটো কথা। তার প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও জাপ সামরিক মহলে এতবেশি সুশৃঙ্খলা ছিল যে তারা অগস্ট মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত তাদের দখলিকৃত এলাকায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি; এমনকি ব্রিটিশ এবং মার্কিন বাহিনীর কাছে যখন তারা আত্মসমর্পণ করে তখনও তাদের মধ্যে বিস্ময়কর শৃঙ্খলা দেখে বিজয়ী বাহিনী নিজেরাই আশ্চর্য হয়ে যায়। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, শাহনওয়াজ খান এবং জি. ডি. খোসলা এই সহজ সত্য কথাটা জানার পরও কিন্তু বলছেন যে, ও ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—নিতান্ত বিশৃঙ্খলার ফল মাত্র। হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনারাই বলুন, সত্যিই ভুলটা বিশৃঙ্খলার জন্যই ঘটেছে, নাকি এটা একটা ইচ্ছাকৃত কারচুপি? কারণ, ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী কিন্তু যুদ্ধ শেষে অনুসন্ধান চালিয়ে সায়গনের জাপ সামরিক বাহিনীর দপ্তরে এ ধরনের আরও অনেক ইচ্ছাকৃত কারচুপির সন্ধান পেয়েছে। যথাযথস্থানে আমি আপনাদের সেই কারচুপির কাহিনীগুলো শোনাব। এখন শুধু এই একটা বিষয়ের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখতে চাইছি। কারণ,

এ থেকে অন্ততঃ আপনাদের এটুকু বোঝার সুবিধে হবে যে শাহনওয়াজ এবং খোসলা সাহেব কী চমৎকার চমৎকার মনগড়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন !

শুধু কি তাই ! কোন কোন জাপানী সামরিক অফিসার শাহনওয়াজ কমিটির সামনে এমন কথাও বলেছেন যে, সেদিন যে বিমান নেতাজী এবং সিদেইকে নিয়ে যাত্রা করেছিল সে বিমানের যাত্রী তালিকা কিংবা বৈমানিকদের নাম-ধাম টুকে রাখাটা খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারও ছিল না। কারণ, তাদের মতে, তখন, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনেক বিমানই যাত্রী তালিকা ছাড়াই যাতায়াত করছিল।

মাননীয় আদালত, আপনারা বলুন, 'বহু বিমানই যাত্রী তালিকা ছাড়াই যাতায়াত করছিল' আর 'নেতাজী এবং সিদেইর মত দুজন বিশিষ্ট যাত্রীকে নিয়ে একটা বিমান বিনা যাত্রী তালিকাতেই সুদূর দাইরেনের পথে পাড়ি জমিয়েছিল'—এ দুটো ব্যাপার কি এক হল ? তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেই নিই যে ছোটখাটো যে সব অনির্ধারিত, অর্থাৎ হঠাৎ হঠাৎ বিমান যাত্রা ঘটছিল, সেই সব বিমানের কোন যাত্রী তালিকা রাখার রেওয়াজটা বিশৃঙ্খলার কারণেই জাপ সামরিক বিভাগ থেকে সত্য সত্যই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, তবুও কি একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব যে একটা নির্ধারিত বিমান যাত্রার বেলাও, এবং যে বিমানে একটা স্বীকৃত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যাচ্ছিলেন, সেখানেও ওই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছিল ? বলুন, যে সব অফিসাররা এমন অদ্ভুত যুক্তি দেখাচ্ছেন, তারা কি জেনে শুনেই মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছেন না ? বলুন, যারা এমন যুক্তিহীন যুক্তি প্রদর্শন করতে চাইছেন, তারা কি ইচ্ছাকৃত-ভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন না ?

এরপর শুনুন, বিমানের মুখ্য-চালক কে ছিলেন সে সম্পর্কে কার

কি বক্তব্য।

তাইহকু বিমান বন্দরের ভারপ্রাপ্ত গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর মতে মেজর তাকিজাওয়াই ছিলেন তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত বিমানের মুখ্য-চালক; এবং তিনিই বিমানটি সায়গন থেকে তাইহকু পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেছেন শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে—উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালের তিরিশে মে, টোকিওতে।

অথচ তৎসত্ত্বেও হায়াশিদা, যিনি তাইহকু থেকে নেতাজীর চিতাভস্ম জাপানে নিয়ে আসার সময় হবিবের সঙ্গী ছিলেন বলে দাবি করেছেন, তিনি কিন্তু বলছেন অন্য কথা। তাঁর মতে সেই দুর্ঘটনায় পতিত বিমানের মুখ্য-চালক ছিলেন আইওয়াগি।

এবার শুনুন লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল নোনোগাকির বক্তব্য। নোনোগাকি খোসলা কমিশনের সামনে বলেছেন, তাকিজাওয়া কিংবা আইওয়াগি কেউই নন, তিনি নিজেই ছিলেন সেই বিমানের মুখ্য-চালক—যে বিমান দুর্ঘটনার ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং লেফটেন্যাণ্ট সিদেইর মৃত্যু হয়।

যদিও এই তিনজন ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছেন তবে শাহনওয়াজ কমিশন রায় দিয়েছেন যে, ক্যাপ্টেন নাকামুরার বক্তব্যই নাকি সঠিক। কিন্তু সে রায়টা কিসের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হল সে কথাটা শাহনওয়াজ একবারও খোলসা করে বলেননি। ফলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, ওঁদের তিনজনের মধ্যে কার কথাটা সত্যি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য? নাকামুরার? হায়াশিদার? নাকি নোনোগাকির?

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিমানটি কে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষীর বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য তো আপনারা শুনলেনই; এবার শুনুন, সেই বিমানে মোট কতজন যাত্রী ছিলেন, এবং সে ব্যাপারে কোন্ কোন্ প্রত্যক্ষদর্শী

কি কি বলছেন।

শাহনওয়াজ কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছেন: 'জেনারেল সিদেই ছাড়াও সেই বিমানে আরও পাঁচজন জাপানী সামরিক অফিসার ছিলেন। এই পাঁচজন হলেন: বর্মী বাহিনীর স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তাদিরো সাকাই, বিমান বাহিনীর স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সিরো নোনোগাকি, বিমান বাহিনীর অন্য একজন স্টাফ অফিসার মেজর তারো কোনো, স্টাফ অফিসার মেজর ইহাদো তাকাহাসি এবং বিমান বাহিনীর এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন কৈকিচি আরাই। এছাড়া পাঁচজন কিংবা ছজন বিমান চালক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম জানা যায়নি। বাকি চারজন হলেন চিফ পাইলট মেজর তাকিজাওয়া, কো-পাইলট আইওয়াগি, নেভিগেটর সার্জেন্ট ওকিস্তা এবং রেডিও-অপারেটর এন. সি. ও. তোমিনাগা। তাছাড়া ছিলেন নেতাজী এবং হবিবুর রহমান।' অর্থাৎ কমিটির মতে তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত বিমানটির মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল তের কিংবা চোদ্দজন।

এবার শুনুন হবিবের বক্তব্য। হবিব শাহনওয়াজ কমিটির সামনে সাক্ষী দিতে এসে বলেছেন: 'বৈমানিকগণসহ বিমানে বার কিংবা তেরজন যাত্রী ছিলেন।' তবে সেই বার তেরজন যাত্রী কে কে সে সম্পর্কে তাঁর পক্ষে সঠিক কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি তাঁদের মধ্যে একমাত্র সিদেইকে ছাড়া আর কাউকেই আগে কখনও দেখেননি। এবং দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নাকি তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে পরিচয় হয়েছিল ক্যাপ্টেন আরাই ও কর্ণেল নোনোগাকির।

কমিটির সামনে সাক্ষী দেবার সময় হবিব যদিও বলেছেন যে বিমানে বার কিংবা তেরজন যাত্রী ছিলেন, কিন্তু তারই সঙ্গে হাতে আঁকা যে নক্সাটি তিনি তাঁদের কাছে দাখিল করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বার কিংবা তের নয়—মোট বারজন যাত্রীই রয়েছেন।

এবার দেখুন কর্ণেল নোনোগাকি কি বলছেন। কর্ণেল নোনোগাকি নিজেকে দুর্ঘটনায় পতিত তথাকথিত বিমানটির মুখ্য চালক হিসেবে দাবি করে বলেছেন : 'বারও নয়, চোদ্দও নয়—সেই বিমানে মোট তেরজন যাত্রীই ছিলেন।'

অথচ মেজর কোনো কিন্তু বলছেন অন্য কথা। তাঁর মতে তের নয়, মোট চোদ্দজন যাত্রী সেই বিমানে ছিলেন।

আবার মেজর তাকাহাসির মত হচ্ছে অন্য। তিনি দুটো কথাই বলেছেন। তাঁর সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই বিমানে বার কিংবা চোদ্দজন—এর যে কোন একটা সংখ্যার যাত্রী ছিলেন।

সব থেকে অবাক করেছেন স্বয়ং জাপান সরকার। তারা কমিটির সামনে যে নক্সা দাখিল করেছেন তাতে দেখান হয়েছে, চোদ্দ নয়, তের নয়, মোট বারজন যাত্রীই সেই বিমানে ছিলেন।

মহামান্য আদালত, এই যে তথ্যগুলো আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম, আমি জানি, আপাতদৃষ্টিতে এটাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে কেউই স্বীকার করে নিতে চাইবেন না। তবু এই বক্তব্যগুলো আমি এ কারণেই শোনালাম যে, এ থেকেই আপনারা অন্ততঃ এটুকু বুঝে নিতে পারবেন যে, ওই দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারই কেমন জটিল এবং অসংলগ্ন! প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষদর্শীর কথা শুনলেই মনে হয় যে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রতিটি বিষয়েই পরস্পর-বিরোধী কথা বলবেন ঠিক করে নিয়েই যেন তা বলছেন! মনে হয়, তাঁরা জেনে-শুনেই যেন মিথ্যে কথা বলায় প্রতিযোগিতায় নেমেছেন!

আমি এ ব্যাপারে আর বিশেষ কিছুই আপনাদের বলতে চাইছি না। শুধু অনুরোধ করছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আপাতঃদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এই অসঙ্গতিগুলোর কথাও অনুগ্রহ করে একটু মনে রাখবেন। কারণ, যে বিষয়টাকে খালি চোখে খুবই ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে সেটাকে তো তা মনে নাও হতে পারে।

অতএব, এই বিষয়টার প্রতি যদি বিন্দুমাত্রও নজর দেন তা হলেই আমি নিজেকে বাধিত মনে করব। মনে করব, সরকারী কমিশন যে-সব বিদঘুটে ব্যাপারগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয় বলে মন্তব্য করে পাশ কাটিয়ে গেছে সেগুলোকেও আপনারা বিচার-যোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন।

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, যে পাঁচটি অদ্ভুত নমুনার কথা আমি আপনাদের বলেছিলাম, তার প্রত্যেকটির ব্যাখ্যাই আপনারা শুনলেন। সুতরাং এবার আসুন, সায়গন বিমানবন্দর ত্যাগ করার পর সে বিমানের কি হল, সেটা কোথায় গেল, সে প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করা যাক।

সেই অভিশপ্ত বিমানের যাত্রী হিসেবে দাবিদার প্রতিটি ব্যক্তিই বলেছেন যে বিমানটা সায়গন বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করে সেদিনই গিয়ে পৌঁছেছিল তুরেনে। তবে ঠিক কখন সেটা তুরেন বিমান-বন্দরের মাটি ছুঁয়েছিল সে সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর জবানবন্দীতে বেশ কিছু গড়মিল রয়েছে। যেমন হবিবুর রহমান নির্দিষ্ট করেই বলছেন যে, 'পাঁচটার সময় সায়গন থেকে যাত্রা করে সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা তুরেনে গিয়ে পৌঁছলাম।' কিন্তু মেজর তাকাহাসি তেমনভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে চাইছেন না। খোসলা কমিশনের সামনে এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তা হল: 'আমরা সন্ধ্যার সময় সায়গন থেকে যাত্রা করলাম এবং সন্ধ্যার সময়ই তুরেনে গিয়ে পৌঁছলাম।'

আপনারা জানেন, এর আগেও উনি কৌঁসুলী ত্রিখার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: 'সায়গন থেকে আমরা যাত্রা করলাম বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।' অর্থাৎ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, মেজর তাকাহাসি ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রতিবারই এমন সময় বলছেন, যাতে চট্ করে কেউ তাঁকে সময়ের ব্যাপারে কোন রকম

চ্যালেঞ্জ করে বসতে না পারে।

তবু অসঙ্গতি যেখানে হবার তা হয়েইছে। সময় সম্বন্ধে তাকাহাসির 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরণের জবাব শোনার পর খোসলা সাহেব তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেন: 'আপনারা যখন তুরেনে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন কি সেখানে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল?'

খোসলার প্রশ্ন শুনে তাকাহাসি জবাব দেন: 'না, অন্ধকার বলতে ঠিক যা বোঝায়, তেমন কিছু হয়নি। আসলে সেটা ছিল আলো-আঁধারি অবস্থা।'

অথচ মজার ব্যাপারটা কি জানেন? কর্ণেল নোনোগাকি কিন্তু তার আগেই জবানবন্দী দিয়ে গেছেন যে, বিমান যখন তুরেনে পৌঁছেছিল তখন কোথাও আলোর চিহ্ন ছিল না—ছিল অন্ধকার।

এবার শুনুন মেজর তারো কোনোর বক্তব্য। মেজর কোনো খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন: 'সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা গিয়ে পৌঁছলাম তুরেনে।'

খুবই ভাল কথা, কিন্তু, হে মাননীয় বিচারপতিগণ, আপনারাই বলুন, হবিব, তাকাহাসি এবং নোনোগাকি কথিত যে বিমান পাঁচটার সময় সায়গন বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা দিয়ে সাতটার সময় গিয়ে তুরেনে পৌঁছল, সেই একই বিমান, তারো কোনোর দাবি অনুযায়ী চারটের সময় সায়গন বিমানবন্দর ত্যাগ করা সত্ত্বেও কেন ওঁদের কথিত সময়ের আগে গিয়ে তুরেনের মাটি স্পর্শ করতে পারল না? কেন অন্য বিমানের যেখানে দু ঘণ্টা সময় লাগল তুরিনে পৌঁছতে, সেখানে তারো কোনোর বিমান তিন ঘণ্টার আগে পৌঁছল না? বলুন, কেন?

ঠিক আছে, মাননীয় বিচারপতিগণ, আপনাদের বলতে হবে না—আমিই বলছি। না, না, ভুল হল—আমি নই, মেজর তারো কোনোই বলছেন। তিনি নেতাজী স্বাগত সমিতির কৌঁসুলী

ত্রিখার প্রশ্নের উত্তরেই বলেছেন, বিমানের সায়গন থেকে তুরেন পৌঁছতে সময় লেগেছিল মোট তিন ঘণ্টা। এবং কেন সে সময়টা লেগেছিল সেকথাও তিনি খুব সহজভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রী ত্রিখাকে। তাঁর বক্তব্য হল: 'সায়গন থেকে তুরেনের বিমান পথে দূরত্ব প্রায় সাত শ কিলোমিটার। এবং যেহেতু সেই বিমানের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ছ শ তিরিশ কিলোমিটার, সেহেতু সায়গন থেকে তুরেন পৌঁছতে লেগেছিল পাক্কা তিন ঘণ্টা।'

দেখুন কী চমৎকার হিসেব! কী সহজ সমাধান! অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সহজ সমাধানটুকু কিন্তু হবিব, তাকাহাসি, কিংবা নোনোগাকির বেলা হল না। তাঁদের বিমান যেখানে পাঁচটায় রওয়ানা দিয়ে আটটার আগে তুরেনে পৌঁছবার কথা নয় সেখানে কিন্তু সেটা পৌঁছে গেল সাতটার মধ্যেই! বলুন, এটা কিভাবে সম্ভব হল? বলুন, যে বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ছ শ তিরিশ কিলোমিটারের বেশি ছিল না, সেটা কিভাবে সাত শ কিলোমিটার পথ ছ ঘণ্টায় অতিক্রম করে গেল?

মহামান্য আদালত, আমি জানি, যে কারও পক্ষেই চট্ করে এমন একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সত্যিই খুব কষ্টকর। এবং আমি এ-ও জানি, সেটা আপনাদের পক্ষে আরও কষ্টকর হয়ে পড়বে যখন আপনারা শুনবেন যে সে বিমানটা সন্ধ্যা সাতটা নয়; পাঁচটা কিংবা ছটার মধ্যে তুরেনে পৌঁছে গিয়েছিল।

একি! হঠাৎ আপনাদের চোখের দৃষ্টিতে এমন পরিবর্তন ঘটে গেল কেন? কেন হঠাৎ আপনারা এমন সন্দিহান চোখে আমার দিকে তাকান শুরু করলেন? কি ভাবছেন আপনারা? আপনারা কি মনে করছেন, আমি আপনাদের মিথ্যে কথা বলছি? মনে করছেন, হবিব, তাকাহাসি, নোনোগাকি এবং কোনোকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার জন্য আমার মনগড়া একটা কথা বলছি?

মাফ করবেন ন্যায়াধীশগণ, আপনারা যে সন্দিহান দৃষ্টি আমার

প্রভৃতি নিক্ষেপ করবার জন্য একত্রিত করছেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে সন্দেহের শরাঘাত আমার প্রাপ্য নয়; অনুগ্রহ করে আপনারা তা ফিরিয়ে নিন; এবং একান্তই যদি সেই শরাঘাতে কাউকে বিদ্ধ করতে মনস্থ করে থাকেন তবে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল তাদিরো সাকাইকেই তা করুন। কারণ কর্ণেল সাকাই-ই উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ কমিটির সামনে লিখিত জবানবন্দীতে বলেছেন যে, সন্ধ্যা সাতটা কিংবা রাত আটটা নয়, সায়গন থেকে বিমান তুরেনে গিয়ে পৌঁছেছিল সন্ধ্যা পাঁচটা কিংবা ছটার সময়।

আপনারাই বলুন, এরপরও কি আর এ ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন আছে? এরপরও কি আর সেই তর্ক করে এই আদালতের মূল্যবান সময়ের অপচয় করার দরকার পড়বে যে, বিমান যখন তুরেনে পৌঁছেছিল তখন সেখানে অন্ধকার ছিল, না ছিল আলো-আঁধারি অবস্থা? কারণ, সাধারণ বুদ্ধিতেই তো এটা বোঝা যায় যে, কর্ণেল সাকাই যদি পাঁচটা কিংবা ছটার সময়েই সেখানে সন্ধ্যা দেখে থাকেন, তবে সাতটা অথবা আটটার সময় অন্য কেউ সেই একই জায়গায় আলো-আঁধারি কিংবা গোধূলী লগ্ন দেখতে পারেন না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, একই বিমানের যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক যাত্রীই নাকি তা দেখেছেন—এবং মজার কথা, তা দেখে তাঁরা পুলকিতও হয়েছেন!

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না। বাকি যেটুকু রইল—অর্থাৎ বিষয়টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেটা আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধটুকুও করে রাখছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিমানের গতিবেগ এবং সায়গন থেকে তুরেনের ব্যাপারটার প্রতি একটু বেশি করে নজর দেবেন। কারণ, আমার ধারনা, ওই দুটো বিষয়ের মধ্যেই আসল রহস্যটা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে। তাই, যদি ওই ব্যাপারটার সমাধান করতে পারেন, তাহলে দেখবেন আলো-আঁধারি

এবং অন্ধকারের ব্যাপারটারও আপনেই সমাধান হয়ে গেছে। অতএব সেই প্রর্থনা জানিয়েই আপাতত: এই প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টানছি।

এবার আসুন, বিমানবন্দরে নামার পর বিমানের সব যাত্রী এবং চালকরা কোথায় গেলেন—সে ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করা যাক। এ সম্পর্কে কোন্ কোন্ প্রত্যক্ষদর্শী কি কি বলছেন সেটা শুনুন।

কর্ণেল রহমান শাহনওয়াজ কমিটির সামনে বলেছেন: 'তুরেনে পৌঁছবার পর নেতাজীর মালপত্র একটা গাড়িতে তোলা হল। তারপর নেতাজী, আমি এবং অন্য কয়েকজন জাপানী অফিসার একটা হোটেলে গেলাম। সেখানেই আমরা রাতটা কাটলাম।'

এর আগে কর্ণেল রহমান ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেটাতেও তিনি ওই একই কথা বলেছিলেন। সুতরাং এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, কর্ণেল রহমান ঠিক কথাই বলছেন।

কিন্তু মুশকিল বেঁধেছে ওই বিমানেরই অন্য এক যাত্রীকে নিয়ে। কারণ, তিনি দাবি করছেন, হবিব যা বলছেন তা ঠিক নয়; বরং তিনি যেটা বলছেন সেটাই ঠিক। এবার শুনুন, সেই 'ঠিক'টা কি।

তার আগে বলে নিই, ভদ্রলোকের নাম সিরো নোনোগাকি। উনি খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন: 'আমরা তুরেন বিমানবন্দর থেকে একটা মিলিটারি ব্যারাকে গিয়ে উঠলাম। সেখানেই সেদিনকার রাতটা কাটালাম। নেতাজীও আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।'

এবার শুনুন, আর একটা মজার কথা। এই নোনোগাকিই উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালের চোদ্দই মে টোকিওতে যখন শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছিলেন তখন কিন্তু বলেছিলেন একেবারে অন্য কথা। তিনি বলেছিলেন: 'আমরা সবাই বিমানবন্দর থেকে সোজা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম, এবং

সেখানেই প্রত্যেকে রাতটা কাটালাম।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ছাপ্পান্ন থেকে একাত্তর—এই পনেরটা বছর কাটতে না কাটতেই হোটেলটা হঠাৎ হোটেল থেকে মিলিটারি ব্যারাকে পরিণত হয়ে গেছে!

কিন্তু না, অতবড় ভুল করলে যে সব কিছুই ধরা পড়ে যাবে! সবাই ভাববে, উনি যা বলছেন তার সবটাই মিথ্যে—সবটাই একটা তৈরি করা গল্প! সুতরাং, যেভাবেই হোক ভুলটা তাঁকে শুধরে নিতে হবেই। অতএব পরের দিন, অর্থাৎ উনিশ শ একাত্তরের আটই এপ্রিল তিনি আবার খোসলা সাহেবের সামনে এলেন; আবার শপথ নিলেন, এবং আবার নতুন করে বললেন যে, না, কাল তিনি যা বলেছেন, তা মোটেই সত্য নয়; আসলে সেই রাতে নেতাজী এবং লেফটেন্যাট জেনারেল সিদেই দুজনেই ছিলেন তুরেনের এক হোটেলে। আর বলাই বাহুল্য—সেই হোটেলেই নেতাজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা উন্মুক্ত রেখে শুনুন যে, নেতাজীর সঙ্গে কর্ণেল নোনোগাকি নাকি সেদিনই প্রথম করমর্দন করেছিলেন, আর সেটা করিয়ে দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিদেই। হ্যাঁ, ন্যায়াধীশগণ, কর্ণেল নোনোগাকি খোসলা সাহেবের সামনে শপথ নিয়েই একথা বলেছেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, নোনোগাকিই নেতাজীকে বিমানে দুটো আসন দিয়েছিলেন এ কথাটা জানা থাকা সত্ত্বেও খোসলা সাহেব নোনোগাকির এই নতুন আবদারটাকে একেবারে চোখ কান বুজে বিশ্বাসও করে নিয়েছেন!

অথচ দেখুন, কর্ণেল তাদিরো সাকাই কিন্তু বলছেন একেবারে অন্য কথা। তাঁর মতে, সেদিন তাঁদের মধ্যে কেউই হোটেলে ওঠেননি সবাই রাত কাটিয়েছিলেন তুরেনের সাপ্লাই বেস্ বিলেটে। অর্থাৎ নোনোগাকি যাকে একবার মিলিটারি-ব্যারাক বলে উল্লেখ করেছিলেন অনেকটা ঠিক তাতেই।

কিন্তু বিপদ বেঁধেছে মেজর তাকাহাসিকে নিয়ে। তিনি খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন : 'আমি একটা হোটেলে উঠেছিলাম ; তবে অন্য সবাই সেই হোটেলেই উঠেছিলেন কিনা তা আমি বলতে পারব না।'

খুবই ভাল কথা। কারণ, অন্য সবাই কোথায় উঠেছিলেন সে কথা তিনি এতদিন পরে বলবেনই বা কি করে ? আর তাছাড়া, এতদিন পরে সে কথা তাঁর মনেই বা থাকবে কি করে ?

অথচ, মাননীয় বিচারপতিগণ, ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত কিন্তু ব্যাপারটা ওঁনার স্পষ্টই মনে ছিল। এবং সে কারণেই উনি তখন শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে জোর দিয়েই বলতে পেরেছিলেন : 'হ্যাঁ, আমরা সবাই একই হোটেলে উঠেছিলাম।' কিন্তু তারপর পনেরটা বছর কাটতে না কাটতেই তাঁর এমনই স্মৃতিভ্রংশ ঘটে গেল যে তিনি আর খেয়ালই করে উঠতে পারলেন না আসল ঘটনাটা কি ঘটেছিল ? তাঁর আর মনেই পড়ল না, তিনি ছাড়া সেদিন আর কে কে সেই হোটেলে রাত্রিযাপন করেছিলেন !

তাকাহাসির বক্তব্য তো শুনলেন, এবার শুনুন ক্যাপ্টেন আরাইয়ের বক্তব্য। ক্যাপ্টেন আরাই শাহনওয়াজ কমিটির সামনে বলেছেন : 'আমরা সকলেই সেদিন রাতটা কাটালাম তুরেনের সবচেয়ে বড় হোটেলে।'

খেয়াল করুন, আরাই বলছেন : 'আমরা সকলে।' তিনি কিন্তু এমন কথা বলছেন না যে, 'আমাদের মধ্যে অনেকে', কিংবা এমন কথাও বলছেন না যে, 'আমাদের মধ্যে কেউ কেউ।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য : বিমানের প্রতিটি যাত্রীই সেদিন তুরেনের সব থেকে বড় হোটেলে রাত কাটিয়েছিলেন।

অথচ মজার ব্যাপার দেখুন, নোনোগাকি একবার বলছেন তিনি হোটেলে ছিলেন না ; আবার একবার বলছেন ছিলেন। সাকাই বলছেন, তিনি তো ননই, অন্য কেউও সেদিন কোন হোটেলের

যার কাছে পর্যন্ত যাননি। তাকাহাসি বলছেন, আর কে কোথায় উঠেছিলেন তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই, তবে তিনি যে সে রাতটা হোটেলেই কাটিয়েছিলেন সে ব্যাপারে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হবিব বলছেন, কোন ব্যারাকে নয়, রাতটা তিনি কাটিয়েছিলেন হোটেলেই।

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনারা বলুন, এই বিচিত্র গোলক ধাঁধার মধ্যে আটকে পড়া বক্তব্যগুলো থেকে কোন্‌টাকে তুলে এনে আমরা সত্যের আসনে বসাব? কোন্ বক্তব্যটাকে সত্যের মর্যাদা দিলে সত্যিকারের ন্যায়বিচার করা হবে? কোন্‌টাকে সঠিক তথ্য হিসেবে মেনে নিয়ে এই ষড়যন্ত্রের যবনিকা উত্তোলনের ব্যাপারে আমরা একধাপ এগিয়ে যেতে পারব? বলুন, কোন্‌টা?

আপনাদের বিচলিত নয়নের কম্পমান দৃষ্টির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তেই আপনারা এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ঠিক প্রস্তুত নন। আপনারা চাইছেন, আমি আপনাদের এ ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে ভেবে দেখবার জন্য আরও কিছুটা সময় দিই। হে মাননীয় আদালত, বলুন, আমি যা অনুমান করছি তা কি ঠিক নয়? বলুন, আপনারা কি সত্যি সত্যিই কিছুটা সময় চাইছেন না?

ঠিক আছে মহামান্য বিচারপতিবৃন্দ, আপনারা বিষয়টা নিয়ে আরও চিন্তা করুন; আরও গভীরভাবে এর প্রতিটি সূত্রকে বিচার করে দেখুন। তারজন্য, যতটা সময়ের প্রয়োজন তা আপনারা নিন; এ সম্পর্কে আমার দিক থেকে অন্ততঃ কখনও কোন আপত্তি উঠবে না।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। সেটা হচ্ছে: তুরেনে সেই রাত্রে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে শাহনওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্ত। শাহনওয়াজ কমিটি সব সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনে নিজেরাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে,

'সে রাত্রে নেতাজী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিমান যাত্রীরা সকলেই তুরেনের সব থেকে দামী হোটেলে রাত্রি যাপন করেছিলেন।' এবং যে হোটেলে তাঁরা রাতটা কাটিয়েছিলেন, যদিও সে হোটেলটার নাম কেউই বলতে পারেননি, তবু কমিটির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সে হোটেলটার নাম ছিল 'হোটেল মেরিন।'

মাননীয় আদালত, যেখানে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে দাবিদার প্রত্যক্ষদর্শী মানুষগুলোর মধ্যে কেউ-ই সেই হোটেলটার নাম করতে পারলেন না, যেখানে কিনা তারা তাঁদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাত কাটিয়েছিলেন বলে দাবি করছেন, এবং যেখানে কিনা বলছেন যে নেতাজীর মত এক সুবিখ্যাত মানুষও তাঁর জীবনের শেষ রাতটা ওই হোটেলেই কাটিয়েছিলেন—সেখানে শাহনওয়াজ খান ও এস. এন. মৈত্র সাহেব ঘটনা ঘটে যাবার এগার বছর পরে কিভাবে এ সিদ্ধান্তে এলেন যে সেই হোটেলটার নাম ছিল, 'হোটেল মেরিন?'

অবশ্য এখানে একটা কথা বলার আছে। শাহনওয়াজ কমিশনের সদস্যরা যখন তথ্যানুসন্ধানের জন্য তুরেনে গিয়েছিলেন তখন তাঁরা সরকারীব্যয়ে সেই হোটেল মেরিনেই উঠেছিলেন। সুতরাং সেদিক থেকে যদি তাঁরা সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে, যেহেতু বলা হচ্ছে যে নেতাজীও সেদিন একটা বড় হোটেলেই উঠেছিলেন সেহেতু ওটা 'হোটেল মেরিন'ই হবে, তাহলে আর আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু তা যদি না হয়, যদি আপনাদের মনে হয় যে এই সিদ্ধান্ত শাহনওয়াজ কমিশনের খাম-খেয়ালীপনার একটা নমুনা মাত্র, তাহলে বলব, অনুগ্রহ করে আজ এই আদালতের বৈঠক সমাপ্ত হবার পর একটু সময় করে শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টটা একবার আদ্যপ্রান্ত পড়ে দেখবেন। এবং তা যদি পড়েন, তাহলেই বুঝতে পারবেন সে রিপোর্টের পাতায় পাতায় এমন আরও কত অসঙ্গতি ছড়িয়ে রয়েছে! এমন আরও কত খাম-খেয়ালীপনার ছুরিকাঘাত ঘটেছে তার নরম শরীরে!

কমিশন যদিও বলেছে যে, নেতাজী সেদিন তুরেনের হোটেল মেরিনে রাত কাটিয়েছিলেন কিন্তু ছাপ্পান্ন সালে সারাটা তুরেন তন্নতন্ন করে খোঁজা সত্ত্বেও তাঁরা এমন একজন স্থানীয় লোককে যোগাড় করে উঠতে পারেননি, যিনি কিনা বলতে পারতেন যে, হ্যাঁ, আমি নেতাজীকে দেখেছি তুরেনে আসতে ; এবং আমি তাঁকে দেখেছি হোটেল মেরিনে রাত কাটাতে।

তবে কমিশন যে একেবারেই কাউকে খুঁজে পায়নি, এমন কথা বলটা মনে হয় ঠিক হবে না। বরং একজনকে যে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন, সে কথা তাঁরা তাঁদের রিপোর্টেই উল্লেখ করেছেন। সে রিপোর্টে সাক্ষীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছাপ্পান্ন সালের দোশরা মে শ্রী মীর গোলাম দাস্তগীর নামে একজন ভদ্রলোক তুরেনে কমিশনের সামনে সাক্ষী দেবার জন্য হাজির হয়েছিলেন। এবং সেদিন সাক্ষ্যদানকালে তিনি তাঁর প্রায় এগার বছরের আগের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন : 'আমি চোদ্দ বছর ধরে তুরেনে রয়েছি। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে একদিন রাত্রে তুরেনের তৎকালীন জাপানী শাসক আমাকে বলেছিলেন, একটা হোটেলে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য, কিন্তু যেহেতু সে রাত্রে তুরেনে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলছিল, সেহেতু আমার পক্ষে হোটেলে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি।'

মাননীয় আদালত, আমি আগেই আপনাদের একবার বলেছিলাম, গল্পের গরু কিভাবে তরতর করে গাছে উঠে যায় সেটা ভালভাবে লক্ষ্য করবার জন্য। এবার আপনাদের সামনে আবার সেই সুযোগ এসেছে। এবার আবার আর একটা গরু গাছে চড়া শুরু করেছে। এ গরু হচ্ছে বোমাবর্ষণের গরু, এবং বলা হচ্ছে সেদিন নাকি তুরেনে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হচ্ছিল !

অবশ্য শাহনওয়াজ সাহেবরা বলবেন যে, কই আমরা তো

বোমাবর্ষণের কথা বিশ্বাস করিনি; এবং করিনি বলেই তো দাস্তগীরের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। আমি বলছি, খুব ভাল করেছেন; কারণ, অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কথা বিশ্বাস না করাই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মাননীয় মেজর সাহেব, যে অসঙ্গতিপূর্ণ কথা বলার জন্য আপনি দাস্তগীরের বক্তব্যকে বাতিল করে দিলেন, ঠিক সেই একই ধরণের অসঙ্গতিপূর্ণ কথা বলার জন্য নোনোগাকি, আরাই কিংবা কোনোর বক্তব্যকে কেন বাতিল করলেন না? কেন আপনি সাকাইর বক্তব্যের সঙ্গে হবিবের বক্তব্যের আকাশ পাতাল পার্থক্য ঘটা সত্ত্বেও ওঁদের দুজনকেই 'হ্যাঁ' এবং 'না'এর মাঝখানে ঝুলিয়ে দিলে

মাননীয় আদালত, আমি জানি, এ 'কেন'র জবাব আমি কোন-দিনও পাব না। এবং এ-ও জানি, শাহনওয়াজ সাহেব নিজেও আর কখনও এ 'কেন'র জবাব দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন না। কারণ, একটি লোকের জীবনে যা চাওয়ার এবং যা পাওয়ার—তাঁর সব কিছুই তিনি চেয়েছিলেন এবং ইতিমধ্যে তা পেয়েও গেছেন। সুতরাং, এরপর আর নতুন করে কিছু পাওয়ার আশায় তিনি যে আবার কোনদিন আমাদের মত জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবেন, সেটা শুধু আমি কেন, সম্ভবতঃ আপনারাও কেউ আর আশা করেন না। এবং করেন না বলেই আজ আমি বিচারের প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনা-দেরই সামনে। আপনাদের কাছেই জানতে চাইছি, বলুন, সত্যিই কি সেদিন নেতাজী তুরেনে এসেছিলেন? এবং এসে থাকলে তিনি সেই রাতটা কোথায় কাটিয়েছিলেন—ব্যারাকে, না হোটেলে?

মহামান্য বিচারপতিবৃন্দ, বারবার আমি এই একই কথা জিজ্ঞাসা করাতে আপনারা নিশ্চয়ই মনে মনে বেশ বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাদের অনুভূতির শিরাগুলোতে আবেগের রক্ত চলাচল বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ কথা বলছি না;

বলছি এ কারণেই যে, শাহনওয়াজ কমিটি এবং খোসলা কমিশনের সামনে দেওয়া বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে আমার একথা মনে হয়েছে যে, তুরেন-ই হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের প্রথম অপারেশন থিয়েটার; তুরেন থেকেই এ কাহিনী আকস্মিকভাবে দিক পরিবর্তন করে গেছে।

যদি তা না হয়, তবে আপনারাই বলুন, সেই বিমানের যে কজন যাত্রী এখনও বেঁচে আছেন বলে বলা হচ্ছে—তাঁরা প্রত্যেকেই, প্রতিটি বিষয়েই কেন পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন? কেন তাঁরা রাত্রি-যাপন থেকে শুরু করে, নৈশভোজ, সকালে বিমানবন্দরে ফেরা এবং সেখান থেকে আবার যাত্রা করা সম্পর্কে একই কথা বলতে পারছেন না? কেন একজনের বক্তব্যের সঙ্গে অন্যজনের বক্তব্যের কোন যোগসূত্রই থাকছে না? বলুন, কেন?

আমি জানি, প্রমাণ না পেলে আপনারা আমার কোন কথাই বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আমি জানি, প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্যকে যথাযথভাবে আপনাদের সামনে তুলে না ধরতে পারলে আপনারা আমাকে সন্দেহ এবং কৌতুকের দৃষ্টি দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলতে চাইবেন। এবং এটা জানি বলেই, এই আদালতের সামনে আসার আগেই নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত প্রতিটি দলিল এবং প্রত্যেকটি সাক্ষীর সাক্ষ্যকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি; তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যের সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিজের ব্যক্তিগত দিনপঞ্জীতে লিখেছি—এবং তারপরই, একেবারে প্রস্তুত হয়েই আপনাদের সামনে এসেছি। সুতরাং নিশ্চিত থাকুন, আমি এই আদালতের সামনে যে কথা বলব সে কথার পেছনে প্রমাণ অবশ্যই থাকবে।

যেমন ধরুন, নৈশভোজের ব্যাপারটা। মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমি বলছি, আমি এই আদালতের সামনে আমার কণ্ঠস্বরের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করেই বলছি যে, তুরেনে থাকাকালীন নৈশভোজ গ্রহণের ব্যাপারে শাহনওয়াজ কমিটি এবং খোসলা কমিশনের সামনে বিভিন্ন সাক্ষী যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তার কোনটার সঙ্গেই

কোনটার তেমন কোন মিল নেই। আর মিল নেই বলেই আমার মনে প্রথম থেকেই সন্দেহ জেগেছে—আদপে নেতাজী কি সেদিন তুরেনে সত্যিই কোন নৈশভোজ গ্রহণ করেছিলেন? কিংবা তাঁর তথাকথিত সহযাত্রীর দল?

কেন এ সন্দেহ, তা বলি। শুনুন, সেদিনকার সেই নৈশভোজ গ্রহণ সম্পর্কে কে কি বলছেন।

শাহনওয়াজ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় ক্যাপ্টেন আরাই বলেছেন: 'আমরা সবাই একসঙ্গে নৈশ্‌ভোজ গ্রহণ করলাম। খাবার সময় নেতাজী এবং জেনারেল সিদেই এশিয়া এবং ইউরোপের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করছিলেন।'

বেশ ভাল কথা; কিন্তু মুশকিল বেধেছে মেজর তাকাহাসিকে নিয়ে। কারণ, ওই একই কমিটির সামনে তাকাহাসি বলেছেন: 'যদিও আমি হোটেলেই উঠেছিলাম, এবং ডিনার টেবিলে বসেই নৈশভোজ সেরেছিলাম, কিন্তু ভোজনের সময় অন্য কোন পরিচিত লোককে সেখানে দেখিনি; এবং নেতাজী কিংবা জেনারেল সিদেইকে তো নয়ই।'

এরপর শুনুন, কর্ণেল নোনোগাকির ভাষণ। তিনি যদিও খোসলা সাহেবকে একবার ভুল করে বলে ফেলেছিলেন যে হোটেলে নয়, রাতটা নাকি তিনি মিলিটারি ব্যারাকেই কাটিয়েছিলেন, তবু নৈশ-ভোজ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর দাবি মত একথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে নেতাজী, জেনারেল সিদেই এবং অন্যান্য বিমানযাত্রীদের সঙ্গে তিনিও একই টেবিলে বসেই খাবার খেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে: 'আমরা সবাই একসঙ্গে বসেই নৈশভোজ সারলাম। সেখানে নেতাজী এবং জেনারেল সিদেইও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন। তাই কি বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি।'

মাননীয় আদালত, সবজান্তা কর্ণেল নোনোগাকিকে তো আপনারা ইতিমধ্যে বেশ ভাল করেই চিনে ফেলেছেন। সুতরাং, এ ব্যাপারটা শুনে কি আপনাদের এই ভেবে আপসোস হচ্ছে না যে, নোনোগাকি দুনিয়ার এত সব বিষয় জেনে ফেলা সত্ত্বেও একটু সময় ব্যয় করে সামান্য জার্মান ভাষাটা তিনি শিখে নিতে পারেননি! যদি একটু কষ্ট করে তিনি ওই ভাষাটাও শিখে নিতেন তাহলে তিনিও তো ক্যাপ্টেন আরাইয়ের মতই বলতে পারতেন যে, 'খাবার সময় নেতাজী এবং জেনারেল সিদেই এশিয়া ও ইউরোপের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করছিলেন।' তাহলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত। তাহলেই তো ভারত সরকার আরও বেশি জোর গলায় চিৎকার করে বলতে পারত যে, দেখ, দুজন জার্মান ভাষা-বিশারদ একই সঙ্গে বলছেন যে নেতাজী এবং সিদেই ইউরোপ এবং এশিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সুতরাং এ থেকে তো সোজাসুজি এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে নেতাজী সত্যি সত্যিই সেদিন হোটেলের ডিনার রুমে বসে ওঁদের সঙ্গে একই সাথে নৈশাহার করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা, যা থেকে প্রমাণ হচ্ছে তিনি সেদিন তুরেনের হোটেল মেরিনেই উঠেছিলেন, অন্য কোথাও নয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ, নোনোগাকি দুনিয়ার অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও সবকিছু জেনে উঠতে পারেননি। এবং তাঁর সেই না-জানার তালিকার মধ্যে জার্মান ভাষাটাও হচ্ছে একটা। আর সে কারণেই তিনি বুঝে উঠতে পারেননি, আসলে নেতাজী এবং সিদেই কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিন্তু, মাননীয় আদালত, বেহায়ার মত একটা প্রশ্ন করছি,—একবার খোঁজ করে দেখবেন কি, ক্যাপ্টেন আরাই নিজে জার্মান ভাষাটা জানতেন কিনা? কারণ, নেতাজী এবং সিদেই ইউরোপ এশিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করছিলেন, না তুরেন থেকে রুশ অধিকৃত এলাকায় সরে পড়বার মতলব ভাঁজছিলেন—সেটা জানার জন্যও

যে ক্যাপ্টেন আরাইয়ের জার্মান ভাষাটা জানা ছিল অত্যন্ত জরুরী এবং সেই অত্যন্ত জরুরী বিষয়টা কি আরাই সাহেব সত্যি সত্যিই জানতেন, নাকি অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই তিনি বাজি মাৎ করবার চেষ্টা করেছেন?

এই দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে আরাইয়ের উত্তর যা-ই হোক না কেন তবু জানবেন, আমার মনের মধ্যে অবিরত যে জিজ্ঞাসা চিহ্নটা কাঁটার খোঁচা মেরে চলেছে, সেটা কিন্তু অত সহজে তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটাবে না। কারণ, দুজন সাক্ষী নেতাজী এবং সিদেইর সঙ্গে নৈশভোজ সমাপন করলে কি হবে, তাকাহাসির মত এমন অনেক সাক্ষীও তো আছেন যাঁরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন! তাঁদের মুখ শাহনওয়াজ কিংবা খোসলা সাহেব কিংবা ভারত সরকার বন্ধ করবেন কিভাবে? কিভাবে ওঁদের এই এতদিন পরে জোর করে ধরে এনে আবার বসাবেন সেই মৃত নেতাজী এবং সিদেইয়ের ডিনার টেবিলে? বলুন, কিভাবে সেই ম্যাজিক খেলা সাঙ্গ করবেন ভাগ্যান্বেষী মেজর কিংবা অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস-এর দল?

অথচ তা না করলে যে আবার চলবেও না। তা না হলে যে আমার মনের মধ্যে অবিরত কাঁটার মত বিঁধে থাকা জিজ্ঞাসা চিহ্নটা কিছুতেই তার হুল ফোটান বন্ধ করবে না। কারণ, কর্ণেল সাকাইয়ের দেওয়া লিখিত জবানবন্দীর স্মৃতিটা যে এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে! এখনও যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; মেজর তাকাহাসি একা একা বসেই তাঁর নৈশভোজ সমাধা করছেন! এখনও যে আমার কানের কাছে মেজর কোনো এবং মেজর তাকিজাওয়ার বিমান থেকে পর পর বারটা মেসিনগান খুলে ফেলার আওয়াজ হচ্ছে!

হ্যাঁ মাননীয় আদালত, আমি যা বলছি তা সত্যি। অন্ততঃ শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্ট তো তাই বলে। সেই রিপোর্টের দ্বিতীয়

অধ্যায়ের সপ্তম অনুচ্ছেদটা একবার খুলেই দেখুন না। দেখুন, তাতে একথা লেখা রয়েছে কিনা যে, 'সবাই যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন বিমানের মুখ্য-চালক মেজর তাকিজাওয়া বিমান বাহিনীর অন্য একজন অফিসার মেজর কোনোর সহায়তায় বিমানের বোঝা কমিয়ে ফেলার কাজ শুরু করেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুজনে মিলে বিমানের বারটা মেসিনগান ও বেশ কিছু গোলাবারুদ নামিয়ে বিমানের ওজন প্রায় ছ শ কেজি কমিয়ে দিতে সক্ষম হন।'

এ ব্যাপারে মেজর কোনোর বক্তব্যটা কি তা-ও একবার শুনুন। শাহনওয়াজ কমিটির সামনে মেজর কোনো বলেছেন : 'তুরেন বিমান-বন্দরে নেমে অন্য সবাই একটা গাড়িতে করে হোটেলে চলে যান ; কিন্তু আমি এবং মেজর তাকিজাওয়া থেকে যাই বিমানবন্দরেই। আমরা দুজনে মিলে বিমানের সঙ্গে লাগান বারটা মেসিনগান খুলে ফেলি, এবং ভেতর থেকে অনেক গোলাবারুদ নামিয়ে দিই। ফলে বিমানের ওজন প্রায় ছ শ কেজি কমে যায়। তারপর সাড়ে আটটা নাগাদ কাজ শেষ করে দুজনেই একসঙ্গে রওয়ানা দিই হোটেলের পথে।'

মাননীয় আদালত, হয়ত আপনারা ভাবছেন, কাজ যখন সাড়ে আটটার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন মেজর কোনো নিশ্চয়ই বলবেন যে, তিনি এবং তাকিজাওয়া দুজনেই নেতাজী এবং সিদেইর সঙ্গে একই টেবিলে বসে নৈশাহার করেছিলেন ; এবং তিনি হয়ত এও বলবেন যে, আমরা দুজনেই শুনেছিলাম যে নেতাজী এবং সিদেই জার্মান ভাষায় এশিয়া এবং ইউরোপের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছিলেন।

কিন্তু না, মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, অন্ততঃ শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্ট সে ধরণের কোন কথা বলে না। বরং তাতে স্পষ্ট করে একথাই লেখা রয়েছে যে, মেজর কোনো বলেছেন : 'আমি এবং তাকিজাওয়া হোটেলে ফিরে পৃথকভাবে নৈশভোজ সমাধা করলাম।'

সুতরাং এবার আপনারাই বলুন, আমার মনের মধ্যে প্রতি-মুহূর্তে যে জিজ্ঞাসার চিহ্নটা কাঁটার মত বিঁধে চলেছে, সেটা কি কোন অন্যায় করছে?

তাছাড়া আরও একটা কথা বলি। আপনারা শুনলেন, মেজর কোনো বলেছেন, তিনি এবং তাকিজাওয়া, বিমান যেদিন তুরেনে পৌঁছেছিল সেদিনই রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিমানবন্দরে থেকে বিমানের মেসিনগান এবং গোলাবারুদ নামিযে ফেলেছিলেন। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, কর্ণেল নোনোগাকি দাবি করছেন, বিমান থেকে মেসিনগান খুলে ফেলা, এবং গোলাবারুদ নামান—এ দুটো কাজই তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল; এবং তখন রাত ছিল না—ছিল সকাল। অর্থাৎ তাঁর মতে, সেগুলো খোলা হয়েছিল আঠার তারিখ সকালে—বিমান তুরেন বন্দর থেকে যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। সুতরাং বলুন, এই পরস্পরবিরোধী দুটো দাবির কথা শোনার পর কোন্ দাবিটাকে আমরা ন্যায্য এবং সঠিক বলে মনে করব, আর কোন্ দাবিটাকে বলব অন্যায্য এবং বেঠিক?

বিমান থেকে ভারী মালপত্র নামিয়ে ফেলার ব্যাপারটা তো শুনলেন। এবার শুনুন তুরেন বিমানবন্দরে কে কখন এসে পৌঁছেছিলেন এবং ঠিক কটার সময় সেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল—সে ব্যাপারে কার কি বক্তব্য।

হবিবুর রহমান বলছেন: 'সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটা জাপানী গাড়িতে করে বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম। সেখানে এসে দেখলাম অন্যান্য জাপানী অফিসার এবং বিমানযাত্রীরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বিমান চালকেরা আগেই যে যার জায়গায় বসে গিয়েছিলেন। এবার আমরা বিমানে ওঠা শুরু করলাম। অন্যান্য যাত্রীরা উঠে গেলে পর জেনারেল সিদেই, নেতাজী এবং সবশেষে আমি উঠলাম। এবং তারপরই বিমানের যাত্রা শুরু হল।'

হবিবের বিবরণ তো শুনলেন; এবার শুনুন মেজর তাকাহাসির

বিবরণ। মেজর তাকাহাসি খোসলা কমিটির সামনে বলেছেন: 'সকাল আটটা নাগাদ আমরা তুরেন বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করলাম।'

মাননীয় আদালত, জাপানী ভাষায় সূর্যোদয়ের মুহূর্ত বলতে যে সকাল আটটা বোঝায় সম্ভবতঃ মেজর শাহনওয়াজের সে কথা জানা ছিল না। কারণ, যদি তিনি জানতেন যে একজন জাপানী সাক্ষী তুরেন থেকে যাত্রার সময় সম্বন্ধে বলতে এসে 'সকাল আটটা' বলে বসবেন তা হলে তিনি নিশ্চয়ই একথা কিছুতেই লিখতেন না যে, 'পরদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ভোর ঠিক পাঁচটার সময় ওঁরা যাত্রা শুরু করলেন।'

অথচ ব্যাপারটা না জানার দরুন দেখুন কী ভুলটাই না করে বসেছেন মেজর সাহেব! একজন প্রত্যক্ষদর্শী যেখানে বলছেন যে, আমরা রওয়ানা দিলাম সকাল আটটায়—সেখানে উনি লিখে বসলেন, না, ওঁরা পাঁচটার সময়ই রওয়ানা দিয়েছিলেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলার আছে। মেজর তাকাহাসি যেখানে বলেছেন যে ওঁনারা সকাল আটটার সময় রওয়ানা দিলেন, সেখানে মেজর তারো কোনো কিন্তু বলছেন যে, আটটা নয়, সকাল সাড়ে ছটার মধ্যেই বিমান তুরেন বন্দর ত্যাগ করেছিল। সুতরাং সেদিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে শাহনওয়াজ সাহেবের মন্তব্যটাকে খুব একটা হেলা-ফেলা করা চলে না। কারণ, পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটার দূরত্ব তো মাত্র দেড় ঘণ্টা কাল। যেখানে এত বড় বড় ঘটনার মধ্যে তার থেকেও বড় বড় ফাঁককে এক কলমের খোঁচায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই সামান্য নব্বই মিনিটের ফাঁকটাকে কি আর বন্ধ করে দেওয়া যেত না? সেখানে কি এই সামান্য সময়ের হাঁ করা মুখটাকে চেপে ধরতে পারত না কেউ?

কিন্তু না, বাস্তবক্ষেত্রে তা আর হল না। ওই তাকাহাসিই আবার শাহনওয়াজ সাহেবকে ফাঁসিয়ে দিলেন। কৌঁসুলীর জিজ্ঞাসার

উত্তরে তিনি বললেন : 'আটটা কেন, সম্ভবতঃ নটার সময়ই আমরা তুরেন থেকে যাত্রা করলাম।'

মহামান্য আদালত, তাকাহাসি ঘটনা ঘটে যাওয়ার ছাব্বিশ বছর পরে উনিশ শ একাত্তর সালে যে সময় নির্দেশ করেছেন, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে, ঘটনা ঘটার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই হবিব কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ঠিক ওই কথাই বলেছিলেন। তিনি তাদের কাছে এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, 'আঠারই অগস্ট সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে তুরেন বিমান-বন্দরে গিয়ে পৌঁছলাম, এবং আগের দিন যে বিমানে করে এসেছিলাম সেই বিমানে করেই আবার যাত্রা করলাম।'

এবার বলুন, ছাব্বিশ বছর আগে হবিব কথিত কাহিনীর সঙ্গে, ছাব্বিশ বছর পরে তাকাহাসি কথিত কাহিনীর মধ্যে কি কোন প্রভেদ দেখতে পাচ্ছেন? নেতাজী যদি সাড়ে আটটায় বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে থাকেন তবে নটা নাগাদ বিমান তুরেন বিমানঘাঁটি ত্যাগ করেছিল, একথা বলার মধ্যে কি কোন অসঙ্গতি রয়েছে? বরং এ ব্যাপারটাই কি আপনাদের কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না যে, সকাল পাঁচটা নাগাদ বিমান তুরেন বিমানঘাঁটি ত্যাগ করে তাইহকুর পথে রওয়ানা দিয়েছিল? কিংবা এটাই কি আপনাদের কানে বেশি বেমানান শোনাচ্ছে না যে, নোনোগাকির দাবি অনুযায়ী বিমান থেকে অত ভারী ভারী জিনিসপত্র নামানর কাজ শেষ করে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আকাশে উঠেছিল? বলুন, এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোন্ বক্তব্যটাকে আপনারা বেশি সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করছেন? বলুন, এই সাক্ষী কজনের মধ্যে কার কথা আপনাদের কানে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে ঠেকছে? কিংবা, যদি মনে করেন, এঁদের কারও কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হচ্ছে না— তবে সে কথাও স্পষ্টভাবেই বলবেন। কারণ, যদিও এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু আজও যদি কেউ সেই সত্যি কথাটা স্পষ্ট করে

বলেন, তাহলেও অন্ততঃ এটুকু কাজ হবে যে, যারা বহুদিন ধরে মিথ্যে কথাটা জোর গলায় বলে চলেছেন, তারা নিদেনপক্ষে চক্ষু লজ্জার খাতিরে হলেও তাঁদের গলার আওয়াজটাকে কিছুটা কমিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। সুতরাং, হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, যা বলার তা যত শীঘ্র পারেন, বলুন; আর দেরি করবেন না। কারণ, যত দেরি করবেন, মিথ্যেবাদীর গলার স্বর ততই উচ্চগ্রামে উঠবে। তখন তাকে দমানই হবে মুশকিল! তখন তাকে বাগে আনাই হবে কষ্টকর!

আর কিছু বলতে চাই না। আমার যা বলবার তা আপনাদের বললাম। এরপর যা করণীয় সেটা আপনারাই করবেন। আমি বরং সেই ফাঁকে পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করি।

মহামান্য আদালত, যদিও বিভিন্ন সাক্ষীর দেওয়া বিবরণের মধ্য থেকে বিমান ঠিক কটার সময় তুরেন বিমানবন্দর ত্যাগ করেছিল, সেটা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না—তবু সৌজন্যতার খাতিরে আপাততঃ এটা স্বীকার করে নিই যে, সেদিন সকালবেলা একটা বিমান সত্যি সত্যিই তুরেন বিমানবন্দর ত্যাগ করেছিল, এবং সত্যি সত্যিই সেটাতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি এতটা স্বীকার করে নেওয়া যায়ই, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও এসে পড়ে যে, তাহলে বিমানটা যাচ্ছিল কোথায়? কোন্‌টা ছিল তার গন্তব্যস্থল?

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এখন পর্যন্ত যতটুকু তথ্য জনসমক্ষে প্রচারিত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টভাবে এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, সেদিন সেই বিমানটা তুরেন বিমানবন্দর ত্যাগ করে মাঞ্চুরিয়ার পথে যাত্রা করেছিল। এবং যাত্রার সময় ঠিক ছিল যে, সেটা মাঝপথে একবার হেইতোতে থামবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি অবস্থার চাপে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে সেটাকে সোজা-

সুজি গিয়ে নামতে হয়েছিল করমোজার রাজধানী তাইহকুর বিমানবন্দরে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন—কেন হঠাৎ এই দিগ্‌পরিবর্তন? কেন হেইতোতে নামার পরিকল্পনা আগে থাকতে ঠিক থাকা সত্ত্বেও বিমান গিয়ে তাইহকুতে নামল?

চিন্তা করবেন না। পরিকল্পনা যারা তৈরি করেন, এবং সেই পরিকল্পনাকে যখন তারা নিজেরাই আবার বদলে ফেলেন, তখন জানবেন, আগে থাকতেই তার জন্য একটা কারণ আবিষ্কার করে ফেলা হয়। সুতরাং, এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে যখন পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটে গেল, তখন তারজন্যও যে আগে ভাগেই একটা কারণকে তৈরি করে ফেলা হয়েছিল—এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব, এ সম্পর্কে এখন আপনাদের যা করণীয়, তা হল, অতি ধীর-স্থির মস্তিষ্কে সেই কারণটা শোনা; এবং শুনে চুপ করে যাওয়া।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে উনিশ শ উনসত্তর সালে জাপানের ইওমিউরি সিম্বুন পত্রিকায় তথাকথিত তাইহকু বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে কয়েকজন প্রত্যোক্ষদর্শীর যে বিবরণ ছাপা হয়েছিল, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবার শুনুন, সেই ইওমিউরি সিম্বুনে প্রকাশিত কর্ণেল নোনোগাকির দেওয়া জবানবন্দীর একটা অংশ। কর্ণেল নোনোগাকি বিমানে তুরেন থেকে যাত্রা করে তাইহকু পৌঁছন পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন: 'আগে ঠিক ছিল মাঝপথে আমরা একবার হেইতোতে নামব। (কিন্তু আমাদের বিমান যখন করমোজার কাছাকাছি পৌঁছল তখন হঠাৎ বেতারে খবর শুনলাম যে, রুশ সেনাবাহিনী ইলিয়েনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। খবরটা শুনে জেনারেল সিদেই বললেন, যেভাবেই হোক রুশরা তাইলিয়েনে এসে পৌঁছবার আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে। অতএব

ঠিক হল হেইতোতে না নেমে আমরা সোজা তাইহকুর দিকে এগিয়ে যাব। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুপুর বারটা নাগাদ গিয়ে নামলাম তাইহকুতে।'

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, ইওমিউরি সিম্বুন পত্রিকায় প্রকাশিত কর্ণেল নোনোগাকির বিবরণ শুনে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে কি কারণে হেইতোতে নামার পূর্ববর্তী পরিকল্পনাটা পালটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন জাপ-কর্তৃপক্ষ? আপনাদের কাছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রুশ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির জন্যই তথাকথিত বিমানটিকে হেইতোতে নামার পরিকল্পনা বাতিল করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল তাইহকুর দিকে? বলুন, কর্ণেল নোনোগাকির জবানবন্দীতে কি সে কথাই বলা হয়নি? বলুন, ইওমিউরি সিম্বুনে প্রকাশিত বক্তব্যের মানে কি তাই দাঁড়ায় না?

অথচ দেখুন, শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্ট দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদে এ কথা স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে যে, 'যেহেতু আবহাওয়া অনুকূল ছিল সেহেতু সিদ্ধান্ত হয়, আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়া হবে। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই বিমান হেইতোতে না থেমে সোজা গিয়ে নামে তাইহকুতে।' অর্থাৎ কমিটির মতে 'রুশদের থেকে আগে তাইলিয়েনে পৌঁছবার তাগাদায়' নয়, 'আবহাওয়া ভাল থাকার কারণেই' বিমান হেইতোতে না নেমে সোজা চলে গিয়েছিল তাইহকুতে।

কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপারটা তাই? সত্যিই কি আবহাওয়া ভাল থাকার জন্য, কিংবা রুশদের আগে তাইলিয়েনে পৌঁছবার তাগাদায় বিমানকে হেইতোতে না নামিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাইহকুতে?

না। অন্ততঃ শাহনওয়াজ কমিটির সামনে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা অসঙ্গতি ছিলই।

কারণ, ইওমিউরি সিম্বুনে প্রকাশিত জবানবন্দীতে যে-কর্ণেল নোনোগাকি বলেছেন, 'তাইলিয়েনে পৌঁছবার তাগাদাতেই বিমানের হেইতোতে নামা বাতিল হয়ে গিয়েছিল', সেই এক-ই মানুষ, সেই এক-ই কর্ণেল নোনোগাকি শাহনওয়াজ কমিটির সামনে কিন্তু বলেছিলেন একেবারে বিপরীত কথা। সেখানে তাঁর বক্তব্য ছিল: 'দক্ষিণ চীনের সোয়ানটনের কাছাকাছি শত্রু বিমানগুলো থাকার জন্যই আমাদের বাঁকা পথে যেতে হয়েছিল, এবং আমরা হেইতোতে না নেমে সোজা গিয়ে নেমেছিলাম তাইহকুকে।' অর্থাৎ এখন দেখা যাচ্ছে, বিমানের হেইতোতে না নামার আরও একটা তৃতীয় কারণ ছিল; এবং সেটা হচ্ছে—অতি নিকটে শত্রু বিমানের অবস্থিতি।

এবার শুনুন, চতুর্থ কারণ। এ কারণের কথা বলেছেন মেজর তারো কোনো; উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে—শাহনওয়াজ কমিটির সামনে। মেজর কোনো হেইতোতে বিমান নামার সিদ্ধান্ত বদলের কারণ দর্শাতে গিয়ে তখন বলেছিলেন: 'বিমানে থাকাকালীন আমরা বেতারে শুনলাম, রুশরা পোর্ট আর্থার দখল করে নিয়েছে। এতে আমাদের মনে ভয় ধরে গেল। আমরা আশঙ্কা করলাম, যে কোন মুহূর্তে দাইরেণের পতন ঘটতে পারে। সে কারণে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে পৌঁছবার কথা চিন্তা করা হল। এবং ঠিক হল, আমরা হেইতোতে না নেমে সোজা চলে যাব তাইহকুতে।'

ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কেন?

সে প্রশ্নেরও খুব চমৎকার জবাব দিয়েছেন কর্ণেল নোনোগাকি, ইওমিউরি সিম্বুনে প্রকাশিত তাঁর জবানবন্দীতে তিনি বলেছেন: 'আগে ঠিক ছিল আমরা হেইতো থেকে সোজা মাঞ্চুরিয়ার তাইলিয়েনে চলে যাব। সেখানে জেনারেল সিদেই, নেতাজী এবং তাঁর সহকারীকে নামিয়ে দিয়ে রাতের দিকে ফিরে যাব জাপানে।'

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, কথাটা লক্ষ্য করুন। কর্ণেল নোনোগাকি বলছেন, 'ঠিক ছিল, বিমান হেইতো থেকে সোজা চলে যাবে

তাইলিয়েনে।' অর্থাৎ নোনোগাকির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি, যে-বিমানে নেতাজী এবং অন্যান্য জাপ-সামরিক অফিসাররা যাচ্ছিলেন, সেটার তাইহকুতে যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। হঠাৎই, সম্ভবতঃ কোন একজনের বিশেষ নির্দেশেই সেটা হেইতোতে না থেমে চলে গিয়েছিল সোজা তাইহকুতে।

এ ধরনের ব্যাপার ইতিপূর্বে আরও একবার ঘটেছিল। আমরা জানি, তুরেন বিমানবন্দরে যাত্রা বিরতির কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে সতেরই অগস্ট রাত্রে তথাকথিত বিমানটি তার যাত্রা বিরতি ঘটিয়েছিল এবং রাতের অন্ধকারে নেতাজীকে মালপত্রসহ হোটেলে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে বিমানের বারটা মেসিনগান খুলে ফেলা ও গোলাবারুদ নামিয়ে বিমানকে হাল্কা করা পর্যন্ত অনেক অনির্ধারিত কাণ্ড-কারখানাই সংঘটিত হয়েছিল। যদিও বলা হয়েছে, এর সবকিছুই ঘটেছিল বিমানের মুখ্য-চালক মেজর তাকিজাওয়ার ইচ্ছে অনুযায়ী, তবু যে-কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের পক্ষেই একথা বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, যেখানে জেনারেল সিদেইর মত একজন উচ্চপদস্থ জাপ সামরিক কর্মচারী সে বিমানে হাজির ছিলেন, এবং যেখানে নেতাজীর মত একজন রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত ছিল, সেখানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা ঘটছিল কিভাবে? তাছাড়া প্রধান পাইলটের দোহাই দিয়ে যা বলা হচ্ছে, সেটাই যে সত্যি তাই বা আমরা বুঝব কি করে? কারণ, এখন তো দেখাছ প্রধান পাইলটের আসনটা নিয়েই তিন তিনজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে মৃত বলে ঘোষিত মেজর তাকিজাওয়ার সমর্থকরা দাবি করছেন যে, মেজর তাকিজাওয়াই নাকি সেই বিমানের মুখ্যচালক ছিলেন। আবার অন্যদিকে আইওয়াগির সমর্থকরা বলছেন যে, তাকিজাওয়া নয়, আইওয়াগিই ছিলেন সে বিমানের প্রধান চালক। এবং সবশেষে কর্ণেল নোনোগাকির দাবি হচ্ছে,

তাকিজাওয়া কিংবা আইওয়াগি নয়—তিনি নিজেই ছিলেন সে বিমানের চিফ-পাইলট। সুতরাং, হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনারাই বলুন, এই গোলক ধাঁধার মধ্য থেকে কাকে প্রধান চালকের স্বীকৃতি দিয়ে বের করে আনার পর বিশ্বাস করব যে তাঁর কথাতেই দু দুবার বিমানের অনির্ধারিত যাত্রা বিরতি ঘটেছিল? তাঁর কথাতেই একবার নির্ধারিত যাত্রা বিরতির ব্যতিক্রম ঘটান হয়েছিল? বলুন, সেই মহাসৌভাগ্যবান ভদ্রলোকটি কে? কার কথায় সেদিন এমন ওলোট-পালোট ঘটে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল?

মহামান্য আদালত আপনারা একটু স্থির মস্তিষ্কে লক্ষ্য করে দেখুন, আলোচ্য ঘটনাবলীর প্রতি পদে পদে ষড়যন্ত্রের কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে! দেখুন, এর সারা অঙ্গ জুড়ে কী বিভৎস সন্দেহের ছুরিকাঘাত ঘটেছে! দেখুন, এর শিরায় শিরায় কী জঘন্য অবিশ্বাসের আনাগোনা চলেছে! অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, দিনের আলোর মত স্বচ্ছ এই বিষয়গুলো কিন্তু শাহনওয়াজ কিংবা খোসলা—এঁদের কারও চোখেই ধরা পড়ল না! এঁরা কেউই একবার নয়ন উন্মুক্ত করে দেখতে পেলেন না যে, এই কাহিনীর অঙ্গ থেকে কী প্রবল বেগে দূষিত রক্তের ধারা বয়ে চলেছে! এঁরা কেউই একবার উপলব্ধি করতে পারলেন না যে কী বিভৎস সন্দেহের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে ওই গলিত ষড়যন্ত্রের মৃতদেহ থেকে! সত্যি, এ দুনিয়ায় কত রকমের বিচিত্র মানুষই না আছে! কত রকমের বিচিত্র কাণ্ডই না ঘটে চলেছে অহরহ!

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এ ব্যাপারে আমি আর কী-ই বা বলব বলুন! আপনারা তো সবই শুনলেন, সবই দেখলেন, সবই বুঝলেন। এবার আপনারাই সিদ্ধান্ত করুন, কি কারণে সেদিন সেই অভিশপ্ত বিমানের তাইহকু যাওয়ার কথা না থাকলেও সেটা সেখানে গিয়েছিল? কি কারণে, সেটা হেইতোতে না নেমে আগের দিন রাতে তুরেনে নেমেছিল? কি কারণে তুরেন থেকে যাত্রা করার পর হেইতো

যাওয়ার পরিবর্তে ওটা চলে গিয়েছিল সোজা তাইহকুতে ? বলুন, এই খামখেয়ালীপনার কারণটা কি ? বলুন, এই খামখেয়ালীপনার জন্য দায়ী কে ?

কত আর বলব, মাননীয় আদালত, বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল ! যে ব্যাপারটার দিকেই তাকাই, দেখি, সেখানেই একটা গুরুতর গণ্ডগোল ! সেখানেই একটা গোলক ধাঁধা ! এই দেখুন না, তাইহকু বিমানবন্দরে পৌঁছনর ব্যাপারটাই। কর্ণেল হবিবুর রহমান শাহনওয়াজ কমিটির সামনে বলেছেন : 'আঠারই আগস্ট দুপুর ঠিক দুটো নাগাদ আমরা গিয়ে পৌঁছলাম তাইহকুতে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিমানের মুখ্য-চালক বলে দাবিদার কর্ণেল নোনোগাকি বলছেন : 'দুটো নয়, ঠিক বেলা বারটার সময় আমরা তাইহকুতে পৌঁছেছিলাম।' সুতরাং আপনারাই বলুন, এই দুজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কথার মধ্যে কার কথাটা আমরা বিশ্বাস করব ? এবং যদি বিশ্বাস করি, তাহলে কেন করব ?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বিশ্বাস করুন, সত্যিই এটা একটা গোলক ধাঁধা। না হলে এমন উদ্ভট কাণ্ড ঘটবেই বা কি করে ! কর্ণেল রহমান বলেছেন, ওঁনার বিমান নাকি সত্যি সত্যিই বেলা দুটোর সময়ই তাইহকুর মাটি ছুঁয়েছিল। সুতরাং যদি ওঁনার এক নম্বর বিবৃতিকে সঠিক বলে ধরে নিই—অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, মানে সকাল পাঁচটা কিংবা সাড়ে পাঁচটার সময় উনি তুরেন বিমান-বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন তাহলে দেখতে পাচ্ছি তাইহকুতে আসতে ওঁনার সময় লেগেছিল প্রায় সাড়ে আট থেকে ন ঘণ্টা।

যদি তাই হয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, হবিব সাহেবের বিবৃতিটাই ঠিক ; অর্থাৎ তুরেন থেকে বিমানে তাইহকু আসতে প্রায় সাড়ে আট থেকে ন ঘণ্টা সময়ই লাগে, তবে সঙ্গে সঙ্গে যে আর একটা বেয়াড়া প্রশ্ন গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে বসবে : তাহলে মেজর তাকাহাসির বিমান কিভাবে আড়াই থেকে সাড়ে

তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অতটা পথ অতিক্রম করল? বলুন, সেক্ষেত্রে সেই বেয়াড়া প্রশ্নের মুখ বন্ধ করা হবে কিভাবে? কিভাবে বোঝান হবে যে, না, তা-ও সম্ভব?

মহামান্য আদালত, আপনাদের কুঞ্চিত ভ্রূ-গুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, আপনারা আমার কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি; মেজর. তাকাহাসি কথিত সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়ের ব্যাপারটা আপনাদের কাছে মোটেই বোধগম্য হয়নি। বলুন, আমার অনুমানটা কি ঠিক নয়?

চিন্তা করবেন না, বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আপনারা জানেন, খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে মেজর তাকাহাসি প্রথমবার বলেছিলেন, 'বেলা আটটার সময় বিমান তুরেন থেকে যাত্রা করেছিল।' এবং কিছুক্ষণ পরে সেই একই কমিশনের সামনে কৌসুলীর জেরার উত্তরে সেই একই মানুষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'আটটা কেন; সম্ভবতঃ নটার সময়ই আমরা রওয়ানা দিয়েছিলাম।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাকাহাসির নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ীই—তিনি যত আগেই রওয়ানা দিয়ে থাকুন না কেন, সকাল আটটার আগে কিছুতেই রওয়ানা দেননি।

এবার শুনুন, তাইহকুতে পৌঁছন সম্পর্কে ভদ্রলোকের বক্তব্যটা কি? খোসলা কমিশনের সামনে তাইহকুর ঘটনাবলীর বিবরণ দেবার সময় উনি বলেছেন: 'দুপুর সাড়ে এগারটা নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম তাইহকুতে।'

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? তুরেন থেকে তাইহকুতে আসতে কমপক্ষে আড়াই এবং সর্বোচ্চ সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগল, তাই নয় কি? অথচ দেখুন, হবিব কিন্তু কিছুতেই আট ঘণ্টার কমে ওই পথটা অতিক্রম করতে পারলেন না!

শুধু হবিব কেন, আরও দু' চারজনেরও বেশ সময় লেগেছিল ওই

পথটা পার হতে। যেমন, মেজর তারো কোনো।

মেজর কোনো যে তুরেন থেকে সকাল সাড়ে ছটার মধ্যেই রওয়ানা দিয়েছিলেন সেটা আপনাদের আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁর বিমান কটার সময় তাইহকুর মাটি ছুঁয়েছিল, সে কথাটা এখনও পর্যন্ত বলা হয়ে ওঠেনি। এবার শুনুন সেই গূঢ় তথ্যটা।

মেজর কোনো উনিশ শ একাত্তরে খোসলা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন: 'দুপুর বারটা নাগাদ আমরা তাইহকু বিমানবন্দরে এসে নামলাম।' অর্থাৎ কোনোর মতে তুরেন থেকে তাইহকু পর্যন্ত পৌঁছতে বিমানের সময় লেগেছিল মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটির সামনে দেওয়া আর একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য যদি আমরা বিচার করে দেখি তাহলে দেখতে পাব, ওই একই বিমান এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা উড়ে এসে নেমেছিল তাইহকুতে। একথা বলেছেন, ওই বিমানেরই মুখ্য-চালক বলে দাবিদার কর্ণেল নোনোগাকি। কর্ণেল নোনোগাকির মতে বিমান সূর্যোদয়ের মুহূর্তে, অর্থাৎ শাহনওয়াজ কথিত সকাল পাঁচটার সময় তুরেন থেকে যাত্রা করে দুপুর বারটা নাগাদ এসে পৌঁছেছিল তাইহকুতে।

সুতরাং, হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এবার এটা আপনাদের দায়িত্ব; আপনারা বলুন, বিমান ঠিক কটার সময় তাইহকুর মাটি ছুঁয়েছিল? বেলা এগারটা, সাড়ে এগারটা, বারটা, নাকি হবিব কথিত দুপুর দুটোয়? বলুন, এই চার রকম সময়ের মধ্যে কোন্ সময়টাকে চূড়ান্তভাবে মেনে নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম রচনা করব? বলুন, কোন্ সময়টাকে ভিত্তি করে আবর্তিত হবে এই চাঞ্চল্যকর নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য?

আমি জানি, সত্যিই এ এক কঠিন ব্যাপার! কারণ, আপনারা যদি বলেন, বেলা এগারটার সময় বিমান তাইহকুতে পৌঁছেছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠবে যে, তাকাহাসি কথিত যে বিমান

সকাল নটার সময় তুরেন থেকে যাত্রা করেছিল, সে বিমান কিভাবে ছ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অতখানি পথ অতিক্রম করল? আবার যদি বলেন যে, না, আসলে সঠিক সময়টা হবে ছপুর ছটো—তা হলেও তো প্রশ্ন দেখা দেবে—সকাল পাঁচটার সময় যে বিমান হবিবকে নিয়ে তুরেনের আকাশে উঠেছিল, সে বিমান ন ঘণ্টা ধরে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিল কোথায়? কোথায় সে ঘুরে মরছিল ষড়যন্ত্রের পাখায় পাখায় ভর করে? কেন অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিমান যেখানে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় নিল না ওই পথটা অতিক্রম করতে সেখানে তাঁর বিমানের সময় লেগে গেল পুরো নটা ঘণ্টা? বলুন, এই কঠিন প্রশ্নটার কি এমন সহজ উত্তর দেবেন আপনারা, যা শুনে আমরা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারব না? বলুন, এই তিন ঘণ্টা আর ন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কি এমন যুক্তির সেতু রচনা করবেন, যা দেখে আমাদের পক্ষে পুলকিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে না? বলুন, আপনাদের ঝুলিতে কি এমন যাছদণ্ড আছে, যার প্রভাব এড়ান আমাদের মত মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না?

আসলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হবার, তা হবেই। আপনারা যত চেষ্টাই করুন না কেন, হবিব, তাকাহাসি, কোনো, নোনোগাকির দল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সময়ের বিস্তৃত প্রান্তরে যে বিরাট গহ্বরটা খুঁড়ে ফেলেছেন সেটাকে বুজিয়ে ফেলা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর কিছুতেই ঘড়ির কাঁটাকে ভোর পাঁচটা থেকে নটা, কিংবা ছপুর এগারটা থেকে ছটোয় টেনে আনা যাবে না! মহাকালের বুকে একবার যে গাঁইতির আঘাত পড়েছে, একবার যে সন্দেহের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার নরম দেহে, হাজার কমিটি আর কমিশনের প্রলেপ বোলালেও সে আঘাত, সে সন্দেহের বিন্দুমাত্র নিরসন হবে না। বরং চিরদিনের জন্য ওই সন্দেহ, ওই আঘাত একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে জেগে থাকবে কোটি কোটি ভারত-বাসীর মনের আকাশে। সুতরাং আপনারা আপনাদের বৃথা চেষ্টা

থেকে নিবৃত্ত হোন। তার থেকে বরঞ্চ আসুন, তাইহকু বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর সেখানে আর যে সব ঘটনা ঘটেছিল বলে বলা হচ্ছে—সে সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি।

মাননীয় আদালত, শাহনওয়াজ কমিটির নথীপত্র ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাইহকুতে পৌঁছবার অব্যবহৃত পরের ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে নেতাজীর বিশ্বস্ত সহকর্মী কর্ণেল হবিবুর রহমান বলেছেন: 'তাইহকুতে পৌঁছবার পর শুনলাম, বিমানে তেল ভরে নেওয়া হবে, এবং সেই অবসরে আমরাও আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নেব। দেখলাম, সব বিমানবন্দরেই যেমন থাকে, তেমনই ওখানেও বেশ কিছু বিমান কর্মী তাদের নির্ধারিত কাজ করে চলেছে। বিমান থেকে নেমে নেতাজীকে বললাম, বিমান খুব উঁচু দিয়ে উড়ছে বলে আমার বেশ শীত করছে, তাই আমি কিছু গরম জামা কাপড় পরে নিতে চাই; এবং তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, তিনিও তাই করবেন কিনা। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন যে, তাঁর তেমন শীত করছেন না, সুতরাং তিনি কোন রকম গরম জামা কাপড় পরবেন না। তবু আমি তাঁকে একটা সোয়েটার বের করে দিলাম, এবং নিজে বিমানের একধারে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় বদলে নিলাম। তারপর আমরা দুজনেই বিমানবন্দরের একপাশে খাটান একটা তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছে কলা এবং স্যাণ্ডুইচ দিয়ে খুব হালকা মধ্যাহ্ন ভোজ সারলাম। ইতিমধ্যে আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। আবার ফিরে এলাম বিমানের কাছে। ঠিক আড়াইটার সময় উঠে বসলাম বিমানে।'

এ গেল কর্ণেল হবিবুরের বক্তব্য; এবার শুনুন মেজর তারো কোনোর বিবরণ। মেজর কোনো খোসলা কমিশনের সামনে বলেছেন: 'বেলা বারটা নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম তাইহকুতে। সেখানে রইলাম প্রায় দু ঘণ্টা। ইতিমধ্যে ভোজ সেরে নিলাম। তারপর দুপুর দুটোর সময় রওয়ানা দিলাম সেখান থেকে।'

মাননীয় আদালত, হবিব যেখানে বলছেন যে, দুটো থেকে আড়াইটে পর্যন্ত মাত্র তিরিশ মিনিট সময় তাঁরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেছিলেন, সেখানে মেজর কোনো বলেছেন, তিরিশ নয়, এক শ কুড়ি মিনিট তাঁরা সেখানে ছিলেন! এবং তার থেকেও আশ্চর্যের ব্যাপার, কর্নেল নোনোগাকি দাবি করছেন, এক শ কুড়ি নয়, পুরো দেড়শ মিনিট অর্থাৎ আড়াই ঘণ্টা সময় তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেখানে!

কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র জবাব দিতে গিয়ে কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন: 'যদিও দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বেলা দুটোর সময়-ই আমাদের যাত্রা করার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের অপেক্ষা করতে হল পুরো আড়াই ঘণ্টা। কারণ, যাত্রার আগে চালকেরা বিমান পরীক্ষা করে দেখলেন যে, একটা এঞ্জিনে বেশ গোলযোগ রয়েছে। সেটা যেন একটু বেশি রকম কাঁপছে। ফলে সেটাকে সারিয়ে নিতে আরও তিরিশ মিনিট সময় লাগল। এবং সে কারণেই আমরা দুটোর বদলে আড়াইটার সময় যাত্রা শুরু করতে বাধ্য হলাম।'

এ বিবরণটা কর্নেল নোনোগাকি দিয়েছিলেন খোসলা কমিশনের সামনে—উনিশ শ একাত্তর সালে। এর আগে, উনিশ শ উনসত্তর সালে, এই নোনোগাকিই ওই ঘটনার আর একটা বিবরণ দিয়েছিলেন ইওমিউরি সিম্বুন পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে। সে বিবরণে তিনি বলেছিলেন: 'বেলা বারটার সময় আমরা তাইহকুতে নামলাম এবং দুপুর দুটোর সময় সেখান থেকে রওয়ানা দিলাম।'

মাননীয় আদালত, লক্ষ্য করুন, একই লোক কিছুদিনের তফাতে কিভাবে দু রকমের কথা বলছেন! উনিশ শ উনসত্তরে উনি বললেন: 'দুটোর সময় রওয়ানা দিয়েছিলাম'; আর উনিশ শ একাত্তরে বলছেন: 'দুটো নয়, রওয়ানা দিয়েছিলাম ঠিক আড়াইটের সময়।' অর্থাৎ দু বছরের মধ্যে আধ ঘণ্টা সময় বেমালুম হজম হয়ে

গেল! সুতরাং এ থেকেই বুঝে নিন, সমগ্র ব্যাপারটা নিয়ে দিনে দুপুরে কী ভেলকিবাজিই না চলেছে!

কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে! আমরা ছাড়তে চাইলেই যে কর্ণেল নোনোগাকিও আমাদের ছেড়ে দেবেন, সেটাই বা আপনারা ভাবছেন কেন? আপনারা তো ভদ্রলোককে অনেকক্ষণ ধরেই দেখছেন, অথচ এখন পর্যন্ত ওঁকে চিনে উঠতে পারলেন না! মনে মনে আপনারা যতই প্রতিজ্ঞা করুন না কেন যে ওঁর ভেলকি খেলা আর দেখবেন না, তবু উনি ওঁনার ভেলকি খেলা যে দেখাবেনই! এবং আমরাও সেই ভেলকিবাজি দেখতে বাধ্য হবই।

মাননীয় আদালত, আপনারা শুনেছেন, খোসলা সাহেবের সামনে উনি বলেছিলেন বিমানের এঞ্জিনের গণ্ডগোল থাকাতে সেটাকে সারিয়ে নিয়ে যাত্রা করতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আপনারা কি এ কথা কখনও শুনেছেন যে, বিমানের এঞ্জিনে কোন গণ্ডগোল ছিল না; এবং সে কারণেই বিমান যাত্রা নির্ধারিত সময়েই শুরু হয়েছিল!

আশ্চর্য হচ্ছেন; হ্যাঁ আপনারা খুবই আশ্চর্য হচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব বলুন? আমি নিজেও যে আশ্চর্য হয়ে গেছি ও কথা শুনে! আমি নিজেও যে অবাক হয়ে গেছি খোসলা কমিশনের বিবরণে এ কথা পড়ে যে, কর্ণেল নোনোগাকি একই দিনে ওই একই কমিশনের সামনে মাত্র সামান্য সময়ের ব্যবধানে এমন দুটো বিপরীতধর্মী বক্তব্য রেখেছেন! এবং আরও আশ্চর্য হবার মত ঘটনা হল, এই নোনোগাকি ভদ্রলোকটিকেই খোসলা সাহেব বিরাট এক প্রশংসাপত্র দিয়ে দিয়েছেন সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মাসতুতো ভাই হিসেবে। বলেছেন, ওঁনার সাক্ষ্য নাকি সত্যিই বেশ গুরুত্বপুর্ণ!

অবশ্য আমিও স্বীকার করছি কথাটা। কারণ, গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষ্য না হলে আর আমরাই বা তা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কেন

আমরাই বা বারবার তাঁর সাক্ষ্যকেই এত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করছি? তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক, খোসলা সাহেব কিংবা শাহনওয়াজ খান যে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে দেখেছেন, আমরা ঠিক তার বিপরীত দৃষ্টি দিয়েই তাঁকে দেখছি। কারণ, তিনি না থাকলে হয়ত এই বিরাট বিরাট বিভ্রান্তিগুলো আমাদের চোখেই পড়ত না। তিনি না দেখিয়ে দিলে হয়ত আমরা দুটো ঘটনার মাঝখানের ভেঙ্গে পড়া সেতুগুলোকে দেখতেই পেতাম না। তিনি না বলে দিলে হয়ত সময়ের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া তথ্যগুলো আমাদের নজরেই আসত না। সুতরাং ক্রমাগত অসংলগ্ন উক্তির মাধ্যমে তিনি যে সব সত্যকে নিজের অজান্তেই আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন, তারজন্য অন্ততঃ একবার আমাদের উচিত তাঁকে ধন্যবাদ জানান। এবং এই আদালতের অনুমতি নিয়ে, আমি ওই মহান ছট্‌ফটে মানুষটিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, এবার শুনুন সেই মজার কাহিনীটা। বিমানের এঞ্জিনে গণ্ডগোল বাধার ফলে বিমান ছাড়তে যে আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল, সে কথা কর্ণেল নোনোগাকি খোসলা সাহেবের কাছে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তারই কিছুক্ষণ আগে খোসলা সাহেব যখন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, বিমান কটার সময় তাইহকু বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা দিয়েছিল, তখন উনি স্পষ্ট বলেছিলেন: 'দুপুর দুটোর সময়।' আর সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন যে, এঞ্জিনের অবস্থা ছিল চমৎকার, এবং তাতে কোন গণ্ডগোলই ছিল না।'

দেখুন মজা! একটু আগে বলছিলাম না, আমরা নোনোগাকিকে ছাড়তে চাইলেও তিনি আমাদের কখনোই ছাড়তে চাইবেন না? এবার বলুন, কথাটা কি ঠিক বলিনি?

কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপারটা কি জানেন? যে কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মনে খট্‌কা লাগল—শাহনওয়াজ

কিংবা খোসলা—এঁদের কেউ-ই কিন্তু সে কথা শুনে কখনও এতটুকুও বিচলিত হননি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সাক্ষীকে একথাও জিজ্ঞাসা করেননি যে, আপনার আগের বক্তব্যের সঙ্গে পরের বক্তব্যের এমন অসঙ্গতি ঘটছে কেন? বরং, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই আগ বাড়িয়ে একই সাক্ষী যখন দুটো পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন, তখন তার বক্তব্যের মধ্যকার ফাঁকটুকু বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ক্যাপ্টেন নাকামুরার ব্যাপারটা।

তাইহকু বিমানবন্দরের গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ছাপ্পান্ন সালে শাহনওয়াজ-কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছিলেন: 'আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাতে বলতে পারি, যে বিমান দুর্ঘটনার ফলে নেতাজী এবং সিদেইর মৃত্যু হয়েছিল, সেটা ঘটেছিল সতেরই কিংবা আঠারই অগস্ট।' এরপর তিনি নিজেই নিজের বক্তব্য সংশোধন করে বলেন: 'আমি এ বিষয়ে শতকরা নব্বই ভাগ নিশ্চিত যে, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের আঠারই অগস্ট তাইহকুতে কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। কারণ, ওই দিন ফিলিপাইনস্ থেকে প্রায় তিরিশটি মার্কিন ও বেশ কিছু জাপানী বিমান তাইহকুতে এসে পৌঁছেছিল, এবং আমিই তার প্রত্যেকটিরই দেখাশোনা করেছিলাম।

নাকামুরার এমন বেয়াড়া বক্তব্য শুনে শাহনওয়াজ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর অভ্যাসমত ফাঁক বোজাবার কাজে লেগে যান। বার বার নাকামুরাকে বলতে থাকেন: 'আপনি মনে করে দেখুন, সেটা আসলে আঠার তারিখেই ঘটেছিল। এবং এ ব্যাপারে সম্ভবতঃ আপনি ভুলই করছেন। আপনি আপনার স্মরণ শক্তির সাহায্য নিন…' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শাহনওয়াজের এমন আগ্রহ দেখে নাকামুরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেন যে, তাহলে তা-ই হবে; বিমান দুর্ঘটনাটা সতেরই নয়, আঠারতেই ঘটেছিল!

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, শুধুমাত্র উদাহরণ দেবার জন্যই আমি এই ছোট্ট ঘটনাটার উল্লেখ করলাম। আপনারা ওই দুটো কমিশনের সমস্ত নথীপত্র যদি একবার পড়ে দেখেন, তবে দেখতে পাবেন, এ ধরণের আরও বহু ঘটনার প্রমাণ রয়েছে সেখানে। দেখতে পাবেন, যেখানেই একটু অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, সেখানেই চেষ্টা করা হয়েছে হয় সেটাকে চেপে দেবার নয়তো বিষয়টাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য।

কর্ণেল নোনোগাকির ব্যাপারটাও হয়েছে তাই। যে লোক একই দিনে একবার বললেন, এঞ্জিন ঠিক ছিল, আবার পরমুহূর্তেই বললেন, ঠিক ছিল না, সে লোকের কথাকে বিশ্বাস করা হল কিভাবে? আর যদি ধরেই নিই যে তাঁর কথাকে বিশ্বাস করা হয়নি, কেবলমাত্র শোনা হয়েছিল—তাহলেও তো প্রশ্ন থেকে যায়—এমন লোকের কথাকে অত গুরুত্ব দিয়ে শোনারই বা কি ছিল? এমন লোককে অত গুরুত্ব দেওয়ারই বা কি ছিল?

মাননীয় আদালত, জানি, এ প্রশ্নের কখনও যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে না। তবু অনিচ্ছা সত্বেও বারবার কি জানি কেন, প্রশ্নটা উত্থাপন না করেও থাকতে পারি না! মনে হয়, প্রশ্নটা উত্থাপন না করে চুপ করে থাকাটাও যেন একটা পাপ। মনে হয়, আমরা যদি দীর্ঘকাল চুপ করে থাকি, তবে ষড়যন্ত্রকারীরা হয়ত একদিন সেটাকেই তাদের প্রতি মৌনসম্মতি বলে চালিয়ে দেবে! তখন শত প্রতিবাদ করলেও কেউ আর আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না; কেউ আর আমাদের কথা শুনবেই না।

যাই হোক, যা বলছিলাম। নোনোগাকি একবার বলেছেন, 'বিমানের এঞ্জিন ঠিক ছিল' অন্যবার বলেছেন 'ঠিক ছিল না।' কিন্তু আসলে সেটা কি ছিল—ঠিক, না বেঠিক, তা আমরা জানব কি করে?

না মান্যবর, চিন্তা করার কিছু নেই; শাহনওয়াজ কমিটি আমাদের জন্য সে ব্যবস্থা অনেককাল আগেই করে রেখে গেছেন। তাঁরা

তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন : 'ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো ছিলেন তাইহকু বিমানবন্দরের ভারপ্রাপ্ত গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন : 'দুপুর একটা কুড়ি মিনিটের সময় মেজর তাকিজাওয়া এবং সহযোগী-চালক আইওয়াগি বিমানের ভেতরে গিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করেন। আমি তখন বিমানের ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। যখন তাঁরা এঞ্জিনটা চালু করলেন, তখন বুঝলাম একটা এঞ্জিনে গোলযোগ রয়েছে। আমি তখন বাঁ হাত তুলে তাকিজাওয়াকে ইঙ্গিতে সে কথা জানালাম। তিনি আমার ইঙ্গিত বুঝে আমার কথা শোনার জন্য বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। আমি তখন তাঁকে বললাম যে বাঁ দিকের এঞ্জিনটা গণ্ডগোল করছে, এবং সেটাকে ঠিক করতে হবে। তিনি তখন এঞ্জিনের গতি কমিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন যে, সেই এঞ্জিন একেবারে আনকোরা নতুন ; এবং সেটাকে সায়গনে সংযোজিত করা হয়েছে। তবু, মিনিট পাঁচেক ধরে সেটার গতি কমিয়ে দিয়ে ঠিক-ঠাক করে নিলেন। তারপর, পরপর দুবার সেটাকে চালিয়ে পরীক্ষা করলেন। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে এঞ্জিনের অবস্থা ঠিকই আছে। এবং মেজর তাকিজাওয়াও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হলেন।'

সুতরাং, হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ বিমানটিতে সত্যিই কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাকে সারিয়েও ফেলা হয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও আপনারা বুঝতে পারছেন যে, সে কারণেই কর্ণেল নোনোগাকি কথিত, অতিরিক্ত তিরিশ মিনিট সময় ব্যয় হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে ; 'মেজর কোনো তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন : 'মেজর তাকিজাওয়া ভেতর থেকে এঞ্জিনটাকে পরীক্ষা করেছিলেন, আমি করেছিলাম বাইরে থেকে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, বাঁদিকের

এঞ্জিনটা ঠিক মত কাজ করছে না। সে কারণে ভেতরে গেলাম এবং বাঁদিকের এঞ্জিনটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম, সেটা ঠিকই আছে।' অর্থাৎ মেজর কোনোর দাবি হল, সেই বিমানের এঞ্জিন সত্যি সত্যিই পরীক্ষা করা হয়েছিল।

যদি তাই হয়, যদি কর্ণেল নোনোগাকির বক্তব্যের সমর্থক হিসেবে এই দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে এ প্রশ্নের কি জবাব হবে যে, যে-কাজের জন্য বিমান যাত্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে কর্ণেল নোনোগাকি বলেছেন, সেই একই কাজ মেজর কোনো নিজের হাতে করা সত্ত্বেও কেন তাঁর বিমান যাত্রায় দেরি হল না? কেন তিনি খোসলা কমিটির সামনে স্বীকার করলেন যে, বিমান ঠিক দুটোর সময়-ই তাইহকু বিমানবন্দর থেকে আকাশে উঠেছিল? কেন তিনি বললেন না যে তাঁর বিমানও যাত্রা করতে আধ ঘণ্টা বিলম্ব করে ফেলেছিল? বলুন, এই গুরুতর অসঙ্গতির কি জবাব দেবেন নোনোগাকি, খোসলা সাহেব, কিংবা শাহনওয়াজ খান?

হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, উন্মুক্ত নয়নে একবার দেখুন, কী ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ান হয়েছে চারদিকে! কী রহস্য-ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে! কর্ণেল নোনোগাকি বলছেন, বিমানের এঞ্জিন সারাবার জন্য আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল; অথচ যিনি সেই এঞ্জিনটা সারিয়েছিলেন বলে দাবি করছেন তিনি কিন্তু বলছেন যে, না, মোটেই দেরি হয়ে যায়নি, বরং আমরা ঠিক সময়-ই রওয়ানা দিয়েছিলাম। সুতরাং বুঝুন, কী ধরণের সত্যি কথা বলছেন সব সত্যবাদীর দল! দেখুন কেমন ন্যায়ের চক্র ঘুরিয়ে চলেছেন সব আধুনিক ন্যায়রত্নেরা!

শুধু কি এইটুকুই?

না, মাননীয় আদালত, রহস্য-লোলুপ বাজপাখীদের রহস্য সৃষ্টির নেশা এত অল্পে তৃপ্ত হয় না! তারা প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে চলে

যাতে আরও নতুন নতুন রহস্য সৃষ্টি হয় তার জন্য। তারা সব সময় সুযোগ খুঁজে বেড়ায় যাতে হঠাৎ কোন নতুন ছিদ্র থেকে আর একটা নতুন রহস্য তৈরি করা যায় সেজন্য। আর সে কারণেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই রহস্যময় কাহিনীটির প্রতি অঙ্গে নিত্য নতুন গহনার বাহার! প্রতিনিয়তই এর শরীরে একটা না একটা নতুন রহস্যের ছোঁয়া লাগছেই!

এই দেখুন না, বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষার ব্যাপারটাই। শাহনওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে একেবারে উদ্ধৃতিসহ দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে তুলে দিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলেছেন যে, ওই দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য এটাই প্রমাণ করে যে সেদিন তাইহকুতে দুর্ঘটনায় পতিত বিমানের দুটো ইঞ্জিনের মধ্যে বাঁদিকের এঞ্জিনটায় বেশ গোলযোগ ছিল। কারণ ওই দুজন সাক্ষীই সেদিন বিমানটা পরীক্ষা করার সময় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন।

কিন্তু বাস্তব সত্যটা কি? যদিও বলা হচ্ছে যে ক্যাপ্টেন নাকামুরা এবং মেজর কোনো—এঁরা দুজনেই সেই বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষা করে তার মধ্যে গোলযোগ দেখতে পেয়েছিলেন, অথচ এঁরা যে জবানবন্দীতে দিয়েছেন, তাতে দেখতে পাচ্ছি, এঁদের মধ্যে কেউ-ই একে অপরের নাম উল্লেখ করেননি। মেজর কোনো বলেছেন: 'সাধারণতঃ প্রতিটি বিমানের সঙ্গেই একজন করে এঞ্জিনিয়ার থাকেন; এবং এ ক্ষেত্রেও তাই ছিলেন। এই মুহূর্তে আমি সেই ভদ্রলোকের নামটা মনে করতে পারছি না। তবে তিনিও এঞ্জিনটা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেটাকে আকাশে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।'

মাননীয় আদালত, লক্ষ্য করে দেখুন, মেজর কোনো বলছেন, 'সাধারণতঃ প্রতিটি বিমানের সঙ্গেই একজন করে এঞ্জিনিয়ার থাকেন এবং এক্ষেত্রেও তাই ছিলেন।' অথচ ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলছেন, বিমানের সঙ্গে যে এঞ্জিনিয়ার থাকেন তিনি সে এঞ্জিনিয়ার নন;

তিনি হলেন গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার। তাঁর ডিউটি ছিল তাইহকু বিমানবন্দরে যেসব বিমান যাত্রাবিরতি ঘটাত সেইসব বিমানের এঞ্জিনের দোষ-ত্রুটি পরখ করে দেখা।

দ্বিতীয়তঃ মেজর কোনো অনেক চেষ্টা করেও সেই এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির নাম মনে করে উঠতে পারেননি, যার সঙ্গে একত্রিত হয়ে তিনি সেদিন সেই অভিশপ্ত বিমানের এঞ্জিনটা পরীক্ষা করেছিলেন, এবং সেটাকে আকাশে উড়ার পক্ষে উপযুক্ত বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।

আবার অন্যদিকে দেখুন, মেজর কোনো যাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে সেই বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষা করেছিলেন বলে দাবি করছেন সেই ক্যাপ্টেন নাকামুরা এ ব্যাপারে কী বিচিত্র কথা বলছেন! তাঁর মতে, যখন বিমানের এঞ্জিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবশুদ্ধ তিনজন লোক। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মুখ্য-চালক তাকিজাওয়া, অপরজন সহযোগী-চালক আইওয়াগি এবং তৃতীয়জন অতি অবশ্যই তিনি নিজে। এই তিনজন ছাড়া সেদিন সেই মুহূর্তে সেখানে আর একটি প্রাণীকেও তিনি দেখতে পাননি। অথচ মেজর কোনো জোর গলায় বলেছেন যে, চন্দ্র-সূর্য উলটে গেলেও একথা সত্য যে তিনিও সেদিন ওঁদের সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ওঁদের সঙ্গে একত্রিত হয়েই বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষা করে ওড়বার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।

মাননীয় আদালত, সন্দেহবাদীরা এখানে অতি অবশ্যই একটা নতুন প্রশ্ন তুলতে পারেন। তারা বলতে পারেন যে, এমনও তো হতে পারে যে মেজর কোনো এবং ক্যাপ্টেন নাকামুরা দুজনে একই সঙ্গে সেই বিমান পরীক্ষা করেননি; তাঁরা আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা আলাদা ভাবে সেটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন এবং তাঁদের দুজনের পরীক্ষার সময়-ই মেজর তাকিজাওয়া ও আইওয়াগি এঁরা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন।

আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, এ ধরণের প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক ; এবং সেটা বাস্তব সম্মতও বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও তো উঠবে যে, তাহলে মেজর কোনো নাম না জানা যে ভদ্রলোককে তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে সার্টিফিকেট দিতে দেখেছিলেন, সে ভদ্রলোকটি কে ? এবং তিনি এখন কোথায় ? তাছাড়া তিনি যে বিমানের সঙ্গেই সায়গন থেকে তাইহকু পর্যন্ত এসেছিলেন, তারই বা প্রমাণ কি ? কারণ, তিনি যদি সত্যিই ওঁদের সঙ্গে এক বিমানে এসে থাকতেন তাহলে, মেজর কোনো ছাড়া আর কারও কি একেবারের জন্যও তাঁকে চোখে পড়ত না ? দুটো অনুসন্ধান কমিটির সামনে একবারও কি কেউ ভুলেও সে লোকটার কথা উচ্চারণ করতেন না ? বলুন, এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য বিষয় ?

তারপর দেখুন সময়ের ব্যাপারটা। কর্ণেল নোনোগাকি বলছেন : 'দুটোর সময় বিমানে উঠতে গিয়ে দেখা গেল বিমানের একটা এঞ্জিন কিছুটা খারাপ আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে মেরামত করা শুরু হল এবং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে মেরামত করার পর যখন বোঝা গেল যে সেটা আকাশে ওড়ার উপযুক্ত হয়েছে তখন আমরা সবাই বিমানে উঠলাম। এবং বিমানে ওঠার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।' অর্থাৎ কর্ণেল নোনোগাকির মত অনুযায়ী বেলা ঠিক দুটোর সময়ই বিমানের এঞ্জিনের গোলযোগ ধরা পড়েছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেটার মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল।

অথচ দেখুন, বিমানটাকে আকাশে ওড়ার সার্টিফিকেট যিনি দিয়েছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন নাকামুরা কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছেন। তিনি বলছেন, বেলা একটা কুড়ির সময় মেজর তাকিজাওয়া এবং আইওয়াগি বিমানে উঠে এঞ্জিন পরীক্ষা করেছিলেন। মিনিট দশেক ধরে ব্যাপারটা চলেছিল। তারপরই সব ঠিক হয়ে যায়। এরপর উনি নিজে বিমানকে আকাশে ওড়ার

উপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন।

যদি তাই হয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বিমানের এঞ্জিনের যা-কিছু গণ্ডগোল ছিল সেটা দুপুর দেড়টার মধ্যেই ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল, তাহলে এ সন্দেহের কিভাবে নিরসন হবে যে, যে ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন নাকামুরা দেড়টার মধ্যেই শেষ হয়ে যেতে দেখলেন, কর্ণেল নোনোগাকি সেই একই বিষয়কে শুরু হতে দেখলেন বেলা দুটোর সময়? বলুন, এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন অনুসন্ধান কমিটি আর কমিশনওয়ালারা?

মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, আমি জানি, অনেকেই চট্ করে এ প্রশ্নটার একটা সহজ জবাব দিয়ে দেবেন। এবং সে জবাবটা যে কি হবে তাও আমার জানা আছে। আমি জানি, জবাবটা হবে এই যে, বিমানটা তো রানওয়েতে আসার পর দ্বিতীয় বারও আবার পরীক্ষা হয়ে থাকতে পারে! সেটার মধ্যে তো দ্বিতীয়বারও আবার গণ্ডগোল দেখা দিয়ে থাকতে পারে!

আমি জানি, তা পারে; এবং নিশ্চয়ই তা হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে এও জানি যে, তা যদি হত, যদি বিমানটা রানওয়ের মধ্যে এসে আবার খারাপ হয়ে যেত, এবং সেখানে দাঁড়িয়েই যদি সেটাকে আবার সারান হত তাহলে সে ব্যাপারটা শুধু একজনই দেখতে পেতেন না, দেখতেন সবাই—বিমানের প্রতিটি যাত্রী থেকে শুরু করে বিমানবন্দরে উপস্থিত প্রতিটি বন্দরকর্মী পর্যন্ত সকলে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এক্ষেত্রে ঘটনাটা কর্ণেল নোনোগাকি ছাড়া আর কেউই দেখতে পেলেন না! আর কারও চোখেই এত বড় ব্যাপারটা একবারের জন্যও ধরা পড়ল না!

এ প্রশ্নেরও একটা জবাব দিতে পারেন কেউ কেউ। তারা বলতে পারেন, অন্য অনেকেই হয়ত ব্যাপারটা দেখেছিলেন, কিন্তু বিষয়টা তেমন গুরুতর নয় বলে, আর কেউ-ই সেটার কথা বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা

অনালোচিত-ই রয়ে গেছে।

আমি মানছি, এটাও হতে পারে। আমি মেনে নিচ্ছি, এটা হওয়াও সম্ভব। তবে, হে মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, সেই সঙ্গে এ কথাটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না যে, ক্যাপ্টেন নাকামুরা সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, কর্ণেল নোনোগাকির দেওয়া বিবরণের জন্য যেখানে তাঁর বক্তব্যের সত্যাসত্য সম্পর্কেই সন্দেহ দেখা দিল, সেখানে তিনি ওই ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেও তা কমিশনকে জানালেন না! বলুন, এ ধরণের পরিস্থিতিতে যদি আপনাদের মধ্যে কেউ পড়তেন, যদি কোন ব্যক্তির কথার ফলে আপনাদের কারোর সম্মানে টান পড়ত, তাহলে কি আপনারা সেক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকতেন? নাকি আসল কথাটা বলতেন? বলুন, কি করতেন?

এছাড়া আরও একটা কথা উঠতে পারে। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, এমনও তো হতে পারে যে, বিমানকে যখন রানওয়ের ওপর দাঁড় করিয়ে মেরামত করা হচ্ছিল, তখন ক্যাপ্টেন নাকামুরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। ফলে ব্যাপারটা তাঁর নজরেই পড়েনি।

আমি স্বীকার করছি, সেটাও হওয়া সম্ভব; এবং সেটা হওয়াটাও খুব একটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবিনয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, না ভদ্রমহোদয়গণ, সে ধরণের কিছু হয়নি। কারণ, শাহনওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ক্যাপ্টেন নাকামুরাই হচ্ছেন একমাত্র বিশ্বস্ত সাক্ষী যিনি বিমান যাত্রার আগের মুহূর্ত থেকে বিমান ভেঙ্গে পড়ার সময় পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাকেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই থাকতে পারে না। অতএব এবার আপনারাই বলুন, শাহনওয়াজ ক্যাপ্টেন নাকামুরাকে এতবড় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়ার পরও কি কারও পক্ষে তাঁকে অবিশ্বাস করা সম্ভব? অবিশ্বাস করা

উচিত ?

মাননীয় আদালত, এরপর আর এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। আমার যা বলার তা ইতিমধ্যেই আমি বলে ফেলেছি। সুতরাং, এখন যেটা বাকি রয়েছে, তা হল, এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা হচ্ছে একান্তই আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। আপনাদের নিজেদেরকেই এটা ঠিক করতে হবে যে, এ সম্পর্কে আপনাদের চূড়ান্ত মতামতটা কি হবে এ ব্যাপারে আপনারা কোনটাকে সঠিক বলে মনে করবেন ?

তবে এই প্রসঙ্গে আবার একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে না দিয়ে পারছি না যে, সেদিন সেই বিমানের এঞ্জিন মেরামতির ব্যাপারে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন সাক্ষীই যেমন সেই ঘটনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন, তেমনই তাইহকু বিমান-বন্দরে তথাকথিত অভিশপ্ত বিমানটি ঠিক কতক্ষণ যাত্রাবিরতি ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কেও কিন্তু কোন সাক্ষী কোন নির্দিষ্ট কথা বলতে পারেননি। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই যাত্রাবিরতির সময় সম্পর্কে একে অপরের বিপরীত কথা বলেছেন ; তাঁদের প্রত্যেকের বিবরণের মধ্যেই দেখা গেছে মারাত্মক পরস্পর বিরোধীতা ! ফলে, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে একটা সন্দেহজনক ধাঁধায়। এবং সেই ধাঁধার অবিসংবাদিত ফল হিসেবেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, আদপে সেদিন কি তাইহকুতে সত্যিই কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ? সত্যিই কি সেদিন কোন বিমান দুর্ঘটনার ফলে সেখানে কারও মৃত্যু ঘটেছিল ? এবং সেই মৃত মানুষগুলোর মধ্যে সত্যিই কি সেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ?

হে মাননীয় বিচারপতিগণ, এখনই আমি আপনাদের বলছি না এই কঠিন প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে। কারণ, এখন পর্যন্ত তো আমার সওয়াল জবাবই শেষ হয়নি। এখন পর্যন্ত তো আমি আপনাদের এই রহস্য-ঘন কাহিনীর অর্ধেকটাও বলে উঠতে পারিনি।

সুতরাং এখনই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তো কোন কথাই উঠতে পারে না। বরং, তার থেকে, অনুগ্রহ করে আজকের মত এই আদালতের অধিবেশনকে মুলতুবি ঘোষণা করে আমাকে আবার আগামীকালের সওয়াল জবাব শুরু করার জন্য প্রস্তুত. হওয়ার সুযোগ দিন। আগামীকাল সকালে আমি আবার আপনাদের স্যামনে হাজির হব, আবার আমার বক্তব্য রাখ[illegible] আবার বলব সেই মহামানবকে নিয়ে সংঘটিত অসাধারণ ষড়[illegible] কাহিনী। তারপর, হে আমার প্রিয়তম স্বদেশবাসীগণ, অ[illegible]ম সব কথা শোনার পরই আপনারা ঘোষণা করবেন আপনাদের চূড়ান্ত রায়—'দোষী' অথবা 'নির্দোষী'।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত